আশরাফুল আলম সাকিফ

একটি সময় ছিলো যখন মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতো। সেটি এখন ইতিহাস। বুদ্ধিবৃত্তিক পরাধীনতার শৃঙ্খল যেন স্বেচ্ছায় হাতে পরে নিয়েছি আমরা। এরই সাথে যোগ হয়েছে ধর্মীয় অজ্ঞতা। আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ লুফে নিয়েছে সেক্যুলার, ইসলামবিদ্বেষী, মিথ্যা জ্ঞানের মোড়কে নিজেদের সাজানো কিছু কূপমণ্ডুক । নিজেদের জ্ঞানহীন মস্তিষ্ককে মিশনারিদের কাছে বন্ধক রেখে তারা কুরআন এবং হাদিস অধ্যয়ন করে। তারপর আমাদের কিছু অবুঝ যুবকদের সামনে এর কল্পিত ত্রুটি উপস্থাপন করে শৈল্পিক পন্থায়। রঙ-বেরঙের উপস্থাপন দেখে তারাও ভড়কে যায় । কারণ নিজেদেরও তো একই অবস্থা। অবশেষে তারাও পাড়ি জমায় 'আসহাবুশ শিমালে'র দলে । তাদের বিষাক্ত দংশনের ফলে শেষমেষ আর বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না আমার বা আপনার আদরের ভাই কিংবা বোনের। তাদের বিষাক্ত দংশনের ফলে আমাদের বিশ্বাসে সৃষ্ট বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করতেই প্রতিষেধক হিসেবে এই গ্রন্থ '*অ্যান্টিডোট*' ।

অ্যান্টিডোট

আশরাফুল আলম সাকিফ

অ্যান্টিডোট

আশরাফুল আলম সাকিফ

ISBN-987-984-34-3678-8

সম্পাদনা
ডা. আব্দুল্লাহ সাঈদ খান ও আশিক আরমান নিলয়

শার'ঈ সম্পাদনা
মাওলানা আলী হাসান উসামা

দ্বিতীয় সংস্করণ :
১ম মুদ্রণ: যুল কা'দাহ ১৪৩৯ হিজরি / জুলাই ২০১৮ খৃষ্টাব্দ

১ম সংস্করণ :
২য় মুদ্রণ: রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি/ মার্চ ২০১৮ খৃষ্টাব্দ
১ম মুদ্রণ: রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি/ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খৃষ্টাব্দ

অনলাইন পরিবেশক
❑ রকমারি.কম ❑ ওয়াফি লাইফ ❑ আল ফুরকান শপ

প্রকাশক
রোকন উদ্দিন

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

মূল্য: ২৮৪ টাকা

সমর্পণ প্রকাশন

৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন:+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
https://www.facebook.com/somorponprokashon

Antidote by Ashraful Alam Sakif published by Somorpon Prokashon, Dhaka, Bangladesh, First Edition in 2018.

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে নুতফাহ (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) হিসেবে জরায়ুতে স্থাপন করেছি। অতঃপর একে (জাইগোটকে) পরিণত করেছি আলাকাতে (জোঁকের মতো বস্তু যা ঝুলে থাকে)। অতঃপর আলাকাকে পরিণত করেছি মুদগাহতে (এক টুকরা মাংসপিন্ড)। অতঃপর এই মুদগাহ থেকে অস্থি তৈরি করেছি এবং এরপর এই অস্থিকে মাংস দিয়ে আবৃত করে দিয়েছি। অতঃপর তাকে নতুন এক সৃষ্টিরূপে বের করে এনেছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়!

সূরা মু'মিনুন: আয়াত (১২-১৪)

বিষয়সূচী

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা- শাহ আলম এবং মাতা- মঞ্জুয়ারা আলম মুক্তি। একজন জান্নাতের দরজা এবং অন্যজনের পায়ের নিচে আমার জান্নাত। ছোটবেলা থেকেই বাবা-মায়ের অসীম মমতায় বড় হয়েছি। সত্যি বলতে আমার মেডিকেলে পড়ার কোনো ইচ্ছাই ছিলো না। বাবা-মায়ের ইচ্ছায় মেডিকেলে পড়তে আসা। মেডিকেলে বছরের পর বছর অতিক্রম করতে করতে স্রষ্টার অস্তিত্ব নতুন রূপে উদ্ভাবন করতে থাকলাম। সেই সাথে নিজের অ্যাকাডেমিক জ্ঞানকে ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ের সাথে মেলাতে লাগলাম। সেই ধারায় তিল তিল করে গড়ে ওঠা আজকের এই বই। আজ তাঁদের ইচ্ছায় মেডিকেলে পড়তে না এলে আমার দ্বারা এই বইটি লেখা সম্ভব হতো না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি তাঁদেরকে আমার পিতা-মাতা হিসেবে নির্ধারণ করে আমাকে তাঁর নিয়ামতের সাগরে হাবুডুবু খাইয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন। দুনিয়া এবং আখিরাতে তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন। (আমীন)

অনুপ্রেরণা

আরিফ আজাদ। ভাইকে আমি পারসোনালি চিনি না। জানি না দেখতে কেমন। তবুও আল্লাহ তা'আলার জন্যই ভালোবাসি। এক বন্ধুর শেয়ার করা সাজিদ সিরিজের একটি গল্পের মাধ্যমে তাঁর সাথে আমার পরিচয়। গল্পটি পড়েই ভাইয়ের ফ্যান হয়ে যাই। তারপর থেকে তাঁর সাজিদ সিরিজের সব লেখাই পড়েছি। সেখান থেকে শিখেছি। বিশেষ করে ভাইয়ের লেখার ধরনকে নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করেছি। তিনি বারবার পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু ছোট মানুষ, এজন্য হয়তো সফল হইনি। তাতে কী? ফুলের দোকানে গিয়ে ফুল কিনতে না পারলেও, ঘ্রাণ তো নেয়াই যায়! তাই না? আল্লাহ তা'আলা ভাইকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

কৃতজ্ঞতা

আশিক আরমান নিলয়। এই ভাইকেও পারসোনালি চিনি না। অথচ তাঁর প্রতিও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। লেখালেখির জগতে যখন আমি শিশু, আমাকে হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছেন। যতবারই হোঁচট খাচ্ছিলাম, ততবারই উত্তম পরামর্শ ও সাহস দিয়ে আমাকে সামনে চলার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। ভুলগুলো শুধরে দিয়েছেন। তাই, ভাইয়ের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা ভাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন।

আবু নাসিহাহ আহমেদ রোকন। সংযুক্ত আছেন মাকতাবাতুল বায়ান প্রকাশনীর সাথে। *রাসূলের চোখে দুনিয়া* বইটি উপহার পাওয়ার মাধ্যমে ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়। এরকম লাইফ চেঞ্জিং বই আমি আগে পড়িনি। এজন্য ভাইয়ের প্রতি একটু ভালোবাসা আগে থেকেই ছিলো। 'সংশয় সিরিজে'র পাঁচটি পর্ব লিখে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম। ভাই লেখালেখি চালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। লেখাগুলো মলাটবদ্ধ হবে বলে আশ্বাস দিলেন। আমিও অনুপ্রেরণা পেলাম। আবার কলম চালাতে লাগলাম। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই বই। আল্লাহ তা'আলা ভাইয়ের নেক ইচ্ছাগুলোকে কবুল করুন। আনা উহিব্বুহু ফিল্লাহ।

সম্পাদকের মন্তব্য

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী পদার্থের এনট্রপি বাড়ে। লোহা ফেলে রাখলে ধীরে ধীরে মরিচা পড়ে ক্ষয় হতে থাকে। ফেলে রাখলে স্রষ্টায় বিশ্বাসেও মরিচা পড়ে। অযুক্তি, কুযুক্তি এসে ক্ষত সৃষ্টি করে। মরিচা পড়া লোহা ঘষে মেজে পরিষ্কার করতে হয়। সন্দেহযুক্ত ঈমানও ঘষামাজা করলে দৃঢ় হয়।

সন্দেহ-সংশয় আত্মাকে অন্ধকারের কড়াল গ্রাসে বন্দি করতে চায়। কিন্তু, যার আত্মা নিভু নিভু হয়েও জ্বলছে তাকে কখনও বিভ্রান্ত করা যায় না। অন্ধকার কখনও আলোকে ঢেকে রাখতে পারে না। বরং, সামান্য প্রদীপের আলোই দূর করতে পারে বিস্তৃত আধার। আর, যখন একসাথে অনেকগুলো প্রদীপ জ্বলে উঠে?

গতবছরটি ছিলো বিশ্বাসীদের জ্বলে উঠার বছর। তরুণ লেখক আশরাফুল আলম সাকিফ তেমনই এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

বিষাক্ত পদার্থ যখন শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে, অ্যান্টিডোট দিয়ে প্রশমিত করতে হয়। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী আশরাফুল আলম নিয়ে এসেছেন বিশ্বাসীদের ধমনীতে ছড়িয়ে পড়া অবিশ্বাসের অ্যান্টিডোট।

বিবর্তন, মানবভ্রুন সম্পর্কিত কোরআনের ইঙ্গিত, মহামারীর ইসলামী সমাধান ইত্যাদি বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়ে লেখক অনেক তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করেছেন ফাতিমার জবানবন্দিতে।

এই অ্যান্টিডোট হোক অসংখ্য অসুস্থ আত্মার সুস্থতার অন্যতম বাহন। এই প্রত্যাশায়.

- ডা. আবদুল্লাহ সাঈদ খান,
এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য)

সম্পাদকের কথা

ইসলামবিদ্বেষীদের অনেক প্রশ্নই এ জগতের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এসকল প্রশ্নের একটা বড় অংশই জবাব পাওয়ার অযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাহিত্যচর্চার স্বর্ণযুগে আরবি ভাষাভাষীদের মাঝে নাযিল হওয়া কিতাবের গ্রামার বা পার্টস অব স্পীচ নিয়ে আরবি না জানা বাঙালি কোনো প্রশ্ন তুললে আপনি এর কী জবাব দেবেন? কিন্তু কেউ যখন একটা কথা বলে বা কোথাও লেখে, তখন তা মানবজাতির collective stock of knowledge-এ চিরকালের জন্য যোগ হয়ে যায়। এখন তা যতই ননসেন্স হোক, কাউকে না কাউকে এর কাউন্টার দিতেই হবে, এমনকি তা একাধিকবার একাধিকভাবেও দেওয়া লাগতে পারে। কারণ জ্ঞানের ময়দানে যুদ্ধের ময়দানের মতো শত্রুকে নিঃশেষ করা অসম্ভব। তারা তাদের মিথ্যে কথা বলেছে, আপনি আপনার সত্য কথা বলেছেন। উভয়পক্ষ বিবেচনা করে সবাই যে আপনার সত্যের দিকেই ঝুঁকবে, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই।

এই বইয়ে এরকম কিছু বিষয়কেই টাচ করা হয়েছে, যা মূলত ডাক্তারিবিদ্যা আর জীববিদ্যার সাথে সম্পর্কিত। টেকনিক্যাল আলাপে হাঁপিয়ে উঠলে বিরতি হিসেবে মাঝখানে অন্যান্য বিষয়ও আছে। বইটির পাতায় পাতায় আমি লেখকের অকল্পনীয় পরিশ্রম আর ইখলাসের ছাপ অনুভব করেছি, সঠিক ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন। লেখককে আল্লাহ যেসব বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন, তা দিয়ে ইসলামের খেদমতে লেখক যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আর যে বিষয়ে আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান দেননি, সে বিষয়ে তিনি অনর্থক হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থেকেছেন। লেখক যদি সাহিত্যজগতে পথচলা অবিরত রাখেন, তাহলে সাহিত্যমান আরো বাড়বে বলে আশা রাখি।

সম্প্রতি জনপ্রিয় হওয়া এই লেখালেখির ধারায় মলাটবদ্ধ হওয়া প্রথম নারী

প্রোটাগনিস্ট সম্ভবত ফাতিমা-ই। ধার্মিকতা ও প্রজ্ঞায় ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা এর সমান কেউই হতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহর যেসকল বান্দীরা ফাতিমার (রাঃ) দেখানো পথে যথাসাধ্য চলার চেষ্টা করে, কখনো সমাজের চাপে হোঁচট খায়, তবু লেগে থাকে, তাদেরই এক প্রতিনিধি এই বইয়ের ফাতিমা চরিত্রটি। এ দেশের বুকে ফাতিমা আসুক নেমে।

আল্লাহর কিতাব সত্য, ত্রুটিহীন। আমাদের এসব লেখালেখি দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ। আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাগুলোর ভুলত্রুটি ক্ষমা করে এগুলোকে কবুল করে নিন। আসসালামু 'আলাইকুম।

আশিক আরমান নিলয়

শার'ঈ সম্পাদকের চোখে

প্রিয় আশরাফুল আলম সাকিফ ভাইয়ের মোট বারোটি লেখার সমন্বিত মলাটবদ্ধ রূপ হলো *অ্যান্টিডোট।* বইটি পড়লে পাঠকের সামনে এ বিষয়টি ইন শা আল্লাহ সুস্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হবে যে, কতটা ত্যাগ এবং শ্রমের ফল এই *অ্যান্টিডোট।* তাছাড়া বইটি লেখকের প্রথম বই। আর প্রথম বই হয় প্রথম সন্তানের মতো— কাগুজে সন্তান। ব্যক্তিগতভাবে বইটি আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ এবং চমৎকৃত করেছে। এজন্য আমি বিশেষভাবে লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং তার আলোকিত ভবিষ্যত কামনা করছি।

মেডিকেল সাইন্সের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল বিষয়ে উত্থাপিত সংশয়-আপত্তি দূর করার নিমিত্তে মূলত বইটির রচনা। বইটি তার উদ্দেশ্যে অনেকাংশেই সফল বলে আমি মনে করি। বক্ষ্যমাণ বইয়ে শরিয়াহর দলিলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে এবং প্রতিটি দলিল সবিশেষ যাচাই-বাছাইয়ের পরই এতে উল্লেখিত হয়েছে। চতুর্মুখী ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমরা আমাদের জায়গা থেকে সাধ্যানুসারে বইটিকে নিখুঁত করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। এরপরও মানবীয় দুর্বলতার কথা আমরা নির্দ্বিধ স্বীকার করি। এ বইয়ে উত্তম এবং উপকারী যা-কিছু রয়েছে, তা একান্তই মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ এবং দান। আর এতে যদি কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে থাকে, তবে তা আমাদেরই গাফিলতি এবং অক্ষমতা। আমরা আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করি। তিনিই তো একমাত্র আশ্রয়দাতা।

সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য বইটির পাতায় পাতায় অপেক্ষা করছে চরম

বিস্ময় এবং অন্তরাত্মা-প্রশান্তকারী জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-পর্যালোচনা। তবে একটা বিষয় না বললেই নয়। বইটি পড়তে গেলে কিছু কিছু জায়গায় পাঠকের কাছে মনে হতে পারে, এ ধরনের তথ্য তো ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। এটা ঠিক যে, এর কিছু তথ্য প্রচলিত ধারার বিপরীত। সাধারণভাবে হয়তো তার বিপরীতটাই পরিচিত এবং প্রচলিত কোথাও কোথাও আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রেও পাঠকের হয়তো প্রচলিত অনুবাদের বিপরীত কিছু চোখে পড়তে পারে। যথেষ্ট গবেষণা-অনুসন্ধানের পরই এই বিষয়গুলোকে এ বইয়ে স্থান দেয়া হয়েছে। বিষয়গুলো অপ্রচলিত হলেও নব আবিষ্কৃত নয়। বরং নির্ভরযোগ্য ইলমি গ্রন্থাদি থেকেই এই মণি-মুক্তাগুলোকে তুলে আনা হয়েছে। ইতোপূর্বে সাধারণভাবে হয়তো বিষয়গুলোকে এভাবে গভীরভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু সেক্যুলার, প্রাচ্যবিদ এবং তথাকথিত প্রগতিশীল শ্রেণির আপত্তির জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো, তাদের আপত্তির মূল সূত্রই অপ্রমাণিত। আমাদের অঙ্গনে প্রচলিত কোনো বক্তব্যকে পুঁজি করেই তারা হয়তো তাদের আপত্তি ছুড়েছে, তবে যে ভিত্তির ওপর তারা তাদের আপত্তিকে স্থাপন করেছে, খোদ তা-ই ভিত্তিহীন। কোথাও-বা সেই বক্তব্য ভিত্তিহীন না হলেও নিতান্ত দুর্বল, যা গ্রহণ করলে সংশয়ের পথ খোলা থেকেই যায়। এসব ক্ষেত্রে এ ধরনের বক্তব্য-মত-অনুবাদ পরিহার করে শুধু তা-ই গ্রহণ করা হয়েছে, যা ইলমের দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ, অধিকতর বিশুদ্ধ এবং বাস্তবতার সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। চেষ্টা করা হয়েছে, সবগুলো তথ্যের সঙ্গে তথ্যসূত্র যোগ করে দেওয়ার, যাতে আগ্রহী পাঠক মূল জায়গা থেকে বিষয়গুলো যাচাই করে নিতে পারেন।

আরেকটি বিষয়, বইয়ের মূল চরিত্র ফাতিমা এবং আদনান। এর প্রতিটি গল্পে ফাতিমাকেই মূল ভূমিকায় পাওয়া যাবে। তবে গল্পগুলোকে সাজানো হয়েছে বাস্তবতা অবলম্বনে। আমাদের শহর-নগরের পরিবারগুলোতে এ চিত্রগুলো নিত্যদিনের। ফাতিমার মতো জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী এবং প্রত্যুৎপুন্নমতিত্বের অধিকারী মেয়ে হয়তো খুঁজে পাওয়া দায় হবে, তবে গল্পের চিত্রগুলো সমাজে অহরহই লক্ষ করা যায়। যেহেতু এই বই রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, এ ধরনের পরিবারের ভাই-বোনদের সামনে সত্য এবং বাস্তবতাকে পরিষ্কার এবং পরিস্ফুট করা, তাই গল্পগুলোকে নিরেট ধর্মীয়রূপে সাজানো হয়নি, যেন বাস্তবতার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যহীন না হয়ে যায়। এ কারণে মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে শরয়ি পর্দাহীনতার কিছু চিত্রও পাঠকের সামনে ফুটে ওঠবে। তবে প্রতিটি গল্পের শেষে

এ বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে তার বিধান বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে; যাতে অজ্ঞাতসারেও কেউ বিভ্রান্ত না হয়। আর এতে অতিরিক্ত আরেকটি ফায়দা যা রয়েছে, তা হলো, ইতোপূর্বে এ বিষয়গুলো যাদের কাছে পর্দাহীনতা হিসেবে জানা ছিলো না, গল্পের মধ্য দিয়ে তারা শরিয়াহ'র এ বিষয়গুলোর সঙ্গেও পরিচিত হয়ে যাবে এবং এ বিষয়গুলো সমাজে অত্যাধিক প্রচলিত হলেও তা যে শরিয়াহর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং মহান প্রতিপালকের নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ—তা সম্পর্কে অবগত হবে।

পরিশেষে বইয়ের লেখক, প্রকাশক এবং পাঠক থেকে শুরু করে যারা যেভাবে এর সঙ্গে জড়িত সকলের জন্য আন্তরিক কল্যাণকামনা করে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার ইতি টানছি। ওয়াসসালাম।

আলী হাসান উসামা
alihasanosama.com

আত্মকথন

আমার মহাপরাক্রমশালী ও বিপুল প্রতিপত্তির অধিকারী রব আল্লাহ তা'আলার সেরূপ প্রশংসা করছি, যেরূপ প্রশংসার তিনি যোগ্য। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা সেই রহমানের প্রতি যিনি আমাকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম রহমাতুল্লিল 'আলামিন, খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবের প্রতি।

একটি সময় ছিলো যখন মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতো। সেটি এখন ইতিহাস। বুদ্ধিবৃত্তিক পরাধীনতার শৃঙ্খল যেন স্বেচ্ছায় হাতে পরে নিয়েছি আমরা। এরই সাথে যোগ হয়েছে ধর্মীয় অজ্ঞতা। আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ লুফে নিয়েছে সেক্যুলার, ইসলামবিদ্বেষী, মিথ্যা জ্ঞানের মোড়কে নিজেদের সাজানো কিছু কূপমণ্ডুক। নিজের জ্ঞানহীন মস্তিষ্ককে মিশনারিদের কাছে বন্ধক রেখে তারা কুরআন এবং হাদিস অধ্যয়ন করে। তারপর আমাদের কিছু অবুঝ যুবকদের সামনে এর কল্পিত ত্রুটি উপস্থাপন করে শৈল্পিক পন্থায়। রঙ-বেরঙয়ের উপস্থাপন দেখে তারাও ভড়কে যায়। কারণ নিজেদেরও তো একই অবস্থা! অবশেষে তারাও পাড়ি জমায় 'আসহাবুশ শিমালে'র দলে। বিভিন্ন প্লাটফর্মে বিভিন্ন নামে ধর্ম উৎখাতের মিশন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে চলতে থাকে মিথ্যাচার আর অপপ্রচার। তাদের বিষাক্ত দংশনের ফলে শেষমেষ আর বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না আমার বা আপনার আদরের ভাই কিংবা বোনের। তাদের বিষাক্ত দংশনের ফলে আমাদের বিশ্বাসে সৃষ্ট বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করতেই প্রতিষেধক হিসেবে এই গ্রন্থ অ্যান্টিডোট।

স্রষ্টায় বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে এই বইতে আলোচনা খুব কম বললেই চলে। এই বইতে ইসলামবিদ্বেষী কিছু মহল কর্তৃক কুরআন এবং হাদিসের বৈজ্ঞানিক ত্রুটি হিসেবে প্রচারিত কিছু মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে মাত্র। আসলে তারা নিজেদের খুবই জ্ঞানী মনে করে। কিন্তু আমি

বলি জ্ঞানের ছিটেফোঁটাও তাদের মাঝে নেই। কেন কথাটি বললাম, সেটা বইয়ের ভিতরে তাদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন পড়েই বুঝতে পারবেন। বিভিন্ন মিশনারির বা ব্লগের সামান্য থার্ড ক্লাস কিছু আর্টিকেল অনুবাদ করে কুরআনের ভুল ধরাতে উদ্যত হয় তথাকথিত কিছু 'মুক্তমনা'। অতঃপর বুক ফুলিয়ে বলতে থাকে, 'পারলে লেখার প্রতিবাদ কলম দিয়ে কর।' তোমরা তো সামান্য মিথ্যা ও অজ্ঞতার কাঁচ দিয়ে আমাদের বিশ্বাসকে কাটতে এসেছিলে, আমি সত্যের হীরা দিয়ে কাঁচকে ঘষে দিলাম। এবার কাঁচের ভাঙ্গন ঠেকাতে পারবে তো?

প্রায় আট মাস আগে শুরু করেছিলাম 'সংশয়' নামক নাস্তিকদের অপপ্রচারের যৌক্তিক উত্তর সম্বলিত একটি সিরিজ লেখা। এই সিরিজে এমন কিছু প্রশ্ন আছে, যেগুলো প্রথমবার কুরআন পড়ার সময় আমার মনেও জেগেছিলো। শুধু আমার নয়, প্রশ্নগুলো বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করা আমার মতো লক্ষ লক্ষ যুবকের। কুরআনের অনুবাদ পড়ে মনে এরকম প্রশ্ন আসাটা অস্বাভাবিক নয়। ঠিক এই পয়েন্টেই তারা এবং আমি আলাদা। তারা যুক্তির পথ ধরে 'আসহাবুশ শিমালে'র দিকে গিয়েছে। আমি 'শুনলাম এবং মেনে নিলাম' এই নীতিতে চলে 'আসহাবুল ইয়ামিনে'র পথ ধরলাম। কিন্তু ওই যে, ইব্রাহীম ('আঃ) যেমন পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেও মনের প্রশান্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজ চোখে প্রমাণ দেখতে চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি শোনামাত্রই মেনে নেবার পরেও হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকলাম আমার মনের সকল প্রশ্নের উত্তর। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা মিলিয়েও দিলেন। প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সময়ে যদি আমি যুক্তির পথ ধরতাম, তাহলে আমার পরিণতিও হয়তো 'আসহাবুশ শিমালে'র মতোই হতো। ওয়া রব্বুকা 'আলা কুল্লি শাইয়িন হাফিয। আপনি যদি খুলনা থেকে ঢাকায় হেঁটে যাবার চিন্তা করেন, আর এই কাজে আপনার পূর্ণ ডেডিকেশান থাকে, তাহলে আপনার চলার গতি যতই মন্থর হোক না কেন, একদিন না একদিন আপনি গন্তব্যে পৌঁছবেনই। যা-ই হোক, এরপরে আস্তে আস্তে লিখতে লিখতে পঞ্চম পর্বে গিয়ে লেখা বন্ধ করে দেই। সিদ্ধান্ত নেই যে, আর লিখবো না। তখন রাহাবারের মতো সামনে চলে এলেন প্রকাশনার সাথে যুক্ত আহমেদ রোকন ভাই। ভাই দেখা করতে চাইলেন। একটি কাজে ঢাকায় গিয়েছিলাম। এই সুযোগে ভাইয়ের সাথেও দেখা করলাম। আশ্বাস দিলেন লেখাগুলো মলাটবদ্ধ করার। উদ্বুদ্ধ করলেন লেখা চালিয়ে যেতে। নতুন শক্তি পেলাম উঠে দাঁড়ানোর। আবারো রাত নেই দিন নেই, অবোলা কী-বোর্ডের উপর চলতে লাগলো এই নির্দয়ের

নিপীড়ন। ফলস্বরূপ সেই 'সংশয় সিরিজ'ই নতুন নামে মলাটবদ্ধ হয়ে বই হিসেবে এখন আপনার হাতে, যেটি আপনি পড়ছেন।

গল্পের প্রধান চরিত্রগুলো নিয়ে কিছু বলা যাক। আসলে এমন কিছু বিষয়ের উপরে গল্পগুলো লেখা হয়েছে, যেগুলোর আলোচনা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়া কারো সাথে করা সম্ভব নয়। এজন্য চরিত্র হিসেবে স্বামী-স্ত্রীকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বইটিতে গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের কাজকর্মে এবং প্রেক্ষাপটে ইসলামি শরীয়াহ আইনের লঙ্ঘন হয়েছে। বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ পরিবার এবং সমাজের প্রকৃত অবস্থা এমনই। এজন্যই ঘটনাগুলো উল্লেখ করে শেষে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পাঠকসমাজকে এগুলো শুধুমাত্র কিছু গল্প হিসেবে পড়া এবং বিবেচনা করার অনুরোধ থাকলো।

বইটি কারা পড়বেন?

আশা করি শ্রদ্ধেয় 'আলিমগণ বইটি মনোযোগ সহকারে পড়বেন। যদি কোনো ভুল থাকে, শুধরে দেবেন। এই অধম মাথা পেতে নিজের ভুলগুলো শুধরে নেবে।

এই বইটি পড়ে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে যারা মেডিকেলের শিক্ষার্থী এবং এর সাথে যাদের আরবি ভাষা এবং ইসলামের উপর বেসিক জ্ঞান আছে। এরপরে যারা ইউনিভার্সিটির যেকোনো বায়োলজিক্যাল সাইন্সের শিক্ষার্থী, যাদের আরবি ভাষার উপর বেসিক জ্ঞান আছে। তারপরে যেকোনো বিজ্ঞানের ছাত্র। আচ্ছা, তাহলে কি সাধারণ মানুষ বইটি পড়বে না? টাকা দিয়ে কিনেছেন। পড়বেন না কেন? অবশ্যই পড়বেন। আপনাদের বোঝার মতোও অনেক প্রশ্নের উত্তর আছে বইটিতে। পড়বেন, বুঝবেন আর চিন্তার জগতকে প্রসারিত করবেন। তবে বইটি শুধু গল্পের মতো পড়বেন না। একটু আস্তে আস্তে বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন। পার্থক্যটা আপনিই বুঝবেন।

আর যাদের মিথ্যাচার এবং অপপ্রচারের উত্তর হিসেবে গল্পগুলো লেখা, তাদের মধ্যকার যোগ্য ব্যক্তিরা যদি ভুল ধরতে চান, তাহলে পর্যাপ্ত প্রমাণসহ ভুল উপস্থাপন করবেন। আপনাদের সমালোচনা পজিটিভলি নেওয়া হবে, যদি সেটা যৌক্তিক হয়!

বর্তমানে কিছু মানুষকে দেখা যায়, তারা সবকিছুতেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজে।

মনে হয় তারা বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে জাস্টিফাই করবে, তারপর মানবে! কিন্তু, এই মানসিকতা সাহাবাদের (রাঃ) মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিজ্ঞান প্রমাণ ছাড়া কিছু স্বীকার করে না এবং এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু আমাদের দ্বীন তো রবের পক্ষ থেকে এসেছে। নিশ্চয়ই তা সত্য। সুতরাং, দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের সাহাবাদের (রাঃ) মূলনীতিই অবলম্বন করা উচিত। সেটি হলো, "সামি'না ওয়া আত্ব'না" অর্থাৎ, "শুনলাম এবং মেনে নিলাম।" তাহলে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' থেকে ছিটকে যাবার সম্ভাবনা নেই।

সবশেষে কিছু মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় না করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে, যারা আমাকে আমার সত্তা চিনতে সহায়তা করেছে এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে আজকের অবস্থায় আসতে সাহায্য করেছে। আমার বড় ভাই ডাঃ মিনহাজুল আলম, ডাঃ ফরিদ ভাই, রায়হান রাজু ভাই, শিহাব আহমেদ তুহিন ভাই (ভাইয়ের লেখায় আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি), বাংলা ইসলামী ব্লগ মুসলিম মিডিয়া (muslimmedia.info) এবং আমার সমস্ত পাঠক। এদের সবার প্রতিই আমি চিরকৃতজ্ঞ। আবারো আমার পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। কারণ, যখন আমি বাসায় যেতাম, তখন লেখালেখির কারণে তাঁদের হক আদায়ে ত্রুটি হয়েছে। তাঁরা এতে কিছু মনে না করে উল্টো আরো আমাকে উৎসাহ দিয়ে পাশে থেকেছেন। ইয়া রব্ব, আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি সেই ভাবে সদয় হউন, যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এই বইকে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করে নিন। আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে ক্ষমা করে দিন। তিনি ছাড়া তো ক্ষমা করার যোগ্য কেউ নেই।

আশরাফুল আলম সাকিফ
১৫ জানুয়ারি, ২০১৮
facebook.com/dr.ashrafulalamsakif

২য় সংস্করণ: কী প্রয়োজন ছিলো?

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান। অসংখ্য দরূদ নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

নাস্তিকরা যখন ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুৎসা রটাচ্ছিলো, তখন সেসব কুৎসার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা অনেককে দিয়েই লিখিয়েছেন। সেসব অপপ্রচারের মধ্যে মেডিকেল সাইন্স বিষয়ক যেসব অভিযোগ ছিলো, সেসব বিষয়ের উত্তর সম্বলিত কোনো লেখা তখন আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এজন্য এই বিষয়ে লেখার জন্য মনস্থির করলে আল্লাহ তা'আলার সহযোগীতায় লিখতে পেরেছি। তারই ধারাবাহিকতায় লেখাগুলো একসময়ে বাজারে গ্রন্থ আকারে আসে।

প্রাথমিকভাবে যখন লেখাগুলো লিখেছিলাম, তখন ভেবেছিলাম যেহেতু অভিযোগগুলো বৈজ্ঞানিক, সেহেতু এগুলোর উত্তরগুলোও বৈজ্ঞানিক পন্থায় দিতে হবে। আর বিজ্ঞান বোঝে-এমন পাঠকেরাই লেখাগুলো পড়বে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিলো। আমার লেখাগুলো গ্রন্থ আকারে আসার পরে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষই গ্রন্থটি কিনেছে এবং পড়ছে। তো যাদের পড়াশোনা বিজ্ঞানের উপর নয়, তাদের গ্রন্থটি পড়তে বেগ পেতে হচ্ছে। কেউ কেউ বুঝছেই না। এজন্য চিন্তা করলাম বইতে যে ক'টি বিজ্ঞান বিষয়ক কথা রয়েছে, সেগুলো একটু বুঝিয়ে দেই। তাহলে সকল স্তরের পাঠক সেগুলো বুঝতে পারে।

চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করতে বেশ কিছু সময় লেগেছে। কিন্তু সফল হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ্। গ্রন্থের ১ম সংস্করণের উদ্দেশ্য এটাই। গ্রন্থের শেষে 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ে এতে যেসব বিজ্ঞানের বিষয় এসেছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করা রয়েছে। এতে পাঠকেরা সহজেই গ্রন্থের লেখাগুলো বুঝতে পারবে। প্রথম মুদ্রণের সময় বলেছিলাম মূলত বিজ্ঞানের ছাত্ররাই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে। কিন্তু এই সংস্করণ আর বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। এই সংস্করণ সকল স্তরের পাঠকের জন্য। পাঠক বইটি পড়া শুরু করার আগে 'পরিশিষ্ট' অধ্যায় পড়ে নিলেই সমস্ত গ্রন্থটি বুঝতে সমস্যা হবে না ইন-শা-আল্লাহ। এছাড়াও প্রথম, দ্বিতীয় মুদ্রণে যেসকল বানানভুল, সাহিত্যের ভুল, ঘটনার বিচ্ছিন্নতা, ও মুদ্রণজনিত ভুল ছিলো, সেগুলো এই সংস্করণে ঠিক করা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার জন্যই বইয়ের ফন্টের সাইজ কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে পৃষ্ঠাসংখ্যার সাথে সাথে মূল্যও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করি পাঠক বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কিন্তু লেখাগুলোর মূল বিষয়বস্তুতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ইন-শা-আল্লাহ্ এই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণটি পাঠকমহলের নিকট আরও বরণীয় হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা এই গ্রন্থটি দ্বারা উম্মতকে আরও অধিক পরিমাণ উপকৃত করুন। গ্রন্থটিকে আমার নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

সত্যিই কি আমরা বিবর্তিত?

আদনান একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। ভার্সিটি লাইফ শেষ করে দেশের বাইরে চলে যায় উচ্চ শিক্ষার জন্য। ফিরে এসে এখন দেশে বিরাট ব্যবসা করে। স্রষ্টা সম্পর্কে সে সংশয়বাদী। স্রষ্টা আছে? নাকি নেই? এই বিষয়ে সে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। কিন্তু তার পরিবার ধার্মিক। তাই তারা তাদের ছেলের জন্য ধার্মিক মেয়ে খুঁজছিলো, যাতে সে তাকে ঠিক করতে পারে।

অপরদিকে, ফাতিমা একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষিত মেয়ে। ভার্সিটিতে মলিকুলার বায়োলজিতে পড়েছে। মলিকুলার বায়োলজিতে পড়লেও ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ থাকার কারণে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনাও করেছে। সাধ্যমতো ইসলাম প্র্যাক্টিস করার চেষ্টা করে। এখনো সম্পূর্ণ প্র্যাক্টিসিং হতে পারেনি। কিন্তু আশায় থাকে এমন একজন জীবনসঙ্গীর, যে তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবে। কিন্তু তার পরিবার তেমন ধার্মিক নয়। আর মেয়ের ইচ্ছার প্রাধান্য দেবার মতো মানসিকতাও নেই।

পারিবারিকভাবেই বিয়ে হলো। ছেলের বাহ্যিক অবস্থা দেখে ফাতিমা বিয়েতে রাজি ছিলো না। কিন্তু আজকালকার সমাজের খুব কম পিতা-মাতা বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের ছেলে-মেয়ের মতামতের গুরুত্ব দেয়। অনেক পিতা-মাতা এটা বোঝেই না যে, জোর করে তাদের উপর পাত্র বা পাত্রী চাপিয়ে দেওয়া তাদের উপর অবিচার। এতে একজন ছেলে হিসেবে অনেক কিছু করার থাকলেও মেয়েদের তেমন কিছু করার থাকে না। মেয়েরা বাবা-মা'র কথা চিন্তা করে নিজের অপছন্দ সত্ত্বেও মেনে নেয়। ফাতিমাও তাদের মধ্যেই একজন। বিয়ের কিছুদিন পরে আদনানের সংশয়ের

ব্যাপারে জেনে ফাতিমা প্রচণ্ড ধাক্কা খায়! এই অবস্থায় কী করা উচিত? বাবা-মাকে জানাবে কি না? কীভাবে তাকে ঠিক করা যায়? সবসময় এসব চিন্তা করতে করতে অনেক দিন চলে যায়। ফাতিমা মাঝে মাঝে ইসলামের যৌক্তিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করতো। কিন্তু আদনানের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিলো না।

বৃহস্পতিবার রাত। আদনান ও ফাতিমা ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ ফাতিমার ঘুম ভেঙে গেলো। মোবাইলে সময় দেখলো চারটা পনেরো বাজে। চোখ দুটি মুছে অন্যদিকে ফিরে দেখে আদনান ঘুমাচ্ছে। সে আদনানের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আর ভাবছে কীভাবে আদনানকে সংশয় থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। আদনান বাম দিকে কাত হয়ে শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে নড়েচড়ে পাশ ফিরে ডান কাত হয়ে ঘুমাতে থাকলো। ফাতিমা দেখছে আর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কথা চিন্তা করছে। মানুষ যদি একপাশ হয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে, তাহলে তার অন্য পাশের কোষগুলো নষ্ট হয়ে যাবে! আল্লাহ যদি মানুষকে ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন না করাতেন? ব্যাপারটি যদি মানুষের ঐচ্ছিক হতো? তাহলে তো রাতে বারবার ঘুম থেকে উঠে পাশ পরিবর্তন করে ঘুমাতে হতো। অন্তর থেকেই ফাতিমা শুকরিয়া আদায় করলো।

"ব্যাপারটি আদনানকে ডেকে একটু বুঝিয়ে বলি। দেখি ও কী বলে।"-এই চিন্তায় তখনই আদনানকে ডাকলো। কিন্তু আদনান সাড়া দিলো না। ফাতিমাও নাছোড়বান্দী।

- "এই আদনান। আদনান। এই আদনান।"

- "হুম।"

- "একটু উঠবা?"

আদনান উঠে চোখ মুছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, "কেবল চারটা তেইশ বাজে। এখন ডেকে তুললে কেন?"

- "উম, একটি বিষয়ে কথা বলতাম।"

- "এই রাতে? কাল সকালে বললে হতো না?"

- "না। যে ব্যাপারে কথা বলবো, সেটি তোমার ক্ষেত্রে শুধু রাতেই ঘটে। কারণ তুমি দিনে আর কখনো ঘুমাও না।"

- "ঘুমানো নিয়ে আবার কী বলবে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলছি। দেখো তুমি বাম কাতে শুয়ে ছিলে, কিছুক্ষণ পরে পাশ ফিরে ডান কাত হয়ে শুলে। এ ব্যাপারে কি কখনো ভেবে দেখেছো? চিন্তা করো, এই কাজের নিয়ন্ত্রণ যদি তোমার হাতে আল্লাহ তা'আলা দিয়ে দিতেন, তাহলে তোমার ঘুমাতে কতই না সমস্যা হতো! ঘুম থেকে উঠে উঠে তোমার পাশ ফিরে শুতে হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঘুমন্ত অবস্থাতেই তোমার পাশ পরিবর্তন করে দেন, যাতে তুমি ঠিক মতো ঘুমাতে পারো, তোমার দেহের কোষগুলোর যেন কোনো ক্ষতি না হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সূরা কাহফ এর ১৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডান দিকে ও বাম দিকে।' দেখো তিনি তাঁর বান্দার জন্য কত সুবিধা করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।"

ফাতিমা একবার যখন কিছু বলার জন্য মনস্থির করে, তখন সেটি বলেই ছাড়ে। আজও আদনান বুঝতে পেরেছে যে, ফাতিমার কথা না শুনে আজ আর ঘুমানো যাবে না। তাই দীর্ঘ সময় জেগে থাকার প্রস্তুতি নিলো আদনান। তারপর কিছুটা বিরক্তির সুরে আদনান বললো, "আরে এটা তো মানুষের একটা প্রোটেক্টিভ সিস্টেম! মানুষ যখন এক দিকে অনেকক্ষণ চাপ দিয়ে থাকে, তখন সেখানে রক্ত সঞ্চালন কমে যায়। এই অবস্থা অনেকক্ষণ থাকলে সেখানের টিস্যুগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সেখান থেকে ব্রেইনে সিগনাল যায়। তখন আমরা অন্যদিকে ফিরে শুই। এটাকে এত গভীরভাবে ভাবার কী আছে?"

ফাতিমা বললো, "সে তো ঠিকই। কিন্তু দেখো, কোনো কিছুই কি একা একা হয়? সব কিছুরই তো নিয়ন্ত্রক থাকে, তাই না?"

আদনান বললো, "হুহ! কে বলেছে তোমাকে কোনোকিছু একা একা হয় না? এই যে তুমি আর আমি এবং এই বিশাল জীবজগৎ তো নিজে থেকেই তৈরি হয়েছে! এখানে প্রকৃতিই ভাইটাল রোল প্লে করে।"

- "মানে?"

আদনান বললো, "মানে হলো, প্রথমে এই পৃথিবীতে প্রাণ বলতে কিছুই ছিলো না। প্রাথমিকভাবে, বিবর্তনবাদীদের মতে যখন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ছিলো না, তখন এককোষী অণুজীব সৃষ্টি হয়। তারপরে এককোষী অণুজীব থেকে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব। সেখান থেকে আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে এই পৃথিবীর সমস্ত জীবজগৎ। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় একটি ভাইটাল ফোর্স কাজ করে যেটি তাদের জটিল অবস্থার দিকে দিকে ধাবিত করতে সহায়তা করে। আর জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তাদের অতিবাহিত জীবদ্দশাতেই।[১] যেমন ধরো, খাটো গলাবিশিষ্ট জিরাফ থেকে লম্বা গলাবিশিষ্ট জিরাফ তৈরি হয়েছে। কারণ এটি এর জীবদ্দশায় উঁচু উঁচু গাছ থেকে পাতা খেতে খেতে এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে।"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "কী? তাই নাকি? তুমি কয় যুগ আগের বিবর্তন সম্পর্কে বলছো? বর্তমানে জিনতত্ত্ব অনুযায়ী, জীবের বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় জিনের মাধ্যমে বাহিত হয়, জীবের জীবদ্দশাতে এর কোনো পরিবর্তন হয় না। যদিও হয়, সেটি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে।"

আদনান বিরক্ত হয়ে বললো, "আরে আমাকে শেষ করতে দাও! বিজ্ঞানের কোনোকিছুই একবারে প্রমাণিত হয় না। একটার পর একটা গবেষণা হয়। কিছু ভুল প্রমাণিত হয়। আবার নতুন কিছু উদ্ভাবিত হয়। এভাবেই চলতে থাকে। জীবের জীবদ্দশায় এর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়-এই তত্ত্বটি মূলত ল্যামার্ক দিয়েছিলেন। তাঁর তত্ত্বে কিছু ভুল থাকায় পরবর্তীকে চার্লস ডারউইন নতুন কিছু তত্ত্ব দেন। তিনি বলেন, 'সকল প্রজাতিই তাদের একটি পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে এবং সময়ের আবর্তনের কারণে যুগ যুগ ধরে পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে থাকতে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।'[২] তিনি একটি দ্বীপে দেখেছিলেন সেখানে একই ধরনের কিছু পাখির ভিন্নরকম ঠোঁট। কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট, কোনোটা তীক্ষ্ণ, কোনোটা আবার একটু চওড়া। পরিবেশের সাথে টিকে থাকতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়েছে। সেই অনুযায়ী তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো যোগ হয়েছে। একে ন্যাচারাল সিলেকশান বলে।"

আদনানের কথার মাঝে ফাতিমা বললো, "ওয়েট...ওয়েট। আমার জানামতে এটা ভ্যারিয়েশান। একটি জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহের সর্বোচ্চ কতটুকু পরিবর্তন হতে

পারবে, সেটি তার জিনে সংরক্ষিত থাকে। আর এটা সীমাবদ্ধ। একে বলা হয় 'জেনেটিক পুল'। এভাবে জীবের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু এর কারণে তো একটি প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে পরিবর্তিত হবে না। ডলফিন কখনো বাঘ হবে না। আর বাঘ কখনো ঈগল হবে না, তাই না? তাই এগুলো ইভোলিউশানের প্রমাণ হতে পারে না!"

আদনান বললো, "আবার কথার মাঝে বাম হাত দিলে! আমাকে শেষ করতে দাও। ডারউইনের এই তত্ত্বেও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো। এর পরে বিবর্তনবাদীরা তাঁর এই তত্ত্বের সাথে মিউটেশানকে যুক্ত করে নতুন তত্ত্ব দেন। এবং তখন থেকে এটি নিও-ডারউইনিজম নামে পরিচিত। তুমি কি জানো মিউটেশান কী?"

ফাতিমা উত্তর দিলো, "আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে জেনেটিক তথ্যের বাহক হিসেবে ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে ডি.এন.এ নামক নিউক্লিক এসিড। ডি.এন.এ'র মধ্যে থাকে জিন। জিন হলো, বংশগতির আণবিক একক, যা জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। জিন প্রজাতির তথ্যধারণ করে এবং প্রাণীর কোষ বিভাজনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর মাধ্যমেই প্রজাতির গুণ অব্যাহত থাকে। মিউটেশান হলো এই জিনে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা ভাঙন। মিউটেশান কোষ বিভাজনের সময়, অতিবেগুনি রশ্মিতে বা রাসায়নিক পদার্থের কারণে হতে পারে।"

আদনান বললো, "বাহ! ভালোই তো জানো দেখছি। তোমাকে বোঝাতে তাহলে সহজ হবে। পৃথিবীর এই দীর্ঘ সময়কালে জীবজগতের শুরু থেকে এভাবে একটার পর একটা এলোমেলো মিউটেশান হতে হতে জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এসেছে। আর এভাবে বৈশিষ্ট্য যোগ হতে হতে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর অতিক্রম করার ফলে আমাদের মতো উন্নত প্রাণীর আবির্ভাব। এবার বুঝেছো?"

ফাতিমা বললো, "তোমার কথা বুঝেছি। কিন্তু আমার জানামতে এলোমেলো মিউটেশানে কোনো নতুন তথ্য যোগ হয় না। আর এভাবে এলোমেলো মিউটেশানে সার্বিকভাবে একটি প্রাণীর তেমন উপকার হয় না।"

আদনান বললো, "কেন? জিন ডুপ্লিকেশনের মাধ্যমেই নতুন তথ্য যোগ হয়। আর কে বলেছে মিউটেশানে প্রাণীর উপকার হয় না? কেন! তুমি পড়নি যে,

মিউটেশনের ফলে একটি কোষের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে, আবার একটি কোষের কার্যক্ষমতা বেড়েও যেতে পারে? তাহলে শোনো। 'PCSK9' জিনের মিউটেশান বহনকারী মানুষ হৃদরোগে কম ভোগে যখন এই জিনের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। কারণ তাদের লিভার বেশি পরিমাণ 'LDL' শোষণ করতে পারে। এতে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে। এছাড়াও মানুষের রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকে। এই হিমোগ্লোবিনের 'S' চেইনে মিউটেশান ঘটলে লোহিত রক্তকণিকার আকারে হালকা পরিবর্তন আসে। এতে মানুষের ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। এগুলো তো উপকারী মিউটেশান। তাই না?"

ফাতিমা বললো, "এগুলো তোমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। জিন ডুপ্লিকেশনের কার্যকারিতা নিয়ে বিখ্যাত বায়োকেমিস্ট মাইকেল বেহে'র রিসার্চ পেপার রয়েছে। তিনি বলেন, 'জিন ডুপ্লিকেশনের কোনো নির্দিষ্ট কার্যকারিতা নেই'।[২১] আর নতুন তথ্য বলতে আমি বুঝিয়েছি, বিবর্তনের ধারাতে একটি নতুন কার্যকারি অঙ্গাণু তৈরির জন্য ডি.এন.এ'তে যে পরিমাণ তথ্য দরকার হয়। আর i¨vÛg বা এলোমেলো মিউটেশানে এমন ফাংশানাল তথ্য যোগ হবার উদাহরণ প্রকৃতিতে নেই। আর এটা সম্ভবও নয়। এই সেদিনের কথা চিন্তা করো। আমি বাইরে থেকে আসার পরে দেখলাম তোমার অবস্থা খারাপ। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে বললে যে, 'লাগেজে কেন লক দিয়ে গিয়েছো? তোমার লাগেজে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিলো। এক ঘণ্টা চেষ্টা করেও আমি লক খুলতে পারিনি।' এখন দেখো, ওই লাগেজের লকে চারটি ডায়াল ছিলো। প্রত্যেক ডায়ালে এক থেকে দশ পর্যন্ত ডিজিট ছিলো। আমি এখানে একটি কম্বিনেশান সেট করেছি। ধরো সেটা, '৮ ৩ ৪ ১' ছিলো। তাহলে এটা হলো, আমার দেওয়া একটি ফাংশানাল বা কার্যকর তথ্য। এখন, লক'টি এই কম্বিনেশান ছাড়া আর কোনো কম্বিনেশানে খুলবে না।. তুমি যদি এই সংখ্যাটি নিজের ইচ্ছামতো উল্টাপাল্টা কম্বিনেশান তৈরি করে বের করতে যাও, তাহলে কমপক্ষে হলেও তোমার দশ হাজার কম্বিনেশান তৈরি করতে হবে। যেটি তৈরি করা এক ঘণ্টায় তোমার জন্য সম্ভব নয়। একইভাবে এলোমেলো মিউটেশানের ফলে আমাদের দেহের একটি মধ্যম আকৃতির কার্যকর প্রোটিন তৈরি করতে $১০^{৭৭}$ টি কম্বিনেশান তৈরি করতে হবে, যা আমাদের মিল্কিওয়ের মোট অণুর সংখ্যা থেকেও বেশি।[৫] যেটি ঘটার জন্য তিন বা চার বিলিয়ন বছর সময় পর্যাপ্ত নয়। আমাদের দেহে তাহলে কত বিচিত্র ধরণের কার্যকর প্রোটিন রয়েছে। তাহলে এত ফাংশানাল প্রোটিন i¨vÛg

বা এলোমেলো মিউটেশানের ফলে তৈরি হবার সম্ভাবনা কতটুকু? নেই বললেই চলে! বুঝেছো?[৩]"

ব্যাপারটি মনে হলো, আদনানের চিন্তার জগতে সজোরে আঘাত করেছে। কোনো কথা না বলে চুপ করে আছে আদনান। তখন ফাতিমা বললো, "তারপরে তুমি বলেছো, 'মিউটেশানে একটি কোষের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে, আবার একটি কোষের কার্যক্ষমতা বেড়েও যেতে পারে।' একটি কোষের কার্যকারিতা বাড়লেই কি সেটা আমাদের জন্য উপকারী হয়? আচ্ছা ধরো, তোমার অগ্নাশয়ের 'আলফা' কোষে মিউটেশান হওয়ার ফলে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই কোষের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেলে তোমার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যাবে। তখন তুমি ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হবে। এতে কি উপকার হলো? তারপরে তুমি কিছু উপকারী মিউটেশানের উদাহরণ দিলে। আমি সেগুলোর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরছি। তুমি বলেছো, কারো যদি 'PCSK9' জিনের মিউটেশান হয়, তাহলে তার হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায়। কিন্তু এখানে একটি সমস্যা আছে। আমাদের দেহের বিভিন্ন কাজে, যেমন-কোষঝিল্লি, হরমোন, ভিটামিন-ডি ইত্যাদি তৈরিতে কোলেস্টেরলের দরকার হয়। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে গেলে আমাদের দেহের এই কাজগুলোতে সমস্যা হবে। এর ফলাফল প্রধানত আমাদের ব্রেইনে গিয়ে পড়ে। আমাদের মধ্যে তখন বিষণ্ণতা, হিংস্রতা ও বিভিন্ন মস্তিষ্কের রোগ, যেমন- পারকিনসন্স ডিজিজ ডেভেলপ করতে পারে। এজন্য সাধারণ মানুষের জন্য এই জিনের মিউটেশান উপকারী নয়।[৪] তারপরে তুমি বললে রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিন চেইনে মিউটেশান হলে নাকি ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক। কিন্তু এখানেও সমস্যা আছে। হিমোগ্লোবিনের 'S' চেইনে মিউটেশান হলে যে রোগ হয়, তাকে বলা হয় 'সিকেল সেল অ্যানিমিয়া'। সিকেল সেল অ্যানিমিয়া'র রোগীদের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কমে যায়। ফলে তারা জটিল শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যায় ভোগে। এছাড়াও হাড়ে ব্যথা, রক্তশূন্যতা, হার্ট ফেইলিওর, প্লীহা বড় হয়ে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে।[৫] একদিক থেকে উপকারী হলেও অন্যদিকে এসব মিউটেশান ক্ষতিকর ইফেক্ট ফেলে। আচ্ছা আদনান, 'গরু মেরে জুতা দান' কাকে বলে জানা আছে?"

আদনান কিছুটা ভড়কে গেল। তারপর বললো, "হ্যাঁ, জানি! কিন্তু এই প্রসঙ্গ

এখানে আসলো কেন? আমি কি এগুলো কিছু জিজ্ঞাসা করেছি?”

ফাতিমা বললো, “র‍্যান্ডম মিউটেশানও আমাদের গরু মেরে জুতা দান করে। এ তো সেই যুক্তির মতো হয়েছে যে, এক ব্যক্তি জন্মানোর সময় একটি পা নিয়ে জন্মেছে। এক ব্যক্তি বললো, এটা তার জন্য ভালো হয়েছে। পা নষ্ট হওয়ার কারণে সে মটর সাইকেল চালাতে পারবে না, তাই সে রাস্তায় দূর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে মুক্ত। এরকম যুক্তিকে তো যুক্তিই বলা যায় না, বরং কুযুক্তি বলাও ভুল! আরেকটি বিষয় হলো, প্রতিটা মিউটেশানই একটি দুর্ঘটনা। বেশিরভাগ সময়ই এটা এত পরিমাণ ক্ষতি করে যে, আমাদের কোষ সেটাকে ঠিক করতে পারে না। একটি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা এলোমেলোভাবে পরিবর্তন এলে সেটা ভালো কিছু দেয় না। যেমন, ভূমিকম্প হলে একটি সুন্দর বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচারে পরিবর্তন আসবে। এতে কখনোই তার স্ট্রাকচার সুন্দর হবে না। আর তেমনই আমাদের দেহে মিউটেশান হলে, সেটার ফলাফল ভালো কিছু সাধারণত হয় না। যেমন- Mongolism, Down syndrome, Albinism, Dwarfism, cancer ইত্যাদি মিউটেশান ঘটিত রোগগুলো তো আমাদের চারপাশেই আমরা দেখতে পাই।[৬] তোমরা তো শুধু বিজ্ঞানীদের দোহাই দাও। বলো যে, এত এত বিজ্ঞানী ন্যাচারাল সিলেকশান এবং র‍্যান্ডম মিউটেশানের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তিকে বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রচুর বিজ্ঞানী এবং ডাক্তার যে, এই প্রক্রিয়ার মানুষের উৎপত্তিকে রূপকথার গল্প মনে করে, সেটা তোমরা কৌশলে এড়িয়ে যাও![৭] এভাবে প্রায় সকল স্থানেই বিবর্তনবাদী প্রোপাগ্যান্ডিস্টেরা দ্বিমুখিতা দেখায়।”

“তাহলে কি উপকারী মিউটেশান নেই? ব্যাক্টেরিয়া যে অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, এটা তো তাদের জন্য উপকারী। তাহলে?” আদনানের প্রশ্ন।

ফাতিমা বললো, “হ্যাঁ, উপকারী কিছু আছে। প্রাণীদের মধ্যে সময়ের সাথে সাথে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে কিছু কিছু পরিবর্তন আসে। এবং এটি জিনের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের অনুপাতের মাঝে পরিবর্তনের ফসল। একে বলা হয় মাইক্রো ইভোলিউশান।[৮] যেমন, ফিঞ্চ পাখির ঠোঁট ছোট-বড় হওয়া, ব্যাক্টেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি, ফ্লু ভাইরাসের বিভিন্ন স্ট্রেইন, প্রাণীর গায়ের রঙ এবং ডিজাইন, পশমের পরিমাণ, চোখের মনির রঙ, উচ্চতা ইত্যাদি। এই

ছোট ছোট পরিবর্তনে ফিঞ্চ পাখি তো টিয়া পাখি হয়ে যায় না। E. Coli ব্যাক্টেরিয়া তো Shigella বা Salmonella হয়ে যায় না। আবার ফ্লু ভাইরাস এইডস ভাইরাস হয়ে যায় না। শুধু তাদের মধ্যে কিছু ভ্যারিয়েশান আসে। বিবর্তন বলতে তুমি এগুলো বোঝালে, আমার তাতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু তুমি যদি বিবর্তন বলতে সেই এককোষী জীব থেকে ন্যাচারাল সিলেকশান এবং অনিয়ন্ত্রিত i¨vÛg মিউটেশানের ফলে মানুষসহ সম্পূর্ণ জীবজগতের উৎপত্তি বোঝাও, অর্থাৎ যাকে ম্যাক্রো ইভোলিউশন বলে, তাহলে আমার এখানে ঘোর আপত্তি আছে!"

এতটুকু শোনার পরে আদনান বিছানা থেকে নেমে ওয়াশরুম থেকে মুখে পানি দিয়ে আবার বিছানায় এসে বসলো। তারপর উৎসুক মনে জিজ্ঞাসা করলো, "তাহলে এত এত ফসিল রেকর্ড আছে। সেগুলোর কী হবে?"

ফাতিমা বললো, "ফসিল কী প্রমাণ করেছে? আচ্ছা ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোশান কী? বলো তো!"

এগনোস্টিক হবার সুবাদে ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও বিবর্তন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলো আদনান। তাই ফাতিমার করা প্রশ্নটিও অজানা ছিলো না। তাই প্রশ্নের উত্তরে আদনান বললো, "জিওলজিকাল টাইম স্কেলে খুব ক্ষুদ্র একটি সময়ে ভূস্তরে প্রাণীজগতের প্রায় ২০টি পর্বের প্রাণীর একত্রে আগমন ঘটে। একে ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোশান বলে।"

ফাতিমা বললো, "এই তো খুব সুন্দর জানো। আচ্ছা, তাহলে ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডে হঠাৎ করে এত জটিল জটিল প্রাণীর আবির্ভাবের ব্যাখ্যা তো i¨vÛg মিউটেশান ও ন্যাচারাল সিলেকশান দিয়ে দেওয়া যায় না। যেখানে একটি ফাংশানাল প্রোটিন তৈরি হবার সম্ভাবনা $১০^{৭৭}$-এ একটি মাত্র। আর এই পিরিয়ডে এত জটিল সব প্রাণীর এত ফাংশানাল প্রোটিন নতুনভাবে i¨vÛg মিউটেশানের ফলে আসা কীভাবে সম্ভব? সুতরাং, 'ইউনিভার্সাল কমন অ্যানসেস্ট্রি' তো এখানেই থেমে যায়। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। আর একটি প্রজাতি থেকে আস্তে আস্তে বিবর্তিত হয়ে অন্য একটি প্রজাতি হতে গেলে এর মাঝে দুই প্রজাতির কিছু মিক্সড বৈশিষ্ট্যের প্রাণী বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। একে বলে ট্রানজিশনাল স্পিশিস। এই ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডে যে সমস্ত প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে, সেগুলো হঠাৎ করেই তাদের কমপ্লেক্সিটি নিয়ে উদ্ভব হয়েছে। এদের কোনো অ্যান্সেস্ট্রাল স্পিশিসের

ফসিল পাওয়া যায় না।[৯] এবং প্রি-ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ডের প্রাণী থেকে যে ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ডের প্রাণী হয়েছে, আর এর মাঝে যে ট্রানজিশনাল স্পিশিস ছিলো - এমন কোনো প্রমাণ বিজ্ঞান মহলে নেই।[১০] এমনকি এখন পর্যন্ত এরকম ট্রানজিশনাল স্পিশিসের সন্ধান মেলেনি। বিবর্তনবাদীরা কিছু কুমির জাতীয় প্রাণীর চোয়ালে অবস্থিত নাকের ছিদ্রের অবস্থানের পরিবর্তন দেখিয়ে, বিভিন্ন প্রাণীর হাতের অস্থির মিল দেখিয়ে ট্রানজিশনাল স্পিশিসের প্রমাণ দেখাতে চায়। কিন্তু এখানে কমন ডিজাইনারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

আদনান জিজ্ঞাসা করলো, "কমন ডিজাইনার বলতে আবার কী বুঝালে তুমি?"

ফাতিমা বললো, "ধরো, তুমি দুইটি গাড়ি তৈরি করলে। একটির সাইলেন্সার দিলে পাশে। এবং আরেকটির সাইলেন্সার দিলে পিছনে। এখন কি আমি বলবো যে, এই প্রথম গাড়ি থেকে দ্বিতীয় গাড়ি বিবর্তিত হয়েছে? নাকি বলবো যে, দুটি গাড়িই তুমি তৈরি করেছ কিন্তু ডিজাইনে একটু ভ্যারিয়েশান এনেছ?"

আদনান উত্তর দিলো, "দুটোই আমি তৈরি করেছি। কিন্তু জড় বস্তুর সাথে তুমি জীবকে মেলাতে পারো না।"

ফাতিমা বললো, "জড় বস্তুর সাথে জীবকে মেলানো যায় না সত্যিই। কিন্তু প্রত্যেকটা প্রাণীই প্রিভিয়াসলি ডিজাইনড। আর এই ডিজাইনগুলো আমাদের কোষের নিউক্লিয়াসের অবস্থিত ক্রোমোজমের ভিতরে ডি.এন.এ'তে থাকে। তাই ওই কুমির জাতীয় প্রাণীর নাকের ছিদ্রের অবস্থানের পার্থক্যও একজন ডিজাইনারের দুটি আলাদা ডিজাইন। আমরা যখন কোনো সফটওয়্যার দেখি, এর পিছনে একজন প্রোগ্রামারের কথা চিন্তা করি। যখন কোনো গাড়ি দেখি, এর পেছনে একজন বুদ্ধিমান সত্ত্বার গাড়ি তৈরিকারীর কথা ভাবি। আমাদের ডি.এন.এ'তে বিদ্যমান তথ্যগুলোও কোনো এলোমেলো তথ্য নয়। এগুলোতে রয়েছে নিখুঁত নকশা। দেখো, আমাদের দেহের প্রত্যেকটি কোষেই কিন্তু একই রকমের ডি.এন.এ থাকে। কিন্তু আমাদের হৃদপিণ্ডের কোষ আলাদা, লিভারের কোষ আলাদা, কিডনির কোষ আলাদা। এটার কারন হলো আমাদের প্রত্যেক কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ডি.এন.এ এর জিন একেক কোষে একেক ভাবে সক্রিয় হয় আর এই তথ্য আগে থেকেই প্রত্যেক কষে বিদ্যমান। এই তথ্য তাহলে

কে দিল? এ থেকেই জীবনের উৎপত্তির পিছনে একজন বুদ্ধিমান সত্ত্বার অস্তিত্ব বোঝা যায়। বুঝলে?"

আদনান কোনো কথা বললো না। ফাতিমা আবার বলতে শুরু করল, "আচ্ছা তুমি শেয়ারে যে সফটওয়্যার ফার্মটা চালাও, সেখানে নিশ্চয়ই কিছু প্রোগ্রামার কাজ করে। তাই না?"

"হুম।" মাথা নাড়িয়ে বললো আদনান।

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা। তাহলে সেই প্রোগ্রামার ঠিকই জানে যে, কীভাবে কোডিং করলে সফটওয়্যারে কেমন ইফেক্ট আসবে। এখন, তুমি যদি একটি বাচ্চাকে সেখানে কোডিং করতে বসিয়ে দাও, যার কোনো বুদ্ধি নেই, তাহলে কী-বোর্ড চেপে অনেক অক্ষর সে তৈরি করতে পারবে। কিন্তু তুমি সফটওয়্যারে যেমন ইফেক্ট চাচ্ছো, সেটা পাবে না। তাহলে আমাদের ডি.এন.এ'র এত পরিমাণ তথ্যের সুনির্দিষ্ট কোডিং কি প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং এলোমেলো মিউটেশানের ফলে বাহ্যিক প্রভাব ছাড়াই নিজ থেকে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব? যদি সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হও, তাহলে এখানে কোনো সম্ভাবনাই তুমি দেখবে না।"

ফাতিমাকে থামিয়ে আদনান বললো, "কিন্তু আমাদের সাথে শিম্পাঞ্জির ডি.এন.এ'র ৯৬ শতাংশ বেস পেয়ারের মিল পাওয়া যায়।[১১] এটা কি প্রমাণ করে না যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে?"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "তাহলে তো কলা এবং তোমার পূর্বপুরুষও এক। কারণ কলার সাথেও তোমার অনেক জেনেটিক মিল। হা হা। আসলে, এখানে শুভঙ্করের ফাঁকি আছে! মানুষের ডি.এন.এ'তে ৩.২ বিলিয়ন বেস পেয়ার আছে। এর চার শতাংশ হয় ১২ কোটি ৮০ লক্ষ। তাদের সাথে আমাদের ডি.এন.এ'র বেস পেয়ারে মাত্র ৪ শতাংশ পার্থক্যের কারণে সম্পূর্ণ জিনোমে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ বেস পেয়ারের পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়। এত বিপুল পরিমাণ পার্থক্য কি প্রজাতি আলাদা হবার জন্য যথেষ্ট নয়?"

আদনান বললো, "ও, এভাবে তো চিন্তা করিনি!"

ফাতিমা বললো, "তোমাকে তাহলে অন্যভাবে চিন্তা করাই। কলার সাথে

মানুষের জেনেটিক সিমিলারিটি ৬০ শতাংশ।[১২] কিন্তু কলার সাথে আমাদের কিছু কি মেলে? যদি জেনেটিক সিমিলারিটি একই পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি হবার প্রমাণ বহন করে, তাহলে আমাদের সাথে কলার ৬০ শতাংশ মিল থাকার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা ১ শতাংশ'ও নয়। তাহলে কেন এমন হলো? জানতে চাও?"

আদনান বললো, "বলো, শুনি!"

ফাতিমা একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর বললো, "আসলে সম্পূর্ণ জিনোমের মাত্র ১.৫ শতাংশ প্রোটিন এনকোড করে। অবশিষ্ট ৯৮.৫ শতাংশই কোনো প্রোটিন কোড করে না।[১৩] এই অংশকে আগে 'ডার্ক ম্যাটার অব দ্য জিনোম' বা 'জাঙ্ক ডি.এন.এ' বলা হতো। এবং এই 'জাঙ্ক ডি.এন.এ'কে বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে প্রচার করা হতো। কিন্তু ২০০৭ সালে বিবর্তনবাদীদের হতাশ করে আবিষ্কৃত হলো, 'জাঙ্ক ডি.এন.এ'র কাজ। বিভিন্ন প্রাণীর ডি.এন.এ'র বেস পেয়ারগুলোতে প্রচুর মিল পাওয়া গেলেও, এই 'জাঙ্ক ডি.এন.এ' বা ডি.এন.এ'র নন-কোডিং অংশই মূলত এত বৈচিত্র্যের কারণ। এই নন-কোডিং অংশই জিন এক্সপ্রেশানে সহায়তা করে এবং আর্কিটেকচারাল প্ল্যানিং করে।[১৪] এখন বুঝেছো যে, শিম্পাঞ্জির সাথে ৯৬ শতাংশ মিল থাকলেও আমরা একে অপরের থেকে অনেক আলাদা?"

"আরো শুনতে চাও?" আদনানকে চুপ থাকতে দেখে আবার প্রশ্ন করলো ফাতিমা।

আদনান বললো, "তুমি আর কী জানো?"

ফাতিমা বললো, "আরো অনেক কিছুই জানি। তাহলে একটু জেনেটিক্স দিয়ে বিবর্তনবাদের অযৌক্তিকতা তুলে ধরি। 'এপ' জাতীয় প্রাণীর একটি কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৮ এবং মানুষের ৪৬। বিবর্তনবাদীদের ধারণা যে, এপ জাতীয় প্রাণীর ১২ এবং ১৩ নং ক্রোমোজোম একত্রিত হয়ে হয়ে মানুষের ২ নং ক্রোমোজোম হয়েছে। এজন্য শিম্পাঞ্জির ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৮ থেকেছে এবং মানুষে কমে ৪৬ হয়েছে। এটি দিয়ে তারা কমন অ্যানসেস্ট্রি প্রমাণ করতে চাইলো। কিন্তু পরবর্তীতে সেটাও ভুল প্রমাণিত হলো।[১৫] যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেয়া

হয় যে, কোনো এক সময় ফিউশানের মাধ্যমে 'এপ'-এর ২৪ জোড়া ক্রোমোজোম ফিউজড হয়ে মানুষে ২৩ জোড়ায় পরিণত হয়েছে, তাহলে এরকম উদাহরণ প্রকৃতিতে এখনো অনেক থাকার কথা। অর্থাৎ, বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় থাকা একই স্পিশিসের ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের মধ্যে প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়ার কথা। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন পর্যন্ত প্রকৃতিতে একই স্পিশিসের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক ক্রোমোজোম সংখ্যার 'সুস্থ-সবল' প্রাণীর উদাহরণ একটিও পাওয়া যায় না। আর যদি অসুস্থ স্পিশিস জন্মায়, তাহলে 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট'-এর নীতি অনুযায়ী সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রজাতি আর সামনে আগাবে না। সো স্যাড!"

আদনান এবারও চুপ। ফাতিমাই আবার বললো, "আচ্ছা, তর্কের খাতিরে আবারো ধরে নিলাম যে, কোনো এক সময় 'এপ'-এর ২৪ জোড়া ক্রোমোজোম ২৩ জোড়ায় পরিণত হয়েছিলো। এখন ধরো, একটি মাদী 'এপ' এর সাথে একজন পুরুষ মানুষের বিয়ে হলো। এখন 'এপ'-মায়ের গর্ভে '24 X/X' ডিম্বাণুর সাথে যখন 'এপ' থেকে বিবর্তিত পুরুষ মানুষের '23 X/Y' শুক্রাণুর মিলন হবে, তখন কি এদের বাচ্চা সুস্থ হবে? এম্ব্রায়োলজি ও জেনেটিক্স বলছে তা কখনোই হবে না। কেননা, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা স্পিশিসের মধ্যে আছে জেনেটিক ব্যারিয়ার, যার কারণে এক স্পিশিসের সাথে অন্য স্পিশিসের হাইব্রিড করা যায় না। কারণ তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাইগোটের গর্ভপাত ঘটে। কিছু কিছু প্রাণীতে হাইব্রিডাইজেশান করা গেলেও স্বাভাবিক কোনো প্রাণী জন্মায় না। তখন তাদের প্রজনন ক্ষমতাই থাকে না।[১৬] তাহলে স্পিশিস সামনে আগাবে কী করে?"

আদনান বললো, "তাহলে একই প্রজাতিতে ভিন্ন ক্রোমোজোম সংখ্যার প্রাণী কি মোটেই পাওয়া যায় না?"

ফাতিমা বললো, "পাওয়া যায়। তবে সেগুলো সুস্থ হয় না। সবক্ষেত্রেই তারা রোগাক্রান্ত হয় ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। যেমন, মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬টি বা ২৩ জোড়া। প্রতিটি জোড়াকে এক থেকে শুরু করে ২৩ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়। যদি শুধু ১টি ক্রোমোজোম বা একটির কিছু অংশ গিয়ে অন্য ক্রোমোজোমে যোগ হয়, তাহলে

বেশ কয়েকটি রোগ হতে পারে। তার মধ্যে ডাউন সিন্ড্রোম, পাটাউ সিন্ড্রোম, এডওয়ার্ডস সিনড্রোম, ট্রাইসোমি, মনোসোমি ইত্যাদি।[১৭] এগুলো সবই ভয়াবহ জেনেটিক.রোগ। সুতরাং, এসব অসুস্থ স্পিশিস 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট'-এর নীতি অনুযায়ী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রজাতি আর সামনে আগাবে না। সুতরাং, আমরা এবং বর্তমানে উপস্থিত বানর জাতীয় প্রাণীগুলো একই পূর্বপুরুষ থেকে আগত - এই চিন্তা মাথা থেকে আউট করে ফেলো।"[১৮]

আরো কিছুক্ষণ নীরবতার পর ফাতিমা বললো, "এখন আমি মলিকুলার বায়োলজি থেকে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের পক্ষে কিছু প্রমাণ দিই?"

"না থাক! আর শুনতে ইচ্ছা করছে না।" এই বলে আদনান অনেকক্ষণ ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে থাকলো। তারপরে শেষ অস্ত্র ছাড়লো। বললো, "আচ্ছা, তাহলে তুমি কি আমাকে এমন কিছু পিয়ার রিভিউড জার্নালের আর্টিকেল দেখাতে পারবে, যেখানে ডারউইনিজমকে রিফিউট করেছে এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে সাপোর্ট করেছে?"

ফাতিমা বললো, "আদনান, এটা কিন্তু লজিক্যাল ফ্যালাসি। আমি তোমাকে যেখান থেকেই তথ্য দেইনা কেনো, আমার দেওয়া তথ্যগুলো যদি সঠিক হয়, তাহলেই তোমার মেনে নেওয়া উচিত। পারলে তুমি আমার দেওয়া তথ্যগুলোর বিপরীতে তথ্য নিয়ে এসো। কিন্তু সেটা না করে তুমি জার্নালের রেফারেন্স কেনো চাও?"

আদনান বললো, "আমি ওগুলো কিছু বুঝতে চাচ্ছিনা। তুমি আমাকে জার্নালের আর্টিকেল দাও!"

ফাতিমা বললো, "আলোচনায় না পেরে উঠলে এটাই তো তোমাদের শেষ অস্ত্র! ঠিকাছে, তাহলে কাল তোমাকে জার্নালের আর্টিকেল প্রিন্ট করে এনে দিবো, ইনশা-আল্লাহ।[১৯] এখন বলো তো, আমার এত বকবকানির পরও কি তোমার মনে হয় না যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীজগৎসহ মানুষের উৎপত্তির পিছনে একজন বুদ্ধিমান সত্ত্বার হাত রয়েছে? যেকোনো বিবেকবান মানুষই সেটা স্বীকার করবে। তাই আমরাও সেই সত্ত্বাকে বিশ্বাস করি। এবং, তাঁকে 'আল্লাহ' নামে ডাকি। যিনি এই বিশ্বজগতের অধিপতি। সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। কোনো কিছুই নিজে

নিজে হয় না তাঁর হুকুম ছাড়া। তিনি এক। তিনি অমুখাপেক্ষী। কাউকে জন্ম দেননি বা কারো থেকে জন্ম নেননি। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"

এতটুকু বলে ফাতিমা থেমে গেলো। তখন আদনান বললো, "এটা সূরা এখলাস না?"

ফাতিমা বললো, "বাহ! ভালোই জানো দেখছি। এখলাস না, সূরা ইখলাস। তাহলে আদনান, তুমি কি আজ থেকে এই এলোমেলোভাবে নিজে নিজে হয়ে যাওয়া রূপকথাতে আর বিশ্বাস করো? নাকি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনে বিশ্বাস করো?"

"এখনই না। জার্নালের রিসার্চ পেপারগুলো দাও। তারপর ভেবে দেখবো। এবং আমি আরো অনেক কিছুই জানি। তাই আমার আরো অনেক প্রশ্ন আছে। পরে তোমার সাথে আলোচনা করবো। এখন ঘুমাই। সকালে অফিস আছে।" এই বলে আদনান শুয়ে পড়লো।

পাশের মসজিদগুলো থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে আসছিলো। প্রতিদিন কতবার মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকা হয়! কিন্তু কতজনের সৌভাগ্য হয় নিজের রবের ডাকে সাড়া দেবার?

[বিঃদ্রঃ বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এরকম ঘটনা অবাস্তব নয়। কিন্তু ইসলামিক শরী'য়াহ অনুযায়ী একজনের কুফরি প্রকাশ পাওয়ার পরে তার সাথে সংসার করা জায়িয নয়। এগুলো প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিছক কিছু গল্প। আদর্শিকভাবে কিছু এখান থেকে গ্রহণ না করার অনুরোধ করা হলো। আমাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু যেন শুধু গল্পের প্রধান তথ্যগুলো নিয়েই থাকে।

বিজ্ঞান এবং বিবর্তন সম্পর্কে যাদের ধারণা কম, তাদের এই গল্পের অনেক কিছুই বোধগম্য না-ও হতে পারে। কারণ, এ ব্যাপারে পড়াশোনা না থাকলে অনেক টার্ম বোধগম্য হবে না। লেখাটিতে বিবর্তন সংক্রান্ত কিছু শব্দ ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে এসমস্ত শব্দকে বাংলায় অনুবাদ করলে মূলভাব হারিয়ে যায়। তারপরেও ধীরেসুস্থে পড়লে ইনশা-আল্লাহ কিছুটা হলেও বুঝতে সহজ হবে। এমন অনেক সাইন্টিফিক আর্টিকেল রয়েছে, যেগুলো বিবর্তনকে সাপোর্ট করে। তারা বস্তুবাদে ডুবে থাকার কারণে বস্তুপ্রেম থকে বেরিয়ে

আসতে পারে না। যেভাবেই হোক, সৃষ্টির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তারা দাঁড় করাবেই। এজন্যই বিজ্ঞানের বিভিন্ন নতুন শাখা তৈরি হবার সাথে সাথে যখন বিবর্তন প্রশ্নের মুখে পড়ে, তখনই তারা বারবার নতুন নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। ম্যাক্রো ইভোলিউশানের কোনো এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স নেই। এবং কেউ কোনোদিন এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি। সুতরাং, আমরা একে ফ্যাক্ট বলতে পারছি না। সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলারই কাছে। লেখাটিতে যা কিছু সঠিক, তার সবটুকুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুল, তার সবটুকুই আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

- [১] https://lamarcksevolution.com/evolution-an-introduction/
- [২] https://www.darwins-theory-of-evolution.com/
- [২.১] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2286568/
- [৩]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022283604007624
- *Probability's Nature and Nature's Probability: A Call to Scientific Integrity;* By Dr Donald E. Johnson
- [৪]https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/29/07/2013/pcsk-9cholesterol-drug.aspx
- [৫] *Davidson's principles and Practice Of Medicine*: 22nd edition: page: 1032
- [৬] https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_disorder
- [৭] *Probability's Nature and Nature's Probability: A Call to Scientific Integrity*, By Dr Donald E. Johnson; page: 54
- [৮] *উল্টো নির্ণয়*, মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর; অধ্যায়: নানান রূপের ইভোলিউশান; পৃষ্ঠা: ৪৬-৫২
- [৯] *Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design* By Stephen C Mayer; Page: 16,121(EPUB Version)
- [১০] *Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design* By Stephen C Mayer; Page: 21 (EPUB Version)
- [১১]https://www.genome.gov/-2005/15515096release-new-genome-comparison-finds-chimps-humans-very-similar-at-dna-level/
- [১২]https://www.getscience.com/content/how-genetically-related-are-we-bananas

- [১৩] *Robin's and Cortan Pathologic Basis of Disease* by Kumar, Abbas, Aster; South Asian Edition; Volume: 01; page: 01
- [১৪] *Robin's and Cortan Pathologic Basis of Disease* by Kumar, Abbas, Aster; South Asian Edition; Volume: 01: page: 02
- [১৫].https://www.researchgate.net/publication/271528587_Alleged_Human Chromosome 2 Fusion Site Encodes an Active DNA Binding Domain_Inside a Complex and Highly Expressed Gene-Negating Fusion
- [১৬] https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_(biology)
- [১৭] Langman's medical embryology By T.W. Sladder(9th Edition); Chapter: 02; Page: 11-21
- [১৮] জেনেটিক্সের আদ্যোপান্তটুকু সত্যকথন ব্লগের শামসুল আরেফিন ভাইয়ের লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা
- [১৯] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 3246854/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21243963
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15321723
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103513000791
- http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0002246
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571064506000224
- http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.genet.36.040202.092802?journalCode=genet &
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 2217542/

কুরআন কি পুরুষের বীর্যের উৎপত্তির ব্যাপারে ভুল তথ্য দেয়?

আদনানের মা বাসার বারান্দায় পাখি পালে। পাখিগুলোর মধ্যে লাভ বার্ডগুলোই দেখতে সবচেয়ে সুন্দর লাগে। এছাড়া ঘুঘুও দেখতে সুন্দর। পাখিগুলোর কাজকর্ম দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়! এইটুকু পাখি, তার কত ঢং! লাভ বার্ডের দুটি মজার বৈশিষ্ট্য আছে। পাখিগুলোর পাড়া ডিমগুলো দেখার জন্য একটি ডিমে হাত দিলেই মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে। ওই পাখি ডিমগুলোর উপরে আর বসবেই না। সব ফেলে দেবে। মানুষেরও এত রাগ নেই মনে হয়। আবার তাদের বাচ্চাগুলো এতই ছোট হয় যে, নিজে উঠতেই পারে না। খাওয়া তো দূরের কথা! তাহলে উপায় কী? একমাত্র উপায় হলো, তার বাবা মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম। পাখিটির মা বাচ্চাটিকে চিৎ করে শুইয়ে দুই হাত পা চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে বাচ্চার মুখ খুলে ধরে। ঠিক তখনই বাচ্চার বাবা খাবার এনে বাচ্চাটির মুখে ঢুকিয়ে দেয়। ব্যাপারটি দেখতে খুব সুন্দর লাগে। ফাতিমার মন খারাপ হলে বারান্দায় বসে পাখিগুলোর কাজকর্ম দেখে আর হাসতে থাকে। এতে তার মনের অবস্থা কিছুটা হলেও ভালো হয়।

রাতে ফাতিমা বারান্দায় একা একা বসে পাখিদের খেলা দেখছিলো। আদনানের ব্যাপারে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ফাতিমা! এই অবস্থায় আদনানের সাথে থাকা ঠিক হবে কি না? সমাজ তো কিছু জানে না। কিন্তু ইসলাম কী বলে? এখন কি আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত? কিন্তু তার বাবা-মা কি এতে রাজি হবে?

রাজ্যের চিন্তা মাথায় নিয়ে পাখিগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফাতিমা। এ সময় আদনান এসে পিছন থেকে ডাক দিলো, "ফাতিমা, কী ভাবছো?"

- "না, তেমন কিছু না!"

- "বাড়ির জন্য মন খারাপ? বাড়ি গেলে যেতে পারো। আমি দিয়ে আসবো।"

- "না, ঠিক আছে। সমস্যা নেই। আমার ইচ্ছা হলে আমি তোমাকে বলবো।"

- "ওকে।"

ধপাস করে একটি শব্দ হলো ওই পাশের রুম থেকে। আদনান জিজ্ঞাসা করলো, "কী হলো?"

- "তেমন কিছু না। বাতাসে দরজা ধাক্কা খেয়েছে। মনে হয় বৃষ্টি হবে।"

- "ওহ! মা-কে বলো তো একটু খিচুড়ি রান্না করতে। সাথে গরুর মাংস।"

- "মা আগে থেকেই তোমার জন্য খিচুরি রান্না শুরু করেছে। একটু পরেই রান্না হয়ে যাবে ইন-শা-আল্লাহ।" বলে ফাতিমা উঠে চলে গেলো।

পাশের বাড়ির টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। আদনান দিগন্তে তাকিয়ে শৈশবে পাড়ি জমালো। "মানুষগুলো কেমন যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে। শহরে বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করেছে। তাই টিনের চালে সুমধুর বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাওয়া এখন ডুমুরের ফুল। এখন এসব ছোটবেলার সোনালী অতীত!" - জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখছিলো, আর এসব ভাবছিলো আদনান।

বৃষ্টির সময়ে দু'য়া কবুল হয়, এই আশায় ফাতিমা সালাতে দাঁড়ালো। সালাত শেষে দুই হাত তুলে চোখের পানি ফেলে লম্বা দু'য়া করলো ফাতিমা। দু'য়া শেষ হতে না হতেই ডাইনিং রুম থেকে আদনানের মা ডাক দিয়ে বললো, "আদনান, খেতে আয়, বাবা।"

- "হ্যাঁ, আসছি মা।" বলে জানালার পাশ থেকে নিজের রুমে গিয়ে একটি অ্যান্টাসিড নিয়ে ড্রয়িং রুমে যেতে লাগলো আদনান।

ঘরের কোণায় ফাতিমাকে জায়নামাযে বসা দেখে বললো, "হয়েছে! নামায পরে পড়ো। এখন খেতে চলো। মা ডাকছে।"

ফাতিমা দ্রুত জায়নামাজ গুছিয়ে ড্রয়িং রুমে এসে পড়লো। আদনানের বাড়িতে সবাই একসাথেই খায়। টেবিলে সবাই নিজ নিজ চেয়ারে বসে পড়লো। কেউ কাউকে খাবার তুলে দেয় না। যার যেটা পছন্দ, সে সেটা নিয়ে নেয়। বৃষ্টির রাতে খিচুড়ির সাথে গরুর মাংসের কম্বিনেশানটা অস্থির লাগে আদনানের। নিজ থেকে নিয়েই মন ভরে খেলো। তারপরে মায়ের রান্নার হাতের এক ভূয়সী প্রশংসা করে নিজের রুমে চলে এলো। কিছুক্ষণ পর ফাতিমাও সবকিছু গুছিয়ে রেখে রুমে এসে পড়লো। রুমে এসে ফাতিমা দেখলো, আদনান ল্যাপটপ নিয়ে বসেছে। ফাতিমা খাটের অন্যপাশে একটি অর্থসহ কুরআন নিয়ে পড়তে থাকলো। কেউ পাশাপাশি বসে একজনের দিকে বারবার তাকালে সেটা বোঝা যায়। ফাতিমাও লক্ষ করলো, আদনান বারবার তার দিকে তাকাচ্ছে। তখন ফাতিমা আদনানের দিকে তাকিয়ে বললো, "কিছু বলবে?"

- "হ্যাঁ। আচ্ছা, তুমি কি কোরানের সব তথ্য সঠিক মনে কর?" প্রশ্ন করলো আদনান।

- "মনে করার কী আছে? কুরআনের সকল তথ্যই সঠিক।"

আদনান চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "তর্ক হয়ে যাক তাহলে?"

ফাতিমা বললো, "তর্ক করতে চাই না। তর্ক করাই হয় জয়ী হবার জন্য। এখানে সত্যকে মেনে নেবার ইচ্ছা সবার থাকে না। তুমি চাইলে আলোচনা করতে পারো।"

- "ওই সেটাই। আলোচনাই হোক।"

- "কী বিষয়ে?"

- "তোমার হাতে যেই কোরান আছে, এটা থেকে তুমি ৮৬ নম্বর সূরার ৫ নং আয়াত থেকে একটু পড়ো তো।"

ফাতিমা আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করে পড়া শুরু করলো, "মানুষ কি

দেখে না তাকে কোন জিনিস দিয়ে বানানো হয়েছে? তাকে তৈরি করা হয়েছে এক ফোঁটা সবেগে স্খলিত পানি দিয়ে, যেটি নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝখান থেকে। এভাবে যাকে তিনি বের করে এনেছেন, তাকে তিনি পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম।"

ফাতিমাকে থামিয়ে আদনান বললো, "হা হা হা। হয়েছে বাপু। আর পড়া লাগবে না। ফাতিমা দেখো, কোরানে বলা হয়েছে পুরুষের বীর্য নাকি মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের হাড় থেকে তৈরি হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে বীর্য পুরুষের টেস্টিস বা অণ্ডকোষ থেকে তৈরি হয়।"

এই বলে আদনান বৈজ্ঞানিক প্রমাণসহ ল্যাপটপে ওপেন করা একটি আর্টিকেল পড়ার জন্য ল্যাপটপটি ফাতিমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "বিশ্বাস না হলে এই নাও, প্রমাণ দেখো। কত হাস্যকর। হা হা হা। তোমরা তো প্রায়ই কোরান'কে বিজ্ঞানময় বলো! এই তোমাদের বিজ্ঞানের নমুনা। এতেই প্রমাণ হয় যে, মোহাম্মদ একজন মিথ্যা নবী। কারণ সে জানতোই না যে, বীর্য কোথায় তৈরি হয়। আর কোরান আল্লার লেখাও নয়। যদি হতো, তাহলে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সে জানতো বীর্য কোথায় তৈরি হয়।"

ফাতিমা ব্যাঙ্গ করে বললো, "আপনার ভাষণ শেষ হয়েছে? অনেক তো বললেন! এবার আমি কিছু বলি?"

আদনান বললো, "হ্যাঁ, শেষ হয়েছে। কেন? তুমি আবার ডিফেন্স দিবে নাকি? অবশ্য দিতেই পারো। তোমরা তো প্রায়ই বলো, 'বিজ্ঞান তো ভুলও হতে পারে। হয়তো এখনো সঠিকভাবে আবিষ্কার হয়নি।' হা হা হা। জেনে রেখো, এটা কিন্তু একদম চোখে দেখে প্রমাণিত। তুমি চাইলে আমি ভিজুয়াল প্রমাণ এবং প্র্যাক্টিক্যাল প্রমাণ দেখাতে পারি। আমি তোমাদের বর্তমান অনেক স্কলারের ব্যাখ্যা শুনেছি। কিন্তু কারো ব্যাখ্যাই আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। কেউ বলে মায়ের গর্ভে থাকাকালে টেস্টিস মেরুদণ্ড আর পাঁজরের মাঝে থাকে। আবার কেউ বলে মেরুদন্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝ স্থান থেকে টেস্টিসে ব্লাড সাপ্লাই আসে। এগুলো সবই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো। এই আয়াতে কোথাও টেস্টিস কোথায় থাকে বা কোন স্থান থেকে ব্লাড সাপ্লাই পায়, সেটা বলা নেই। এখানে স্পষ্ট বলা আছে বীর্যের কথা। বললে এগুলো বাদে বলো।"

ফাতিমা বললো, “হ্যাঁ! ডিফেন্স তো দিতেই হবে। কারণ তোমার এই অনধিকার চর্চা দেখে আর কিছু না বলে থাকতে পারছি না!”

আদনান বললো, “কী বলবে, বলো দেখি। অপবিজ্ঞান শুনি তোমার মুখে। হা হা।”

ফাতিমা বললো, “তুমি এখানে অনেকগুলো ক্লেইম করেছো। প্রত্যেকটার উত্তর আলাদাভাবে দিতে হবে। মনোযোগ দিয়ে শুনবে, হ্যাঁ?”

আদনান বললো, “কোথায়? আমি তো প্রমাণ ছাড়া কিছু বলিনি! সব প্রমাণ তো তোমার হাতেই দিয়েছি। দেখো, সেগুলো দেখো।”

ফাতিমা বললো, “দেখার দরকার নেই। আমি এগুলো জানি। বলছি কেন তোমার কথাগুলো প্রমাণ ছাড়া? একটু ওয়েট করো।” বলে ফাতিমা হাতের ল্যাপটপটি পাশে রেখে আদনানের দিকে ঘুরে বসলো।

তারপরে একটু গলা ঝেড়ে আবার বলা শুরু করলো, “প্রথমেই তুমি বলেছো যে, কুরআন নাকি বলেছে ‘পুরুষদের বীর্য তৈরি হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজর থেকে।’ কিন্তু কুরআন কখনোই এই কথা বলেনি যে বীর্য তৈরি হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্যে থেকে। এখানে তোমার ট্রান্সলেশান বুঝতে ভুল হয়েছে। আমার হাতের কুরআনের দিকে খেয়াল করো। ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে ‘যেটি নির্গত হয়’। এখানে ‘যা তৈরি হয়’ তো বলা হয়নি। এই আয়াতে ‘যেটি নির্গত হয়’ শব্দগুলো যেই শব্দের অনুবাদ সেটি হলো. ‘ইয়াখরুজু (يَخْرُجُ)’; যেটি এসেছে ফি’ল বা ক্রিয়া ‘খারাজা (خرج)’ থেকে। এটির অর্থ ‘বের হয়ে যাওয়া’।[১] এই শব্দের অর্থ কখনোই ‘সৃষ্টি বা তৈরি হওয়া’ নয়। তারপরে তুমি ৬ নং আয়াতে, ‘আল-মায়ু (اَلمَاء)’ এর বাংলা শুধু ‘পুরুষদের বীর্য’ ভেবেছো। কিন্তু ‘আল-মায়ু (اَلمَاء)’ এর বাংলা অর্থ শুধু পুরুষদের বীর্য নয়। এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যেকোনো ‘পানি জাতীয় জিনিস বা পানি’।[২] এই ‘আল-মায়ু (اَلمَاء)’-এর পরে যখন ‘দাফিক্ব’ (دَافِق) শব্দটি এসেছে, তখন ৬ নং আয়াতের ‘মায়ুন দাফিকুন’-এর বাংলা অর্থ হয় ‘সবেগে স্খলিত পানি বা প্রবাহিত পানি’। আর এই সবেগে স্খলিত পানি শুধু পুরুষের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়, এটা মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[৩] কারণ মেয়েদের ডিম্বাণু যখন ডিম্বাশয় থেকে বের হয়, তখন কুমুলাস

কমপ্লেক্স ও পানিসহ সবেগেই বের হয়।[৪] আবার যেহেতু এখানে 'একটি পানি'র কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই পানিকে জাইগোটও বলা যেতে পারে। কারণ, জাইগোটও ফেলোপিয়ান টিউবের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে সামনে আগায়। তাহলে জাইগোট যেহেতু একটি পানি এবং এর 'দাফিক্ব' বা প্রবাহিত হবার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেহেতু ৬ নং আয়াতের 'মায়ুন দাফিকুন' বলতে 'জাইগোট' অর্থও যুক্তিযুক্ত। কেউ কেউ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে পুরুষের এবং নারীর পানির কথা বলা হয়েছে। আর একটি পানি বলার কারণ হলো, যেহেতু পানিদ্বয় একস্থানে একত্রিত হয়ে একাকার হয়ে যায়।[৫] তাহলে, এই আয়াতে 'মায়িন দাফিক্ব (مَّاءٍ دَافِقٍ)' বলতে পুরুষের বীর্য, নারীর ডিম্বাণুসহ পানি এবং জাইগোট এই তিনটি অর্থই নেওয়া যায়।[৬] এটুকু কি ক্লিয়ার হয়েছে?"

কথাগুলো শুনে আদনানের মুখের খুশি খুশি ভাব মুহূর্তেই চলে গেলো। পাশে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। ফাতিমা আদনানের উদাসীন অবস্থা দেখে বললো, "আদনান, কী ভাবছো? মনোযোগ দিয়ে শোনো।"

আদনান বললো, "ও হ্যাঁ, দুঃখিত। আচ্ছা সেটা নাহয় বুঝলাম। কিন্তু এর কোনোটাই তো মেরুদণ্ড বা বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে থেকে আসে না। এটাকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?"

ফাতিমা বললো-"হ্যাঁ, বলছি। এবার ৭ নং আয়াতের 'আস-সুল্ব' (الصلب) এবং 'আত-তারায়িব' (التَّرَائِبِ) শব্দ দুটির অর্থ এখানে কী হতে পারে, সেটি একটু বিশ্লেষণ করি। প্রথমেই এটা মাথায় রাখো যে, এই শব্দ দুটি পুরুষ কিংবা মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। এখন, প্রথম শব্দটা হলো, 'আস-সুল্ব' (الصلب)। এখানে, 'সুল্ব' ('صلب') শব্দের অর্থ মেরুদণ্ড। বিশেষ করে কোমরে যে মেরুদণ্ডের হাড় থাকে সেটুকু।[৭] তাফসির-বিদগণ 'সুল্ব' শব্দের অর্থ এই আয়াতে মেরুদণ্ড হিসেবেই নিয়েছেন। এবার ৭ নং আয়াতের ২য় শব্দটি হলো, আত-তারায়িব (التَّرَائِبِ)। এখন, 'তারায়িব' (تَرَائِبِ) শব্দটির প্রচুর অর্থ রয়েছে। আসলে একেক তাফসিরকারক 'তারায়িব' শব্দটির একেক অর্থ গ্রহণ করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন, কেউ বলেছেন বুকের পাঁজরের হাড় বা দুই কাঁধ এবং বুকের মধ্যবর্তী স্থান। আবার কেউ বলেছেন, দুই চোখ বা দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান।[৮] এই শব্দের অর্থে কেউ একমত হতে পারেনি। তাই এখানে

অর্থের ব্যাপকতা আছে। আমরা সামঞ্জস্যপুর্ন দুটি অর্থ নিয়েই আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ। এখন বলো, অর্থগুলো কি তোমার মাথায় ঢুকেছে।"

আদনান উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, ঢুকেছে। তাহলে এই আয়াতের অর্থ তুমি কীভাবে করতে চাচ্ছো?"

ফাতিমা বললো, "আয়াতের অর্থ করার আগে কুরআনের একটি বিশেষ দিক তোমাকে বলি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যতবার লজ্জাস্থান হেফাজতের কথা বলেছেন, ততবারই কিন্তু সরাসরি অঙ্গটির নাম উল্লেখ করেননি। বলেছেন, দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের হেফাজত করতে।[৯] এই আয়াতেও দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান বুঝাতে সরাসরি শব্দটি না ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছেন বলেই আমার মনে হয়।"

আদনান বিরক্তির সুরে বললো, "আচ্ছা, ঠিকাছে। তুমি আগে আয়াতের অর্থ বলো তো! এতকিছু জেনে কী হবে?"

ফাতিমা বললো, "এতকিছু জানো না বলেই তো আয়াতের অর্থ বুঝতে পারো না। তো যেটা বলছিলাম-সুল্‌বের অর্থ 'মেরুদণ্ড' এবং তারায়িবের অর্থ 'দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান' ধরে অনুবাদ করলে, সূরা তারিকের ৭ নং আয়াতের অর্থ হয়, 'এটি বের হয়ে আসে কোমরের মেরুদণ্ডের হাড় এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের মাঝখান থেকে।' অর্থাৎ, কোমরের হাড় তো দেহের পিছনে। আর দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান বা লজ্জাস্থান হলো সামনে। সুতরাং, এই দুইটা স্থানকে যদি তুমি ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ধরো, তাহলে অর্থ দাঁড়ায়-'ছেলেদের বীর্য বা মেয়েদের ডিম্বাণুসহ পানি এই দুই স্থানের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে যে ফাঁকা জায়গা আছে, সেই জায়গায় অবস্থিত বিভিন্ন অঙ্গগুলো থেকে বের হয়ে আসে।' বিজ্ঞানও বলে, ছেলেদের টেস্টিসের শুক্রাণু, সেমিনার ভেসিকলের তরল, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের তরল ইত্যাদি সকল কিছু মিলেই বীর্য তৈরি হয়। যদি শুধু টেস্টিসের কথা বলা হতো, তাহলে তো কুরআন ভুল হয়ে যেত। কিন্তু সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেটা ছেলেদের 'বীর্য' কিংবা মেয়েদের 'ডিম্বাণুসহ পানি' যেসকল স্থান থেকে তৈরি এবং বের হয়, সব অঙ্গাণুকেই কভার করেছে। এটা কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা অল্প শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু এতেই খুব অর্থবোধক একটি বাক্য তৈরি হয়।"

"আর যদি 'তারায়িব' শব্দের অর্থ আমি বুকের হাড় নেই, তখন কী হবে?" প্রশ্ন করলো আদনান।

ফাতিমা বললো, "তখনও কুরআনের আয়াত সঠিক থাকে। সেক্ষেত্রে শুধু স্থানটিকে লম্বভাবে ধরতে হবে। তাহলে সুল্বের অর্থ 'মেরুদণ্ড' এবং তারায়িবের অর্থ 'বুকের হাড়' ধরে অনুবাদ করলে সূরা তারিকের ৭ নং আয়াতের অর্থ হয়, 'এটি বের হয়ে আসে, কোমরের মেরুদণ্ডের হাড় এবং বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত স্থান থেকে।' অর্থাৎ, কোমরের হাড় তো দেহের পিছনে এবং বক্ষপিঞ্জর থাকে সামনে। সুতরাং, এই দুইটা স্থানকে যদি তুমি ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ধরো, তাহলে অর্থ দাঁড়ায়-'ছেলেদের বীর্য বা মেয়েদের ডিম্বাণুসহ পানি এই দুই স্থানের মাঝখানে লম্বভাবে যে ফাঁকা জায়গা আছে, সেই জায়গায় অবস্থিত বিভিন্ন অঙ্গগুলো থেকে বের হয়ে আসে। তোমাকে এখন একটি ছবি দেখাই। তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে।'

ফাতিমা বিছানা থেকে উঠে টেবিলে চার্জে রাখা মোবাইলটি নিয়ে আবার বিছানায় এসে বসলো। মোবাইল থেকে পূর্বের তৈরি একটি ছবি ওপেন করে আদনানের সামনে ধরে বললো, "এই দেখো। এখানে 'সুল্ব' এবং 'তারায়িব'-এর মাঝের স্থান দেখানো হয়েছে।"
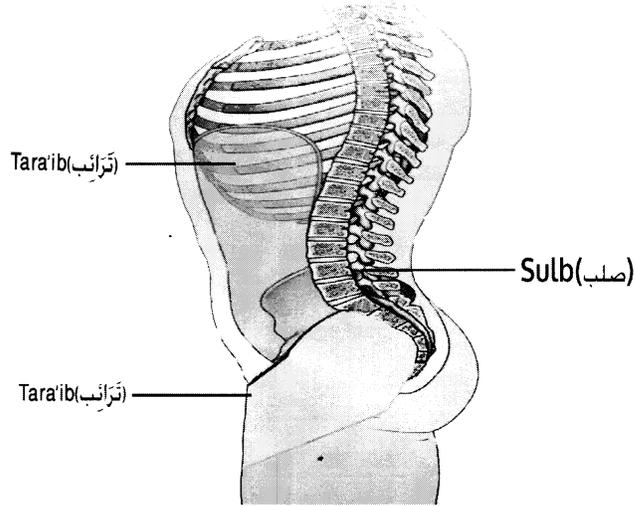
রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের ২১২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

আদনান ছবিটির দিকে তাকালে ফাতিমা বললো, "এখানে যখন তুমি 'তারায়িব' শব্দের অর্থ 'দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল' ধরবে, তখন আয়াতের মূলভাব আসে, বীর্য এবং ডিম্বাণুসহ পানি এই জলপাই রঙয়ের অংশ থেকে আসে। আমি এই অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দেই। আবার যখন তুমি 'তারায়িব' শব্দের অর্থ 'সামনের পর্শুকা' ধরবে, তখন আয়াতের মূলভাব আসে, বীর্য এবং ডিম্বাণুসহ পানি লম্বভাবে লালসহ জলপাই রঙ যে স্থান জুড়ে আছে, সেই স্থান থেকে। সুতরাং, কুরআনের বর্ণনা শতভাগ সত্য। এবং এটি মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এক মহা গ্রন্থ। আশাকরি সম্পূর্ণরূপে তোমাকে বোঝাতে পেরেছি।"

আদনান প্রশ্ন করলো, "আর যদি ৬ নং আয়াতের 'মায়িন দাফিক'-এর অর্থ তোমার কথামতো 'নারী পুরুষের মিশ্রিত পানি বা জাইগোট' হয়, তাহলে অর্থ কেমন হবে? তখন তো আর জাইগোট বের হয়ে আসার কিছু নেই। এ ব্যাপারে তো কিছু বললে না।"

ফাতিমা বললো, "তাই তো! এটা তো বলিনি। শোনো, ৬ নং আয়াতের 'মায়িন দাফিক্ব'-এর অর্থ 'নারী পুরুষের মিশ্রিত পানি বা জাইগোট' হয়, যেমনটি *তাফসীরে বাহরুল মুহিত*-এ বলা হয়েছে; তাহলে এই আয়াতগুলোর অর্থে একটু পরিবর্তন আসবে। আরবি ভাষায় ক্রিয়ার মাধ্যমেই সর্বনাম প্রকাশ পায়। যেমন ধরো, আমি বললাম 'যাহাবা'। 'যাহাবা' একটি আরবি ক্রিয়াবাচক শব্দ। এর অর্থ 'সে গেলো'। দেখো, আরবিতে 'সে' বুঝাতে 'হুয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়। সেই অনুযায়ী 'সে গেলো' এই বাক্যের আরবি হওয়া উচিত ছিলো, 'হুয়া যাহাবা'। কিন্তু সেটা না হয়ে শুধু 'যাহাবা' দিয়েই অর্থ প্রকাশ পেয়ে যায়। তুমি যদি 'যাহাবা' না বলে 'যাহাবূ' বলতে, তাহলে অর্থ হতো 'তারা গেলো'। দেখেছো, কী সুন্দরভাবে ক্রিয়ার মাধ্যমেই সর্বনামের প্রকাশ পায়! ব্যাপারটি কি তুমি বুঝেছো?"

"হুম।" বলে মাথা নাড়লো আদনান।

তারপর ফাতিমা বললো, "এবার ৫ নং আয়াত খেয়াল করো। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'অতএব, মানুষের ভেবে দেখা উচিত, কী বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' এখানে 'মানুষ' হলো বিশেষ্য। এবং 'সৃষ্টি করা হয়েছে' এটুকু ক্রিয়া।

বারবার বিশেষ্য ব্যবহার না করার জন্য ব্যবহার করা হয় সর্বনাম। এখানে 'সৃষ্টি করা হয়েছে' শব্দগুলোর আগে 'তাকে' শব্দটি একটি সর্বনাম। যেটি এই লাইনে বিশেষ্য 'মানুষ'-কে নির্দেশ করে। এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবাহিত পানি থেকে। অর্থাৎ, জাইগোট থেকে।' এই আয়াতে 'তাকে' বিশেষ্য দিয়ে আগের আয়াতের বিশেষ্য 'মানুষ'কে বোঝানো হয়েছে। এবং 'তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে' এত কিছু বুঝাতে আরবিতে মাত্র একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেটি হলো 'খুলিকা'। 'খুলিকা' একটি ক্রিয়া। ঐ যে একটু আগে বললাম যে, আরবি ভাষায় ক্রিয়ার মধ্যেই সর্বনাম প্রকাশ পায়। এখানেও তা-ই হয়েছে। এই 'খুলিকা' শব্দের মধ্যেই মানুষকে নির্দেশ করার সর্বনাম আছে। এবার পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এটি বের হয়ে আসে মেরুদণ্ড ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান বা পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে।' এই আয়াতে 'এটি' শব্দটি একটি সর্বনাম। এই 'এটি' সর্বনামটি আগের আয়াতের দুইটি বিশেষ্যকে নির্দেশ করতে পারে। একটি হলো 'ইনসান বা মানুষ' এবং অপরটি হলো, 'সবেগে স্খলিত বা প্রবাহিত পানি'। এখানে 'এটি' সর্বনামটি দিয়ে যদি 'সবেগে স্খলিত বা প্রবাহিত পানি' বুঝায়, তাহলে এই আয়াতের অর্থ কী হবে - সেটা আগেই বলেছি। আর যদি 'এটি' সর্বনামটি দিয়ে 'ইনসান বা মানুষ'-কে বুঝায় তাহলে এই আয়াতের অর্থ হবে, 'যেটি বা মানুষটি বের হয়ে আসে এমন একটি স্থান থেকে, যেটি মেরুদণ্ড এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের মাঝখানে অবস্থিত।' সুবহানাল্লাহ। এবার বলো কোনো ভুল আছে কি না।"

"আমি তো তেমন আরবি গ্রামার বুঝি না। আমার এই দুর্বলতার সঠিক ব্যবহার করলে না তো?" প্রশ্ন করলো আদনান।

ফাতিমা বললো, "কেন? কী সুযোগ নিলাম?"

আদনান বললো, "শেষে তুমি যে অর্থ বললে, আমার মনে হয় এটা তুমি নিজে থেকেই বানালে। এরকম অনুবাদ আমি আগে কাউকে করতে শুনিনি। তুমি কি তোমার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে একটি অনুবাদও দেখাতে পারবে?"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "হ্যাঁ, পারবো। তুমি চাইলে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত এম.এ.এস আব্দুল হালিমের কুরআনের ট্রান্সলেশন দেখতে পারো। সেখানে এভাবেই অনুবাদ করা হয়েছে।[৯.১] এবং আমার জানামতে এটাই

কুরআনের সবথেকে ভালো ইংরেজি অনুবাদ।"

আদনান খুব বিব্রত বোধ করলো। নিজের প্রশ্নের উত্তর ফাতিমা এভাবে হুট করে দিয়ে দেবে, এটা সে চিন্তাই করেনি। চুপ করে নিচে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগলো আদনান। আদনানের নীরবতা দেখে ফাতিমা বললো, "দেখেছো, কুরআনের ভাষা কত প্রাঞ্জল! আল্লাহ তা'আলা মাত্র দুটি শব্দ 'মায়ুন দাফিকুন' বা 'সবেগে স্খলিত বা প্রবাহিত পানি'- ব্যবহার করে সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পানিকে এই আয়াতের আওতায় নিয়ে এসেছেন। এরপরেও কি এই প্রজ্ঞাময় কিতাবের উপর বিশ্বাস করবে না?"

আদনান কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর প্রশ্ন করলো, "তাহলে মুসলিমরা যে এই আয়াত থেকে বৈজ্ঞানিক নিদর্শন বের করে প্রচার করে! তারা বলে বীর্য নাকি মেরুদণ্ড আর বুকের পাঁজর থেকে তৈরি হয়! এটা কেন?"

ফাতিমা উত্তরে বললো, "যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বায়োলজির নয় এবং আরবি ভাষার উপর জ্ঞান নেই, তারা এগুলো বলতেই পারে। তারা অবুঝ। এটা তাদের ভুল। মনে রাখবে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কথা। আর অনুবাদ হলো, মানুষের মস্তিষ্কনিঃসৃত চিন্তার ফল। অনুবাদে ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কথায় কোনো ত্রুটি নেই। এই আয়াতটি বুঝতে গেলে একসাথে মেডিকেলবিদ্যা এবং আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। এর যেকোনো একটি না থাকলে ভুল অনুবাদ করার সম্ভাবনাই প্রবল। কুরআনের শুধু অনুবাদ পড়েই ইসলামবিদ্বেষীরা অপপ্রচার চালায়। থার্ড ক্লাস চিন্তা ভাবনা আরকি! আর তুমিও সেই অপপ্রচারের শিকার।"

এতটুকু বলে ফাতিমা হাঁফ ছাড়লো। এতক্ষণে আদনানের মুখ কালো হয়ে প্যাঁচার মতো হয়ে গিয়েছে। বলার মতো কিছু তো আর নেই। চুপ করে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে আদনান। আজ খুব আশা নিয়ে তর্ক শুরু করেছিলো যে, ফাতিমাকে কুরআনের ভুল দেখিয়ে তার বিশ্বাস ভেঙে দিয়ে আগের দিনের প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু বাড়া ভাতে ছাই! শেষমেশ কিছুই হলো না।

"আদনান এই বিষয়ে তোমার আর কোনো প্রশ্ন আছে?" ফাতিমা জিজ্ঞাসা করলো।

আদনান এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে বললো, "না!"

ফাতিমা বললো, "না, তোমার আরেকটি ক্লেইম ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বীর্যের উৎপত্তিস্থল জানতেন না। তাই না?"

আদনান কোনো কথা বললো না। আদনানের নীরবতা দেখে ফাতিমা নিজ থেকেই বললো, "তোমার এই ক্লেইমটিও ভুল। কারণ, কিছু লোক নিজেদেরকে নারীসহচর্য থেকে দূরে রাখার জন্য নিজেদের অণ্ডকোষ বা টেস্টিস কেটে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ'র ﷺ নিকট অনুমতি চাইলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অনুমতি দেননি।[১০] কারণ, এভাবে নিজেকে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাহীন করে ফেলা জায়িয নেই। সুতরাং, এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি রাসূলুল্লাহও ﷺ জানতেন যে, বীর্য কোথায় উৎপন্ন হয়।"

আদনানের মুখ দেখে মনে হলো, সে কিছু একটা বলবে। কিন্তু কিছু না বলেই আজ একাই মশারী টানিয়ে, লাইট বন্ধ করে খাটের এক কোনায় শুয়ে পড়লো। ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "তর্ক করাই হয় মানার ইচ্ছা না থাকলে। আলোচনা শুরুর আগে সেটাই বলেছিলাম। এই অভিজ্ঞতা আমার নতুন নয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সত্যকে মেনে নেবার তৌফিক দিক।"

এটুকু বলে ফাতিমা পায়ের কাছে থাকা কোলবালিশটি দু'জনের মধ্যে রেখে ইস্তিগফার করতে থাকলো ফাতিমা। কে জানে? হয়তো এটাই শেষ নিদ্রা!

[বিঃদ্রঃ বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এরকম ঘটনা অবাস্তব নয়। কিন্তু ইসলামিক শরী'য়াহ অনুযায়ী একজনের কুফরি প্রকাশ পাওয়ার পরে তার সাথে সংসার করা জায়িয নয়। এগুলো প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিছক কিছু গল্প। আদর্শিকভাবে কিছু এখান থেকে গ্রহণ না করার অনুরোধ করা হলো। আমাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু যেন শুধু গল্পের প্রধান তথ্যগুলো নিয়েই থাকে।

এখানে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো মদিনা ইউনিভার্সিটির একজন সম্মানিত শায়েখ আব্দুল্লাহ (ছদ্মনাম) হাফিযাহুল্লাহ এবং আবু সা'দ (ছদ্মনাম) ভাইয়ের সাথে আলোচনা করে ঐক্যমতে পৌছানোর পরে নেওয়া

সিদ্ধান্তের উপর লেখা হয়েছে। তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী এখানে তাঁদের মূল নাম প্রকাশ করা হলো না। এই লেখায় যা কিছু কল্যাণ সেটি শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যা কিছু ত্রুটি তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

- [১] *Al-Mawrid;* By Dr. Rohi Baalbaki: Dar As-Salam Publication: Page: 507
- [২] *Al-Mawrid;* By Dr. Rohi Baalbaki: Dar As-Salam Publication: Page: 933
- [৩] *Arabic-English lexicon* by Edward William Lane: Volume: 03: Page: 58-59
- [৪] *The Developing Human* by Dr. Keith L. Moore (10th edition): page: 22
- [৫] *তাফসীরে বাহারুল মুহিত;* খণ্ড: ১০; পৃষ্ঠা: ৪৪৮
- [৬] *Arabic-English lexicon* by Edward William Lane; Volume: 03; Page: 58-59
- [৭] *Arabic-English lexicon* by Edward William Lane; Volume: 04; Page: 435-437
- [৮] *Arabic-English lexicon* by Edward William Lane; Volume: 01; Page: 301
- *Tafsir Ibn Kathir*, Volume: 11; Page: 473-474 (Islamic Foundation BD)
- [৯] Surah Mumtahina (60); Verse: 12
- [৯.১] *The QUR'AN;* Translated by M.A.S Abdel Haleem; Oxford University Press; Chapter: 86, Verse: 5-8
- [১০] *সহিহ মুসলিম:* কিতাবুন নিকাহ; হাদিস নং ৩২৯৫, ৩২৯৬, ৩২৯৭

কুরআন কি মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ও ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়?

আদনানের বাসায় আজ পরিবারের প্রায় সবাই এসেছে। বাড়ি ভর্তি মেহমান। বাড়িতে চলছে সুস্বাদু সব খাবারের আয়োজন! পোলাও, গরু, মুরগি, খাসি, মাছসহ আরো রয়েছে বিভিন্ন রকমের খাবারের ব্যবস্থা। আদনান পরিবারের সবচেয়ে বড় ছেলে। ছোট ভাইবোন যারা এসেছে, তারা সবাই চিল্লাপাল্লা, খেলাধুলাতে মগ্ন। কিন্তু আদনানের সেগুলোতে কোনো আগ্রহ নেই। থাকবেই বা কী করে? কর্মজীবনে পদার্পণ করলে ওসবের প্রতি আর খেয়াল থাকে না। তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে পরিবারে খুবই সমাদৃত। আদনানের অভ্যাস আছে যে, মা যখন রান্না করে, রান্না শেষ হবার আগেই সে কড়াই থেকে মাংস উঠিয়ে খাওয়া শুরু করে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। ঠিকই রান্না শেষ হবার আগে বাটিতে করে মুরগির মাংস নিয়ে খেতে খেতে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখলো নাবিলা আর ফাতিমা বসে 'Inside The Living Body' শিরোনামে 'Discovery' চ্যানেলে একটি ডকুমেন্টারি দেখছে। আদনানও গিয়ে তাদের পাশের সোফাতে বসে টিভি দেখতে লাগলো।

নাবিলা আদনানের ছোট বোন। সে ইউনিভার্সিটিতে প্রাণিবিদ্যায় ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নরত। ফাতিমার প্রায় সমবয়সী হওয়ায় কয়েকদিনে ফাতিমার সাথে তার সম্পর্কও দুই বোনের মতো হয়ে গিয়েছে। তিনজন খুব মনোযোগ সহকারে অনুষ্ঠান দেখছে। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে দেখলো, একটি শুক্রাণু কয়েক লক্ষ

শুক্রাণুর সাথে প্রতিযোগিতা করে অবশেষে ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছিয়েছে। জীবন শুরুই হয়েছে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, এবং পরবর্তীতে যত দিন প্রাণ থাকবে, সংগ্রাম করেই মানুষের বেঁচে থাকতে হবে-এই ম্যাসেজটাই দিতে চাইলো বোধহয়। তারপরে দেখালো ভ্রূণ কীভাবে বৃদ্ধি পায়, তারপর কীভাবে বাচ্চা ও মায়ের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়, তারপরে কীভাবে সে ছোটবেলা অতিক্রম করে এক সময় বৃদ্ধ হয়ে মারা যায়।

এগুলো দেখতে দেখতে ফাতিমা নাবিলাকে বললো, "জানো নাবিলা, এই বিষয়গুলো আল্লাহ কত সুন্দরভাবে কুরআনে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, যাতে আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে তাঁর (ﷻ) নিদর্শনগুলো উপলব্ধি করি! আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা আবিষ্কারের পরে কুরআনের বর্ণনার সাথে মিলে যাওয়ায় তা কুরআনের একটি মিরাকেল হিসেবে দেখা হয়। আর ..."

ফাতিমাকে থামিয়ে দিয়ে আদনান বললো, "এখানে আমি তোমার সাথে একমত নই, ফাতিমা। তোমরা শুধু শুধু কিছু না জেনে কোরানকে বিজ্ঞানময় দাবী করো। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ এই কোরানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক কোনো থিওরি আবিষ্কার করেনি।"

ফাতিমা বললো, "আদনান, কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই না যে, এখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা থাকবে। তাই কুরআনকে বিজ্ঞানময় দাবি করার প্রশ্নই আসে না। যারা করে, ভুল করে। কুরআন মানবজাতিকে দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, এর দ্বারা মানুষ তার প্রকৃত স্রষ্টাকে চিনতে পারবে। যাতে মানুষ দুনিয়ায় তার প্রকৃত স্রষ্টার দেখানো পথে চলতে পারে এবং দুনিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও নৈতিক মূল্যবোধ বজায় থাকে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দিক থেকে কুরআন একটি স্বতন্ত্র কিতাব হিসেবেই খ্যাত। বিভিন্ন যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। আর এখন তো বিজ্ঞানের যুগ, এ যুগেও কুরআন অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলির মতো অবৈজ্ঞানিক না। বিজ্ঞানের কিছু জিনিস যা বিজ্ঞান কয়েক শতাব্দী আগে আবিষ্কার করেছে, সেগুলো কুরআন ১৪০০ বছর আগে আমাদের জানিয়েছে।"

আদনান বললো "তোমার কথা সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারলাম না। মুসলিমরা

অধিকাংশই কোরান নিয়ে গবেষণা করে না। তারা শুধু যা আছে, তাকেই সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু সেটা নিয়ে নিরপেক্ষ পড়াশোনা করে না। এটা তাদের দুর্বলতা। কিন্তু আমি কিছু কিছু জেনেছি। আমার মতে আল্লা বিজ্ঞান সংক্রান্ত নিদর্শন কোরানে বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। তিনি যা বলেছেন, তার অনেককিছুই বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং একটার সাথে আরেকটি বিরোধপূর্ণ। তোমরা হয়তো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করো না। তাই ভুলগুলো ধরতে পারো না।"

নাবিলা একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, "কী ভাইয়া! তুমি এটা কী বললে? তুমি কি আল্লাহ তা'আলাকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করো না? তাহলে তো তোমার ঈমানই ঠিক নেই!"

ফাতিমা বললো, "নাবিলা, শান্ত হও। কেউ কোনো দাবি করলে সেই দাবি সম্পর্কে আগে তার কাছ থেকে শুনতে হয়। তার কথার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে বলতে হয়। তার পরে তোমার যুক্তি তুমি উপস্থাপন করতে পারো। এভাবে রেগে গিয়ে কিছুর সমাধান করা যায় না। আচ্ছা আদনান, বলো তোমার কী কী ভুল মনে হয়েছে।"

আদনান বললো, "এই ধরো, মানুষ সৃষ্টির কথা বলার সময় আল্লা একেকসময় একেক কথা বলেছে। একবার বলেছে ধুলা মাটি থেকে, একবার বলেছে পানি থেকে, আবার বলেছে কাদা মাটি দিয়ে, আবার বলেছে আঠালো মাটি দিয়ে, আবার অন্য জায়গায় বলেছে শুক্রবিন্দু থেকে, আবার কখনও বলেছে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, আবার বলেছে পানি থেকে ইত্যাদি আরো অনেক। তাহলে আসলে আল্লা কী দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে? এখানে আয়াতগুলোর মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ আছে।"

আদনান না থেমে আবার বলতে লাগলো, "আবার, মায়ের পেটে ভ্রূণ থেকে বাচ্চা তৈরি হওয়ার ধাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন তিনি শুক্রাণুকে একটি আধারে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু কোরানে ডিম্বাণুর কথা বলা হয়নি। আবার বলা হয়েছে জরায়ুতে নাকি শুক্রাণু জমাট বাঁধা রক্তের রূপ নেয়। এটা বৈজ্ঞানিক ভুল! কারণ একমাত্র গর্ভপাত ছাড়া ভ্রূণ কখনো জমাট বাঁধা রক্ত হয় না। তারপর বলেছে প্রথমে মাংসপিণ্ড হয়। তাতে আবার হাড় হয়। আবার সেটা মাংস দিয়ে

ঢেকে দেওয়া হয়। এরকম হাস্যকরভাবে ভ্রূণের বৃদ্ধি হয় নাকি? বুঝলি নাবিলা, মোহাম্মদ আসলে খুব চালাক ছিলো! কীভাবে তার সঙ্গীদের এসব অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করাতে হয়, তা সে ভালোভাবেই জানতো। তাই ধারণার উপর কিছু ভুল তত্ত্ব তাদের বলেছে, আর তারা বিশ্বাস করেছে। তিনি তো জানতেন না বিজ্ঞান এতো দূর আগাবে। আর তার গল্প ভুল হয়ে যাবে। হা হা হা।"

এই বলে মুরগির রানের মাংসে কামড় দিয়ে আদনান বললো, "এই দ্যাখ, মুরগির এই রানের দিকে লক্ষ কর। দেখ, সবার উপরে আছে মাংস। তার পরে আছে হাড়। তার নিচে আছে মজ্জা। এভাবে দেখেই হয়তো মোহাম্মদ বলে দিয়েছিলো যে, ভ্রূণ আগে জমাট বাঁধা রক্ত হয়। তারপর তাতে হাড় হয়। তারপর তাতে মাংস হয়। এতেই মোহাম্মদ ধারণা করেছিলো যে মানুষ এভাবে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পায়। হা হা। এখন, বিজ্ঞান কী বলে সেটা শোন। বিজ্ঞান বলে, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলে জাইগোট হয়। তারপর সেটা বিভাজিত হয়। তারপর সেখান থেকে এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম, মেসোডার্ম তৈরি হয়। তারপর এগুলো থেকে সবকিছু তৈরি হয়। আর হাড় ও মাংস একসাথেই তৈরি হয় মেসোডার্ম থেকে। আগে বা পরে না। বুঝলি? আর ঠিক এভাবেই কোরান অপবিজ্ঞান দিয়ে ভরা। সুতরাং, কোরান ভুল। হা হা হা।"

এরকম একটা সাধারণ জিনিস আদনান বোঝে না, সেটা দেখে নাবিলা মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হলো। নাবিলা বললো, "ভাইয়া, তোমার বোঝার কিছু ভুল আছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মাটি থেকে তৈরি করেছে তখন, যখন প্রথমবার তিনি মানুষ সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ, যখন তিনি আদম ('আঃ)-কে সৃষ্টি করেছিলেন। তার পরে ঈসা ('আঃ) ব্যতীত সবাইকে তো তিনি পিতামাতার মাধ্যমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে তৈরি করেছেন।[১] আর পরের প্রশ্নের ব্যাপারে..."

ফাতিমা নাবিলাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "হ্যাঁ, নাবিলা। তুমি ঠিক বলেছো। একটু থামো। আমিই বলছি। আর আদনান, তুমি অনেকগুলো অভিযোগ করেছো এবং সব অভিযোগের উত্তর আমার কাছে আছে। আদনান, তুমি মুরগির মাংস দিয়ে যে উদাহরণটা দিলে, সেটা তো তোমার নিজের কথার সাথেই বিরোধপূর্ণ। কারণ, তোমার ভাষ্যমতে কুরআনে ভ্রূণ তৈরির ক্রমধারা হলো-জমাট বাঁধা রক্ত, মাংসপিণ্ড, হাড়, মাংসপেশী। কিন্তু মুরগির রানের সিকোয়েন্স হলো,

অস্থিমজ্জা, হাড়, মাংসপেশী। তোমার ধারণামতে যদি মুরগির রানে মাংসের বিন্যাস দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই তত্ত্ব দিতেন, তাহলে তিনি মজ্জার পরে হাড়কে বাদ দিয়ে তার আগে মাংসপিণ্ড বলতেন না। তাহলে তিনি বলতেন জমাট রক্ত (?) থেকে হাড় হয়েছে, তারপর তাতে মাংস হয়েছে। কিন্তু তিনি তা বলেননি। আর তোমার আরেকটা ভুল হলো, তুমি অস্থিমজ্জা ও জমাট বাঁধা রক্তকে (?) মিলিয়ে ফেলেছো। কিন্তু বাস্তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। তাই তোমার এই ধারণা খণ্ডানোর কোনো গুরুত্ব আমার কাছে নেই। বাকিগুলো ব্যাখ্যা করার গুরুত্ব বহন করে। তাই আমি যদি দেখাতে পারি যে মানুষ সৃষ্টি এবং ভ্রূণের বৃদ্ধি সম্পর্কে কুরআনে যে কথাগুলো আছে তার সবগুলোই সঠিক এবং একটার সাথে আরেকটা সাংঘর্ষিক না, তাহলে কী হবে?"

আদনান বললো, "বলো তো আগে। শুনে দেখি।"

ফাতিমা বলা শুরু করলো, "আচ্ছা, তোমার প্রথম অভিযোগ হলো আল্লাহ মানুষকে আসলে কী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কারণ আল্লাহ একেকসময় একেকটা বলেছেন। তাই তো?"

আদনান খেতে খেতে বললো, "হুম।"

ফাতিমা বললো, "এই বিষয়টি বুঝতে গেলে তোমাকে দুটি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন জিনিস দিয়ে তৈরির কথা চিন্তা করতে হবে। প্রথমে, আল্লাহ সর্বপ্রথম মানুষকে কী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এবং তারপর থেকে কীভাবে সৃষ্টি করছেন। ওকে?"

আদনান বললো, "হুম।"

ফাতিমা বললো, "প্রথমত, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যখন প্রথম সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন জমিনের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করে আনতে।[২] তারা জমিনের সর্বত্র হতে এক মুঠো মাটি এনেছে এবং সেটা ছিলো ধুলা মাটি বা তুরাব।[১] তারপর আল্লাহ তা'আলা এতে পানি মিশিয়েছেন। তখন এটি কাদামাটিতে বা ত্বীনে পরিণত হলো।[৩] তারপর এটিকে কিছু সময় রেখে দেওয়া হলো। তুমি জানো যে কাদামাটিকে রেখে দিলে তা শুকাতে শুকাতে আঠালো মাটি হয়ে যায়। সুতরাং, কাদামাটি

বা ত্বীন পরিণত হলো আঠালো মাটিতে বা ত্বীনিন লাজিবে।[৪] তারপর মাটিতে থাকা পানির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হলো। তারপর এটি গন্ধযুক্ত কালো কাদামাটিতে অর্থাৎ, হামাইম মাসনুনে[৫] পরিণত হলো। তারপর এটি দিয়ে আদম ('আঃ)-এর আকৃতি তৈরি করে শুষ্ক করতে রেখে দেওয়া হলো। এবং এই অবস্থাকে আল্লাহ বললেন 'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মাটি বা সালসাল থেকে।'[৬] তারপরে তিনি (ﷲ) এর মধ্যে তাঁর পক্ষ থেকে রুহ এর সঞ্চার করেন এবং তাঁকে জীবন দেন। এই হলো আদম ('আঃ) সৃষ্টির ঘটনা।"

"এখন আল্লাহ ﷻ আরেক জায়গায় বলেছেন 'মানুষকে তৈরি করা হয়েছে মাটির সারাংশ বা সুলালাতিম মিন ত্বীন থেকে।[৭] এটা তো আগেই বলেছি। এখন আসি আসলেই মানুষ মাটির উপাদান দিয়ে তৈরি কি না। বিজ্ঞানীরা মানুষের দেহের কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট পরীক্ষা করে বের করেছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, মানুষের দেহের উপাদানের মধ্যে অক্সিজেন ৬৫%, হাইড্রোজেন ১০%। এই দুই উপাদান দিয়ে তৈরি হয় পানি। এরপর, আরো থাকে কার্বন ১৮%, নাইট্রোজেন ৩%, ক্যালসিয়াম ১.৫%, ফসফরাস ১%, এছাড়াও আছে অল্প পরিমাণে সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফ্লোরিন ও জিংক।[৮]

"আর মাটির মধ্যেও দেখবে মেইন উপাদানগুলো হলো, আয়রন ৩২.১%, অক্সিজেন ৩০.১%, সিলিকন ১৫.১%, ম্যাগনেসিয়াম ১৩.৯%, সালফার ২.৯%, নিকেল ১.৮%, ক্যালসিয়াম ১.৫%, অ্যালুমিনিয়াম ১.৪% ও অন্যান্য ট্রেস এলিমেন্ট।[৯] সুতরাং, যেহেতু মাটি ও পানির উপাদানগুলোই মানুষের শরীরে আছে, সেহেতু বৈজ্ঞানিকভাবে এটা বলা ভুল নয় যে মানুষকে মাটির সারাংশ অথবা পানি থেকে তৈরি করা হয়েছে।

"আর দ্বিতীয়ত, আদম ('আঃ) সৃষ্টির পরে সমস্ত মানব সভ্যতাকে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার মাধ্যমে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনের ফলেই সৃষ্টি করেছেন।[১০] বিজ্ঞানও তো তা-ই বলে, তুমি সেটা জানো। কী? বুঝাতে পারলাম?"

আদনান উত্তর দিলো, "হুম, বুঝেছি। এটা তো সহজ প্রশ্ন। কিন্তু পরের প্রশ্নটাই আমার মূল প্রশ্ন। সেটার ব্যাপারে কী বলতে চাও?"

উত্তর পাবার পর আদনানের এমন দ্বিমুখিতা দেখে নাবিলা করে হেসে দিলো। নাবিলা বললো, "ভাইয়া, এটা কেমন পল্টিবাজি? হা হা হা। সোজা বললেই হয় তোমার বোঝার ভুল ছিলো।"

নাবিলাকে থামিয়ে ফাতিমা আবার বলা শুরু করলো, "হ্যাঁ, তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ হলো জরায়ুতে ভ্রূণের বৃদ্ধির ব্যাপারে। এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন সূরা মু'মিনুনে।"

এরপর ফাতিমা পাশে থাকা মোবাইল ওপেন করে বলল, "এখন, আমি মোবাইল দেখে কুরআনিক টেক্সট এবং অর্থ অনুযায়ী আয়াতগুলো উল্লেখ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ ﷻ বলেন, 'অতঃপর আমি তাকে নুতফা রূপে এক সংরক্ষিত আধারে বা জরায়ুতে স্থাপন করেছি। এরপর আমি নুতফাকে আলাক্ব রূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আলাক্ব'কে মুদগাহ'তে পরিণত করেছি, এরপর সেই মুদগাহ থেকে ইজামাহ সৃষ্টি করেছি, অতঃপর ইজামাহ'কে লাহমা দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন বা অন্য এক সৃষ্টিরূপে বের করে এনেছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়!' যে আয়াতগুলো বললাম সেগুলো নিয়ে আমি এখন একটু শাব্দিক বিশ্লেষণ করবো এবং কুরআন ও সহিহ হাদিসের সাথে আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা সাংঘর্ষিক কি না সেটা বিশ্লেষণ করবো, ইনশা-আল্লাহ। আচ্ছা নাবিলা, আমার ড্রয়ার থেকে কালো কভারের ডায়েরিটা একটু নিয়ে আসবে?"

ফাতিমা যেসব বিষয়ে লেখাপড়া করে, তার সবকিছুই সে ডায়েরিতে লিখে রাখে। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ছবিগুলো ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করার পর প্রিন্ট করে ডায়েরিতে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখে ফাতিমা। এসব বিষয়ে সে আগেও অনেকের সাথে বিতর্ক করেছে। তাই এগুলো আগে থেকেই তার ডায়েরিতে ছিলো। নাবিলা উঠে গিয়ে ফাতিমার ঘর থেকে ফিরে এসে বললো, "এই নাও ভাবী, তোমার ডায়েরি।"

ফাতিমা ডায়েরিটি নিয়ে বললো, "বসো, নাবিলা।" নাবিলা আবার তার পাশে বসে পড়লো।

ফাতিমা একটু নড়েচড়ে বসলো। হালকা গলা ঝেড়ে নিয়ে বললো, "আদনান,

ডায়েরির দিকে লক্ষ করো। সূরা মূ'মিনুনের ১৩-১৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তিনি নুতফাহকে সংরক্ষিত আধারে অর্থাৎ জরায়ুতে স্থাপন করেছেন। এখন এই নুতফাহ (نُطْفَةً) অর্থ আমরা বিখ্যাত সব অ্যারাবিক টু ইংলিশ ডিকশনারিতে খুঁজলে প্রধাণত দু'টি অর্থ পাবো। সেগুলো হলো- 'Drop of fluid of parents'[১১] এবং 'Sperma (seed) of man and of a woman'।[১২] অর্থাৎ, 'পানির ফোঁটা যা পিতা-মাতা থেকে নির্গত হয়' এবং 'পুরুষ অথবা নারীর বীজ'। বীজ এর বৈশিষ্ট্য গাছ উৎপাদন করা। তাই পুরুষ অথবা নারীর বীজ বলতে মানব দেহে এমন কিছুকে বোঝানো হয়েছে, যার বৈশিষ্ট্যও একই। সুতরাং, নুতফাহ শব্দটি দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এই শব্দ দিয়ে পুরুষ এবং নারীর যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তুমি যে বললে 'কুরআনে শুধু শুক্রাণুর কথা বলা হয়েছে কিন্তু ডিম্বাণুর কথা নেই।'-তোমার এই অভিযোগ ভুল।"

আদনান বললো, "কিন্তু এখানে তো যেকোনো একটির কথা বলা হয়েছে। হয়তো শুক্রাণু জরায়ুতে স্থাপিত হবে অথবা ডিম্বাণু জরায়ুতে স্থাপিত হবে। সেহেতু একসাথে তো দুই অর্থ আমরা নিতে পারি না। সুতরাং, তবুও তো ভুলটি থেকে যায়।"

ফাতিমা উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, একটা সুন্দর প্রশ্ন করেছো। তুমি যদি কুরআনের তাফসিরের পদ্ধতি দেখো, তাহলে দেখবে যে, তার মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো কুরআনের একটি আয়াতের তাফসির অন্য আয়াত করে। এভাবে তাফসির করাকে বলে 'তাফসিরুল কুরআন বিল কুরআন'। এইভাবে তাফসির করলে তোমার প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ সূরা ইনসানের ২ নং আয়াতে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি 'নুতফাতিন আমশাজ(نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ)' থেকে।[১৩] অর্থাৎ, মিশ্রিত শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে।' সুতরাং, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলে যে জাইগোট তৈরি হয়, সেটাই জরায়ুতে স্থাপিত হয় নিরাপদে, এবং সংরক্ষিতভাবে। আবার যদি আমরা নুতফাকে 'Drop of fluid of Parents' বা 'পিতা মাতা থেকে নির্গত এক ফোঁটা পানি' অর্থ হিসেবে নেই, তাহলেও সেটি ঠিক। কারণ, পুরুষের শুক্রাণু বীর্য নামক তরলসহ নির্গত হয়। এবং নারীদের ক্ষেত্রেও ডিম্বাণু তাদের ডিম্বাশয় থেকে পানিসহ বের হয়।[১৩.১] তাহলে, এই দু'টো জিনিসকে আমরা পিতা-মাতা থেকে নির্গত এক ফোঁটা পানিও বলতে

পারি।"

ফাতিমাকে থামিয়ে আদনান বললো, "আচ্ছা, আরেকটি বিষয় হচ্ছে অনেকে নুতফাহকে বাংলায় বীর্য অনুবাদ করেছে। বীর্য আর শুক্রাণু কিন্তু এক জিনিস নয়। আর তুমি নুতফাহকে বলছো পুরুষের ক্ষেত্রে সেটি শুক্রাণু এবং নারীদের ক্ষেত্রে সেটি ডিম্বাণু! এই কথার পক্ষে কি তুমি কোরান-হাদিস থেকে প্রমাণ দিতে পারবে?"

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা, সহজে বুঝানোর জন্য হয়তো তেমন অনুবাদ করেছে। কিন্তু বীর্যের আসল অনুবাদ আরবিতে মানি (مَنِي)।[১৩.২] প্রমাণ হিসেবে মুসনাদে আহমাদের ১ম খণ্ডের পবিত্রতা অধ্যায়ের বীর্য বিষয়ক হাদিসগুলো পড়লে তুমি দেখবে যে সেখানে সব কয়টি হাদিসে বীর্য বুঝাতে মানি (مَنِي) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহর ﷺ কাপড় থেকে মানিয়্যি বা বীর্য ঘষে তুলে দিতেন।'[১৩.৩] কিন্তু নুতফাহ আসলে বীর্যের সামান্য অংশকে বুঝায়। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সে কি স্খলিত বীর্যের একটি অংশ অর্থাৎ নুতফা ছিলো না?'[১৩.৪]। এছাড়াও হাদিস থেকে পাওয়া যায় যে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আযল অর্থাৎ, সহবাসের পরে বাহিরে বীর্যপাতের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, 'বীর্যের সমস্ত অংশ হতে বাচ্চা হয় না[১৩.৫]।' তাহলে বোঝা যাচ্ছে নুতফা বীর্যের একটি অংশ এবং ডিকশনারি অনুযায়ী বীজ। আবার এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে সন্তান কীভাবে হয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সন্তান হয় পুরুষের নুতফাহ ও নারীর নুতফাহ'র মিশ্রণে।'[১৩.৬] সুতরাং, নুতফাহ বলতে পুরুষের এবং নারীর যথাক্রমে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুকে বুঝায়। মনে হয় তোমাকে বুঝাতে পেরেছি। অতএব, তোমার প্রথম অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলো। এই যে, এই ছবিটা দেখো। এখানে, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ও জরায়ুতে স্থাপনের ছবি দেওয়া আছে।"
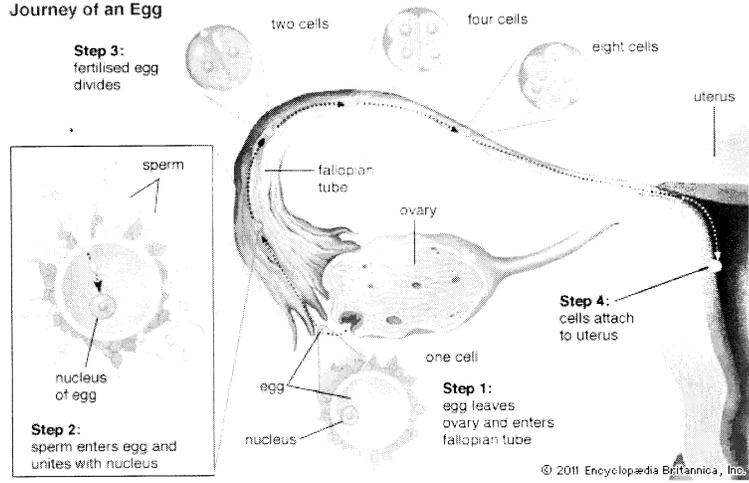
রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের ২১২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

আদনান বললো, "আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝেছি। বলতে থাকো।"

ফাতিমা বললো, "তারপর আল্লাহ বলেছেন 'তিনি নুতফাহকে পরিণত করেছেন আলাক-এ।' এখন আলাক (علق)-এর অর্থ আমরা বিখ্যাত অ্যারাবিক টু ইংলিশ ডিকশনারিতে প্রধানত তিনটি পাই। প্রথমটি হলো, 'Leech like substance' বা 'জোঁকের মতো বস্তু'।[১৪] তারপরের অর্থ হলো, 'Hanging, suspended, clinging thing অর্থাৎ, ঝুলন্ত, কোনোকিছুর সাথে সংলগ্ন আছে এমন'।[১৪] এবং সর্বশেষ অর্থ হলো, 'Blood Clot অর্থাৎ, জমাট বাঁধা রক্ত'।[১৪] আচ্ছা আদনান, এবার কিছু প্রশ্নের উত্তর দাও। বলো দেখি Bug কী, আর ভাইরাস কী।"

আদনান উত্তর দিলো, "Bug হলো ধরো, আমি একটি প্রোগ্রাম বানিয়েছি স্কুলের রেজাল্টশীট তৈরি করার জন্য। কিন্তু প্রোগামে কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছে, যার কারণে আমি আমার প্রোগ্রাম থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবো না। এটাই Bug। আর ভাইরাস হলো মূলত কিছু কোড, যেগুলো নিজেই প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে এবং এটি একটি কম্পিউটারের সিস্টেমকে নষ্ট করে দিতে পারে। যেমন, ট্রোজান।"

ফাতিমা বললো, "কিন্তু আমি যদি বলি Bug হলো মেডিক্যালি ইম্পর্ট্যান্ট

একটি পোকা যা রোগ ছড়ায়, আর ভাইরাস হলো সেই বায়োলজিক্যাল এজেন্ট, যা মানবদেহের ক্ষতি করে, যেমন- এইডস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি, তাহলে কি তুমি আমার সাথে একমত হবে?"

আদনান বললো, "হ্যাঁ, হবো। কারণ এখানে দেখতে হবে তুমি কোন সেন্সে এবং কোন ক্ষেত্রে এই শব্দগুলো ব্যবহার করছো।"

ফাতিমা বললো, "এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্নের জবাব দাও। বলো 'I picked it up with my right hand' এবং 'You gave him the right answer' এই দুটি বাক্যেই আমি যদি Right এর অর্থ ধরি 'ডান হাত', তাহলে কি আমি ঠিক করবো?"

আদনান উত্তর দিলো, "না, ঠিক না। এখানে প্রথম বাক্যে 'Right' এর অর্থ হবে 'ডান হাত' এবং পরের বাক্যে 'Right' অর্থ হবে 'সঠিক'। কারণ এখানে বাক্যের গঠন অনুযায়ী দেখতে হবে যে 'Right' এর কোন অর্থ সঠিক হয়।"

ফাতিমা বললো, "তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছো যে, একটা শব্দের অর্থ তেমনভাবেই করতে হবে যেমনভাবে আমি শব্দটির ব্যবহার করবো বা যে প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করবো এবং তা অবশ্যই প্রদত্ত বাক্যের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তাই তো?"

আদনান উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু এসব বিষয় তো এখন আলোচনার বিষয় নয়। তুমি কিন্তু প্রসঙ্গ বদলাচ্ছো!"

ফাতিমা বললো, "না, আমি প্রসঙ্গ বদলাইনি। যাতে তুমি সহজে জিনিসটা বোঝো, এজন্য বললাম। এখন আসি আলাক (عَلَق) শব্দের আমরা কোন অর্থ নিবো, সেই প্রসঙ্গে। 'আলাকাহ'-এর মাধ্যমে কুরআনে আল্লাহ কোন শব্দটি বুঝিয়েছেন, এখানে সেটি স্পষ্ট নয়। তাহলে অবশ্যই একটু আগে তোমার বলা অনুবাদের মূলনীতি অনুযায়ী আমরা সেই অর্থই নেবো, যেটি এই আয়াত ও প্রকৃত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ নিবো। কারণ এই দু'টি অর্থই কন্টেক্সটের সাথে মেলে। অর্থাৎ, জোঁকের মতো বস্তু এবং ঝুলন্ত বা কোনোকিছুর সাথে সংলগ্ন আছে এমন। কারণ জোঁক যেমন যেখানে লেগে থাকে সেখান থেকে রক্ত চোষে, ভ্রূণও তেমন মায়ের শরীর থেকে রক্তের

মাধ্যমে পুষ্টি নেয় এবং ঝুলে থাকে। তাই এই অর্থ নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর আমরা জমাট বাঁধা রক্ত অর্থ নিবো না। কারণ এটা তোমার বলা মূলনীতির সাথে মেলে না এবং এটা কন্টেক্সটের সাথে মেলে না। আর আরবরাও সাধারণত 'আলাকাহ' বলতে জোঁকের মতো বস্তুকেই বোঝে। তোমার বিশ্বাস না হলে গুগল ট্রান্সলেটরে আরবিতে 'عَلَق' লিখে সার্চ দাও। তাহলেই বুঝতে পারবে।[১৪.১]

"এখন আসি, বিজ্ঞান কী বলে। বিজ্ঞান আমাদের বলে, একটি ভ্রূণ মায়ের জরায়ুতে থাকাকালীন ১৫ থেকে ২৫ দিনে অর্থাৎ ২য় ও ৩য় সপ্তাহে জোঁকের মতো আকৃতিতে পরিণত হয়।[১৫] এবং এটি তখন কানেক্টিং স্টকের সাহায্যে ঝুলে থাকে যা পরে আম্বিলিকাল কর্ডে পরিণত হয়।[১৬] সুতরাং আমরা বলতে পারি, আল্লাহ তা'আলা 'নুতফাতিন আমশাজ' বা নারী এবং পুরুষের প্রজনন সংক্রান্ত মিশ্রিত পানিকে 'আলাক' অর্থাৎ জোঁকের মতো আকৃতিতে পরিণত করেছেন ১৫-২৫ দিনে। অতএব, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের দ্বিতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলো। এবার, ডায়েরির ছবির দিকে লক্ষ করো। তাহলে এটা সহজে বুঝতে পারবে। এখানে কুরআনে বর্ণিত আলাক বা জোঁকের মতো বস্তুকে দেখানো হয়েছে।"
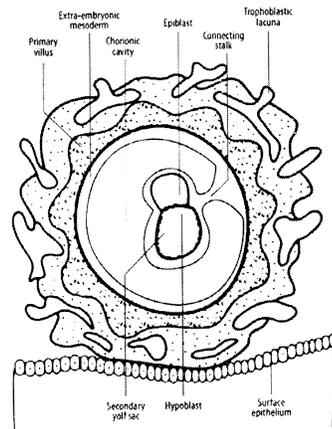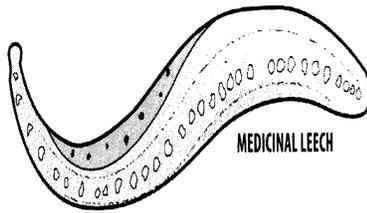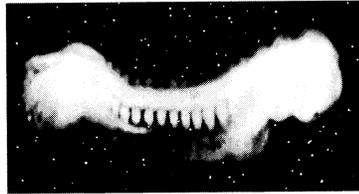
AlaQa

আদনান অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছবিগুলো দেখার পর বললো, "বুঝলাম। কিন্তু তুমি 'জমাট বাঁধা রক্ত' অর্থটিকে এত সহজে রিজেক্ট করতে পারো না। কারণ পূর্বের

অনেক স্কলার এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর এখনো প্রায় সকল বাংলা অনুবাদে 'জমাট বাঁধা রক্ত'-ই লেখা।"

ফাতিমা বললো, "আদনান, আগেই তোমাকে বলেছি যে অনুবাদ দেখে তুমি কুরআনকে বিচার করতে পারো না। এটা সবসময় বুঝতে হবে মূল আরবি টেক্সট দিয়ে। কারণ কুরআন আল্লাহ তা'আলার কথা। আর অনুবাদ মানুষের করা। যেসব আয়াতে ধারণা করে অনুবাদ করা হয়েছে কিংবা যেখানে অর্থের ব্যাপকতা আছে, যুগের পরিবর্তনে হয়তো সেখানে অনুবাদের পরিবর্তন আসবে। কিন্তু কুরআনের টেক্সটের কোনো পরিবর্তন হবে না। আর পূর্বের স্কলারদের আলাক-এর অর্থ এই আয়াতে 'জমাট বাঁধা রক্ত' মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে।"

ফাতিমাকে থামিয়ে আদনান বললো, "কেমন কারণ?"

ফাতিমা বললো, "বলছি, ওয়েট করো। যখন 'আলাক' শব্দটির অর্থ তাঁরা বের করতে গিয়েছেন, তখন তাঁরা এই শব্দের ৩টি অর্থের দিকে লক্ষ করে 'জমাট বাঁধা রক্তকেই' যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। কারণ সেই যুগে মাইক্রোস্কোপ ছিলো না। কেউ দেখতেও পেতো না জরায়ুতে সন্তান কীভাবে বড় হয় বা এত ছোট ভ্রূণ দেখতে কেমন হয়। তাঁরা হয়তো মনে করেছিলেন যে, মানুষের আকৃতি মায়ের পেটে জোঁকের মতো কেন হবে? আর ঝুলন্তই বা থাকবে কেন? যেহেতু রক্ত মানুষের শরীরেরই একটি জিনিস। তাই হয়তো জমাট বাঁধা রক্তই হলো আলাকাহ এর অর্থ। কিন্তু তাঁদের ধারণা সঠিক নয়। নবী-রাসূলেরা ছাড়া কোনো মানুষই তো ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই স্কলারদেরও ভুল হতে পারে। সুতরাং, এই আয়াতে 'আলাক' এর অর্থ এখন স্পষ্ট। আর সেটা হলো, 'জোঁকের মতো বস্তু' এবং 'ঝুলন্ত বা কোনোকিছুর সাথে সংলগ্ন' আছে এমন। তবে, ইবনে কাসিরে দেখলাম বাংলাতে 'লাল রঙের পিণ্ড' অনুবাদ করা। অর্থের দিক থেকে এটাও কিন্তু ভুল নয়। কারণ ওই সময়ে ভ্রূণের ভিতরে রক্ত চলাচলের কারণে লাল রঙের পিন্ডের মতো দেখায়।"

আদনান বললো, "আচ্ছা, ঠিক আছে। সামনে আগাও।"

ফাতিমা আবার বলা শুরু করলো, "এখন আমি পরের স্টেজ 'মুদগাহ' নিয়ে আলোচনা করবো। বিখ্যাত অ্যারাবিক টু ইংলিশ ডিকশনারিগুলোতে মুদগাহ

(مُضْغَةً) এর মূলত দুই ধরনের অর্থ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো, 'একটি মাংসের টুকরা' এবং 'চিবানো মাংসের মতো জিনিস'।[১৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন তিনি 'আলাক্ব'কে অর্থাৎ জোঁকের মতো বস্তুটিকে দ্রুত 'মুদগাহ'-তে, অর্থাৎ চিবানো মাংসের টুকরার আকৃতিতে পরিণত করেন। আমি 'দ্রুত' কথাটি ব্যবহার করলাম কারণ এই লাইনের শুরুতে 'ফা' (ف) আছে এবং আরবিতে 'ফা' যদি কোনো দুই বাক্যের মাঝখানে বসে, তাহলে এটি ওই দুই বাক্যের মধ্যে কাছের সম্পর্ক বুঝায়। অর্থাৎ, দুটি ঘটনার মাঝে যদি 'ফা' শব্দটি আসে, তাহলে বুঝতে হবে সেই দুটি ঘটনা খুব দ্রুত একটির পরে আরেকটি হয়েছে। এখন দেখি ভ্রূণবিদ্যা কী বলে, ঠিকাছে?

"হুম, বলো।" বলে আদনান মাথা ঝাঁকালো।

ফাতিমা বললো, "ভ্রূণবিদ্যা বলে, একটি ভ্রূণ মায়ের জরায়ুতে থাকাকালীন ২৮ তম দিনে এতে সোমাইটগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। এই অবস্থায় এটি ৫ম সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত বা ৪০ দিন পর্যন্ত থাকে। তারপর এই সোমাইট থেকে পরে মেরুদণ্ডের হাড় ও মাথায় কিছু হাড় এবং পর্শুকা তৈরি হয়। তখন এটিকে দেখতে চর্বিত মাংসের টুকরার মতো লাগে।[১৮] এবার এই ছবিটির দিকে তাকিয়ে দেখো, তাহলে বুঝতে সমস্যা হবে না। এখানে কুরআনে বর্ণিত মুদগাহ অর্থাৎ, মাংসের টুকরা বা চিবানো মাংসের মতো জিনিসকে দেখানো হয়েছে।"

Fig: Embryo
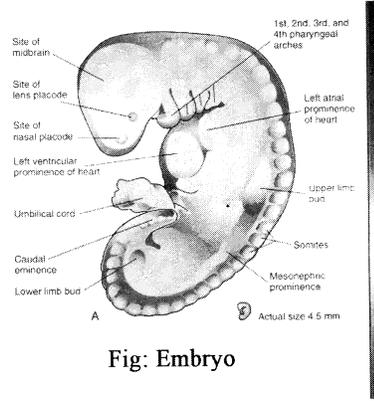
Fig: Chewed Gum
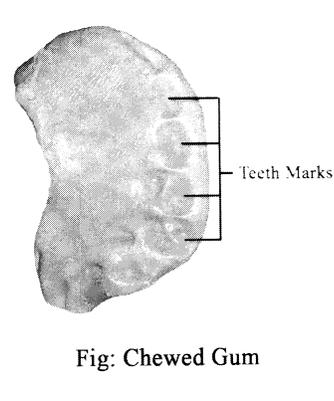
রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের ২১৩ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

ছবিটি দেখানোর পরে ফাতিমা বললো, "তাহলে, আমরা বলতে পারি যে, এই স্টেজের ব্যাপারেও কুরআন সঠিক তথ্য দিয়েছে।"

আদনান কোনো কথা বললো না। ফাতিমা একটু গলা ঝেড়ে তারপর বলা শুরু করলো, "এবার আসি ইজামা এবং লাহমা স্টেজে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এরপর সেই মুদগাহ থেকে ইজামা সৃষ্টি করেছি। অতঃপর ইজামা'কে লাহমা দ্বারা আবৃত করেছি।' এখানে ইজামা (عِظَامًا) এর অর্থ হচ্ছে হাড় এবং লাহমা (لَحْمًا) অর্থ মাংস বা সঠিকভাবে বোঝাতে মাংসপেশী ও পেশী সংশ্লিষ্ট জিনিস।[১৯] অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা 'মুদগাহ' বা 'এক টুকরা মাংস' থেকে 'ইজামা' বা 'হাড়' সৃষ্টি করেন এবং তার পরে হাড়কে লাহমা বা মাংসপেশী দিয়ে আবৃত করে দেন এবং এটাও দ্রুত হয়। কারণ, এই দুই লাইনও 'ফা' (ف) শব্দটি দিয়ে যুক্ত। আর সেটা হয় ৪২ দিন অতিক্রম হবার পর।[২০]

"ভ্রূণবিদ্যা আমাদের বলে ৬ সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ৪২-৪৫ দিনে ভ্রূণে হাড় তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়।[২১] হাড় তৈরি হয় মেসেনকাইম থেকে। এবং ৭ম সপ্তাহে মাংস তৈরি হবার প্রক্রিয়া অর্থাৎ, মায়োজেনেসিস হিসেবে শুধু ঘনীভূত মেসেনকাইম দেখা যায়।[২১.১] তারপরে মায়োটোম বা মাংস যেটি থেকে তৈরি হবে, সেটি দেখা যায়। তারপর ৮ম সপ্তাহে সেই মায়োটোম থেকে 'লিম্ব বাডে' বা নির্দিষ্ট করে বললে, প্রথমে হাতে, তারপর পায়ে মাংস তৈরি শুরু হয়।[২২] সুতরাং, আগের হাড় তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়, তারপরে তার চারপাশে মাংস হওয়া শুরু হয়। কিছু বইয়ে অবশ্য ৭ম সপ্তাহে মাসেল বা মাংস তৈরি শুরু হয় বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহলেও এক্ষেত্রে কুরআনের তথ্য ভুল নয়। কারণ সপ্তম সপ্তাহ শুরু হয় ৪২ দিনে এবং শেষ হয় ৪৯ দিনে। এর মধ্যে প্রথমে হাড়ের কাঠামো গঠন হয় এবং এরপরে হাড়ের চারিদিকে মাংস তৈরি হয়। এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখবে যে, মায়োটোমকে তখনই মাংসপেশী বলা যাবে যখন মায়োটোম মাংসপেশীর বৈশিষ্ট্য পূরণ করবে।

"বিখ্যাত এম্ব্রায়োলজিস্ট জন অ্যালেন এবং বেভারলেই তাঁদের *The Fundamentals of Human Embryology* বইয়ে মাংসপেশি তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখেছেন যে, হাড়ের কাঠামো গঠিত হবার পরেই দ্রুত মাংশপেশী তৈরি করার কোষগুলো অর্থাৎ মায়োব্লাস্টগুলো হাতের সামনে এবং পিছনে জমা হয়ে মাংসপেশীর পিন্ড তৈরি করে।'[২২.১] অতএব, তোমার ওই অভিযোগও ভুল যে, হাড় ও মাংসপেশী একসাথে তৈরি হয়।

"তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমাদের নতুন সৃষ্টিরূপে মাতৃগর্ভ থেকে বের করে আনেন। নতুন সৃষ্টি বলার কারণ হলো, এই প্রক্রিয়াগুলো ঘটার আগ পর্যন্ত মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রানীর ভ্রূণ বাহ্যিকভাবে আলাদা করা যায় না। দেখো, কুরআন এই সূক্ষ্ম ব্যাপারেও আমাদের সঠিক তথ্য দিয়েছে। কত কল্যাণময় স্রষ্টা তিনি, সুবহানাল্লাহ! অতএব, তোমার দ্বিতীয় অভিযোগটিও সম্পূর্ন ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলো। এখন, ছবিটির দিকে লক্ষ করো। দেখো, ৫ সপ্তাহে শুধু হাড়ের গঠন দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো মাংসপেশী দেখানো হয়নি। আবার, ৮ সপ্তাহে হাড়ের চারিদিকে মাংসপেশী দেখানো হয়েছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ রাখবে। মানবদেহে হাড় তৈরি পরিপূর্ণ হয় দু'টি প্রক্রিয়ায়। প্রথমটি, ইন্ট্রামেমব্রেনাস অসিফিকেশন প্রক্রিয়ায় এবং পরেরটি ইন্ট্রাকার্টিলেজিনাস অসিফিকেশন প্রক্রিয়ায়। এই অসিফিকেশান ভ্রূণের জরায়ুতে থাকাকালীন ২য় মাস থেকে একটি বাচ্চার ২৫ বছর পর্যন্ত হয়। সুতরাং, প্রথমেই ভ্রূণে একদম পরিপূর্ণ হাড় তৈরি হয় না। এই হাড় তরুণাস্থি ও মেম্ব্রেনাস ফর্মে থাকে। ভ্রূনে আগে সম্পূর্ন হাড় হয়, তারপরে মাংস হয় - ব্যাপারটি এমন নয়। মূলত, যেখানেই হোক, আগে হাড় তৈরি শুরু হয়, তারপর তার চারপাশ থেকে আস্তে আস্তে মায়োব্লাস্ট ডিফারেন্সিয়েশন হতে হতে মাংসপেশী তৈরি হয়। কুরআনে এমনটিই বুঝানো হয়েছে। আশা করি, এর চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ তোমাকে বুঝাবে না! এবার এই ছবিটি দেখো। এখানে, কুরআনে বর্ণিত ইজামাহ বা হাড় এবং লাহমা বা মাংস তৈরির স্টেজ দেখানো হয়েছে।"

রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের ২১৩ নং পৃষ্ঠায় দেখুন
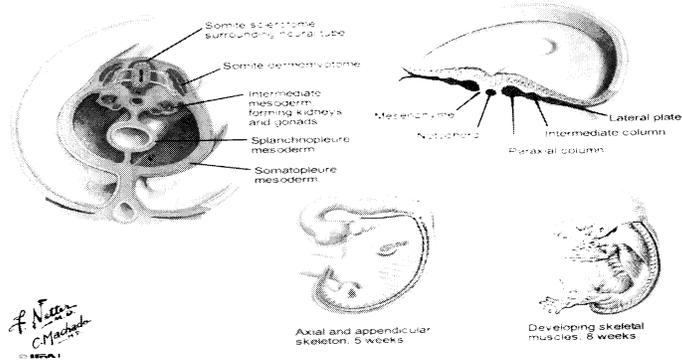
মাঝখান থেকে নাবিলা বলে উঠলো, "উফফ! ভাবী এত বড় লেকচার দিচ্ছো, যা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। আমার আর সময় নেই, আমি নিচতলায়

সিনথিয়ার কাছে যাচ্ছি। তোমরা কথা বলো। আমার বোঝা হয়ে গেছে যে, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে ঠিকই বলেছন।"

আদনান অবজ্ঞার সুরে বললো, "আচ্ছা ঠিকাছে, নিচে যা। তাড়াতাড়ি আসিস। আর ফাতিমা, আমি জানতাম তুমি এমন কোনো উত্তরই আমাকে দিবে। কিন্তু তুমি হয়তো লক্ষ করোনি যে, হাদিসের সাথে তোমার এই ব্যাখ্যার সরাসরি বিরোধ আছে। কারণ বোখারির হাদিসে বলা আছে যে, 'নুতফাহ' জরায়ুতে ৪০ দিন পর্যন্ত জমা থাকে, তারপর ৪০ দিন পরে তা 'আলাকাহ' হয়, তারপরের ৪০ দিন পর 'মুদগাহ' হয়। অর্থাৎ, ১২০ দিনে এই 'মুদগাহ' স্টেজ শেষ হয়। আর তুমি বললে ৪০ দিনেই এই তিন স্টেজ কমপ্লিট হয়। কী ব্যাখ্যা দিলে তুমি! হা হা হা। তুমি এত পড়াশোনা করেছো, আর এটা জানো না? আর এখন আবার তোমার ব্যাখ্যা ঘুরিয়ে দিয়ো না। নাবিলা কিন্তু সাক্ষী আছে তোমার দেওয়া ব্যাখ্যার ব্যাপারে। এই ব্যাপারে তুমি আর কোনো নতুন ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। আর এই হাদিসকে তুমি অস্বীকারও করতে পারবে না। কারণ হাদিসটি বোখারিতে আছে। সুতরাং, তুমি হেরে গিয়েছো। হা হা হা।"

ফাতিমা বললো, "হুম, মিশনারিদের ওয়েবসাইটে ভালোই ঘোরাঘুরি করেছো দেখছি। কিন্তু সত্য খোঁজার চেষ্টা কখনো করোনি। আচ্ছা এই হাদিসের ব্যাখ্যা যদি আমি দিতে পারি তাহলে কী হবে?"

"আরে তুমি আর কী ব্যাখ্যা দিবে? ইন্টারনেটে এসব উত্তর দেওয়া ওয়েবসাইটে হাজার বার খুঁজেও এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা পাইনি। আর তো তুমি! মূলত এই বিষয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়েই আমার মনে সংশয় ঢুকেছিলো। তখন এক জায়গায় দেখলাম যে এক লোক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হাদিস নাকি মোহাম্মদের মারা যাবার অনেক পরে লেখা হয়েছে। এই জন্যে তার নিজস্ব অভিমত হলো, যদি কোনো বাস্তব সত্যের সাথে হাদিসের বিরোধ দেখা যায়, তাহলে তিনি হাদিস ত্যাগ করবেন যদিও তা সহি হয়। তুমিও এই কাজ করবে মনে হয়। হা হা। আচ্ছা যাও, তোমাকে একটা সুযোগ দেই। তুমি যদি এর ব্যাখ্যা দিতে পারো, তাহলে আমি কোরানকে আল্লাহর কেতাব হিসেবে বিশ্বাস করবো এবং তার উপর ঈমান আনবো।" কথাগুলো বলে ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সোফায় বসা অবস্থায় পায়ের উপর পা তুলে নাড়তে লাগলো আদনান।

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা, ঠিকাছে। প্রথম কথা হলো, আমি সহিহ হাদিস অস্বীকার করবো না। কারণ হাদিস যখন সহিহ হয়, তখন তা সত্য হিসেবেই ধরা হয়। কিন্তু সহিহ হাদিসের সাথে যদি সরাসরি কুরআনের আয়াতের প্রকৃত অর্থে সুস্পষ্ট বিরোধ থাকে, তাহলে সেটা অস্বীকার করা যায়।[২৩] এছাড়া সহিহ হাদিস অস্বীকার করলে সে ভুল করবে। যদি এখানে কুরআনে বলা থাকতো ৪০ দিনে ৩টি স্টেজ কমপ্লিট হয়, আর হাদিসে থাকতো ১২০ দিনে, তখন এটা স্পষ্ট বিরোধ হতো। তখন আমি হাদিস রিজেক্ট করতে পারি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কুরআনে দিন উল্লেখ নেই। তাই সহিহ হাদিস ত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এই হাদিসের উপর তোমার বোঝার ভুল আছে। তুমি যেই হাদিসটি উল্লেখ করেছো সেটি শুধু বুখারিতেই না; সেটি মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদেও আছে। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে এটি একটি প্রসিদ্ধ হাদিস। তুমি যেই হাদিসটি বলেছো, সেটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তুমি যেভাবে বলেছো, একদম সেভাবে না। বুখারিতে বর্ণিত হাদিস থেকে দুইটি শব্দ বাদ পড়েছে। সুতরাং, বুখারির হাদিসটি সংক্ষিপ্ত। আর, সেই কারণে যারা ট্রান্সলেশান পড়ে কিন্তু হাদিসের ব্যাপারে যাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই, তারা ভুল বোঝে। যেমন, তুমি!

"এখন তোমাকে একটি নীতি শিখাই। উসুলে হাদিসের নিয়ম অনুযায়ী একই বর্ণনাকারী থেকে যদি একটি হাদিস এক জায়গায় কিছু শব্দ কম ও অন্য জায়গায় কিছু শব্দ বেশি হিসেবে বর্ণিত হয়, তাহলে সংক্ষিপ্ত হাদিস দিয়ে দলিল গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বেশি শব্দে বর্ণিত হাদিস থেকেই প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। বুখারি ও মুসলিমের উভয় হাদিসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ। তাই যেহেতু সহিহ মুসলিমে সম্পূর্ণ হাদিস আছে, তাই সহিহ মুসলিমের হাদিস দিয়ে দলিল দিতে হবে।"- কথাগুলো বলে ফাতিমা ডায়েরির কয়েক পৃষ্ঠা উল্টিয়ে একটি পৃষ্ঠায় গিয়ে থামলো। সেখানে কয়েকটি হাদিস অর্থসহ লেখা ছিলো। সেখান থেকে দেখে দেখে ফাতিমা পড়তে শুরু করলো-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ~ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ (فِي ذَلِكَ) عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ(فِي ذَلِكَ) مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ......

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

> "তিনি বলেন, ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠরূপে প্রত্যায়িত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির বস্তুসমুহ (প্রাথমিক চোখ, কান, নাক, হাত, পা ইত্যাদি) তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিনে একত্রিত করা হয়, এবং এর মধ্যে (ওই চল্লিশ দিনেই) সেটি জোঁকের ন্যায় আকারে পরিণত হয় তার মতো (আলাক্বা'র মতো), তারপর এর মধ্যে (ওই চল্লিশ দিনেই) সেটি একটি গোশত টুকরায় পরিণত হয় তার মতো (মুদ্গাহ'র মতো)। তারপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয়। সে তাতে রূহ্ ফুঁকে দেয়। আর তাকে চারটি কালিমা বা বিষয় লিপিবদ্ধ করার আদেশ করা হয়। রিয্ক, মৃত্যুক্ষণ, কর্ম, বদকার ও নেককার। সে সত্তার শপথ ......।"[২৪]

হাদিসটি পড়ে ফাতিমা বললো, "এখানে এমন বাংলা করার কারণ আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। হাদিসটিতে 'তার মতো বা আলাকা'র মতো এবং তার মতো বা মুদ্গাহ'র মতো' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, ওই ৪০ দিনে আলাকা বা মুদ্গাহ এর যতটুকু পরিপূর্ণ হওয়ার দরকার ছিলো, ততটুকুই হয়েছে। এর বেশি হওয়া সম্ভব নয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদম ('আঃ)-কে তৈরি করেছেন তাঁর আকৃতিতে।' ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এখানে 'তাঁর' বলতে আদম ('আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ যেমন শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পৌঁছায়, আদম ('আঃ)-এর বেলায় বিষয়টি এমন ছিলো না। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আকৃতিতেই তৈরি করেছেন। সুতরাং, আল্লাহ আলাক্বা ও মুদগাহকে তাদের পরিপূর্ণ আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। এখানে সেটিই বোঝানো হয়েছে।"

আদনান ফাতিমার কথার মাঝে বললো, "আচ্ছা, ঠিকাছে সেটা। কিন্তু আমার অভিযোগ ১২০ দিন নিয়ে। সেটার ব্যাখ্যা বলো।"

ফাতিমা বললো, "হ্যাঁ, বলছি। তোমার নতুন উত্থাপিত অভিযোগের প্রথম মিথ্যাচার হলো, এই হাদিসে কোথাও এই কথা বলা নেই যে, ৪০ দিন ভ্রূণকে 'নুতফা' অবস্থায় রাখা হয়।' এই হাদিসটি অন্য একটি সূত্রে আবু আওয়ানাহ

(রাঃ) থেকে পাওয়া যায়। সেখানে এই কথাটি অতিরিক্ত আছে যে, 'নুতফা'কে ৪০ দিন পর্যন্ত রাখা হয়। কিন্তু এই বর্ণনার সনদ সহিহ না। সহিহ সনদগুলোতে 'নুতফা হিসেবে ৪০ দিন রাখা হয়' কথাটুকু নেই।[২৫] সুতরাং, এই কথাটুকু অপ্রমাণিত। দ্বিতীয়ত, এখানে আছে প্রত্যেকের সৃষ্টির বস্তুসমূহ অর্থাৎ, প্রাইমিটিভ বা প্রাথমিক চোখ, কান, নাক, হাত, পা ইত্যাদি তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিনে একত্রিত করা হয়। এবার তুমি এখানে আরবি টেক্সটের দিকে খেয়াল করো। এখানে আমি দুটি শব্দকে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে চিহ্নিত করেছি। শব্দ দু'টি হলো- 'ফি জালিকা(فِي ذَلِكَ)' অর্থাৎ 'তার মধ্যে'। এই শব্দ দুইটি দুই জায়গায় আছে। একটি হলো 'এবং' ও 'সেটি জোঁকের ন্যায় আকারে পরিণত হয়' এর মাঝে। এবং দ্বিতীয়টি আছে 'তারপর' ও 'সেটি একটি গোশত টুকরায় পরিণত হয়' এর মাঝে। সুতরাং, এই লাইনের অর্থ দাঁড়ায়, 'তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির বস্তুসমুহ অর্থাৎ, প্রাথমিক চোখ, কান, নাক, হাত, পা ইত্যাদি তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিনে একত্রিত করা হয়, এবং এর মধ্যে বা ওই চল্লিশ দিনেই সেটি জোঁকের ন্যায় আকারে পরিণত হয় তার মতো অর্থাৎ, আলাকা'র মতো; তারপর এর মধ্যে বা ওই চল্লিশ দিনেই সেটি একটি গোশত টুকরায় পরিণত হয় তার মতো অর্থাৎ, মুদগাহ'র মতো।' এই শব্দ দু'টি বুখারিতে এই একই হাদিসে অনুপস্থিত। এর কারণে বুখারির হাদিস থেকে অনেকে ভুল বোঝে যে, নুতফা, আলাক্বা ও মুদগাহ এই তিন স্টেজে সময় লাগে ১২০ দিন। কিন্তু এটি হাদিসের সঠিক বুঝ না, যেটি সহিহ মুসলিমের হাদিস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।"

"কোথায়? বোখারির হাদিসটি দেখি।" উৎসুক দৃষ্টিতে আদনান ডায়েরিতে তাকালো।

ফাতিমা বললো, "এই যে দেখো। বুখারির হাদিসের দিকে লক্ষ করো এবং '?' চিহ্নের দিকে তাকিয়ে দেখো যে, সেখানে ওই শব্দ দু'টি নেই।"

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ (؟)عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ(؟) مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ....

বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস দুটি ভালোভাবে মিলিয়ে নিলো আদনান।

তারপরে ডায়েরি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ফাতিমাকে বললো, "হ্যাঁ, তাই তো।"

ফাতিমা বললো, "এই তো, লাইনে এসেছো। আদনান, আরেকটি বিষয় লক্ষ করো। কুরআনে বলা হয়েছে, 'মুদগাহ' অর্থাৎ, 'এক টুকরা মাংস বা চর্বিত মাংস' তৈরির পরে সেটি থেকে 'ইজামা' বা হাড় সৃষ্টি হয়।[২৩:১৪] এবং হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন মাতৃগর্ভে নুতফাহ'র অর্থাৎ, মিলিত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর উপর বিয়াল্লিশ দিন চলে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি নুতফাহকে একটি রূপ দান করে তার কান, চোখ, চামড়া, মুদগাহ বা মাংসপিণ্ড ও ইজামা বা হাড় সৃষ্টি করে দেন।[২৬] তাহলে কী বুঝলে?"

"তুমিই বুঝিয়ে বলো, আমার মাথা ঘুরছে।" আদনানের সহজ উত্তর।

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা, আমিই বলছি। এ থেকে বোঝা গেলো যে, মুদগাহ বা এক টুকরা গোশতের পরে হাড় বা ইজামাহ তৈরি হয়। এবং এই হাদিসে দেখা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ভ্রূণ মাতৃগর্ভে ৪২ দিন অতিবাহিত করলে তারপর তার হাড় বা ইজামাহ তৈরি হয়। সুতরাং, বুখারির হাদিসে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, ১২০ দিনে 'মুদগাহ' বা মাংসপিণ্ড তৈরি হয় এবং তার পরে হাড় বা ইজামাহ হয়, তাহলে এই হাদিসের সাথে তাঁর নিজের বক্তব্যই বিরোধপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি একই বিষয়ে দুই রকম কথা কেন বলবেন? সুতরাং, ওই হাদিসের অর্থ যদি আমরা মুসলিমে বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী ধরি যে, নুতফা, আলাকা ও মুদগাহ এই তিন স্টেজ পূর্ণ হয় ৪০ দিনের মধ্যেই, তাহলে কোনো হাদিসের মধ্যে বিরোধ থাকে না এবং বিজ্ঞানের সাথেও সাংঘর্ষিক না। এই হাদিসে অর্থের ব্যাপকতা আছে। হাদিসটিতে 'ফি জালিকা বা এর মধ্যে' এই শব্দটুকু ৩টি শব্দগুচ্ছকে ইঙ্গিত করতে পারে। হয় এই হাদিসে 'ফি জালিকা' শব্দ দুটি সৃষ্টির বস্তুসমূহ বা প্রাথমিক চোখ, কান, নাক, হাত, পা ইত্যাদিকে ইঙ্গিত করছে। অথবা, শব্দ দুটি মায়ের গর্ভকে ইঙ্গিত করছে। নাহলে শব্দ দুটি 'চল্লিশ দিনে' শব্দগুচ্ছকে ইঙ্গিত করছে। এবং হাদিসটিতে 'মিসলা জালিকা বা তার মতো' এই শব্দটুকু ২টি জিনিসকে ইঙ্গিত করতে পারে। একটি 'তার মতো অর্থাৎ, আলাকা'র মতো' অথবা 'তার মতো অর্থাৎ, মুদগাহ'র মতো' এবং অপরটি 'চল্লিশ দিন'।

"এখন হাদিসটিতে 'ফি জালিকা বা এর মধ্যে' এই শব্দটুকুর ইঙ্গিত যদি 'সৃষ্টির

বস্তসমুহ অর্থাৎ, প্রাথমিক চোখ, কান, নাক, হাত, পা ইত্যাদি' বা 'মায়ের গর্ভে' এবং 'মিসলা জালিকা বা তার মতো' এই শব্দটুকুর ইঙ্গিত যদি 'চল্লিশ দিন' ধরে অনুবাদ করা হয়, তাহলে সেই অনুবাদ প্রচলিত অনুবাদের সাথে মেলে। কিন্তু তাহলে এই হাদিসের সাথে সহিহ মুসলিমের হুযায়ফা (রাঃ) এর যে হাদিসটি আমি এইমাত্র বললাম, তার সাথে বিরোধ লেগে যায়। কারণ এভাবে অনুবাদ করলে নুতফা, আলাকা ও মুদ্গাহ স্টেজে ১২০ দিন লাগে এবং এই ১২০ দিন পরে ইজামাহ বা হাড় তৈরি শুরু হয়। কিন্তু, মুসলিমের আরেকটি হাদিসে আছে হাড় তৈরি শুরু হয় ৪২ দিন পরে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এভাবে অনুবাদ করা ঠিক নয়। কিন্তু যদি আমরা 'ফি জালিকা বা এর মধ্যে' এই শব্দটুকুর ইঙ্গিত 'চল্লিশ দিনে' এবং 'মিসলা জালিকা বা তার মতো' এই শব্দটুকুর ইঙ্গিত 'তার মতো অর্থাৎ, আলাকা'র মতো বা তার মতো অর্থাৎ, মুদ্গাহ'র মতো' ধরে অনুবাদ করি, তাহলে হাদিসের অর্থ আসে যে, ৪০ দিনের মধ্যেই নুতফা, আলাকা, মুদগাহ স্টেজ শেষ হয়ে যায় এবং ৪০ দিন পরে যেকোনো সময় হাড় তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবার সহিহ মুসলিমের আরেকটি হাদিসে 'হাড় তৈরি শুরু হয় ৪২ দিন পরে' এই কথাটুকুর সাথেও বিরোধ থাকে না। সুতরাং, উপরোক্ত হাদিসের অর্থ এভাবে করাই যুক্তিযুক্ত। তাহলে তোমার কোনো অভিযোগ তো ধোপে টিকলো না। এবার কি ঈমান আনবে?"

আদনান বললো, "আরে এত ব্যস্ততার কী আছে? আমার আরো প্রশ্ন আছে। এখন বলো, এই হাদিসের অর্থ অনেক স্কলার তো ১২০ দিনই ধরেছে। আমি যদি বলি যে, মুসলিমরা যখন দেখলো বিজ্ঞান অনুযায়ী এই হাদিসের কারণে কোরানে বর্ণিত ভ্রূণের বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তারা এই নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে, তখন তোমার উত্তর কী হবে?"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "দেখো, এই হাদিসে ভাষাগত জটিলতা থাকার কারণে স্কলারদের মধ্যে এর অর্থ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। কী জটিলতা আছে, সেটি তো একটু আগে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলাম। আর ভ্রূণবিদ্যা আবিষ্কারের আগে যে এই ব্যাখ্যা ছিলো না, তা কিন্তু না। কারণ ৭ম শতাব্দীতেই একজন বিখ্যাত স্কলার কামাল আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে আব্দুল কারিম আয-জামলাকানি বলেছেন, 'এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, মায়ের গর্ভে নুতফাহ, আলাকা, মুদগাহ এই তিনটি ধাপ পূর্ণ হয় ৪০ দিনেই'।[২৭] অতএব, এই কথা বলার সুযোগ নেই

যে, এই ব্যাখ্যা পরে সংযোজিত হয়েছে। তিনি এই জিনিসটি ইসলামের প্রথম যুগেই ব্যাখ্যা করেছেন। আমার মনে হয় এর পরে তোমার আর কোনো কথা থাকতে পারে না। অর্থাৎ, শেষ কথা হলো, কুরআন মানুষ সৃষ্টির সূচনা এবং ভ্রূণবিদ্যার ব্যাপারে সঠিক তথ্য দেয়। এতে কোনো ভুল নেই। কী, আদনান? এখন কি তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি এই আশা করতে পারি যে, তুমি তোমার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনছো?"

আদনান বললো, "ঠিক আছে তোমার কথাগুলো। কিন্তু ... ।"

"এখনো কিন্তু?" ফাতিমা বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলো।

আদনানকে বলতে না দিয়ে ফাতিমা বললো, "আদনান, একটু অন্তর থেকে চিন্তা করো। নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবো। আচ্ছা, তোমাকে বুঝাতেই একটি উদাহরণ দেই। কিন্তু তাই বলে তুমি মনে করো না যে আমার বিশ্বাসে সন্দেহ আছে। ধরো, আমার বিশ্বাস মিথ্যা। সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই। তাহলে মারা যাবার পরে তোমার বা আমার কারো কিন্তু কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি আমার বিশ্বাস ঠিক হয় আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলে কেউ থাকে, তাহলে কিন্তু আমি বেঁচে যাবো। কিন্তু তোমাকে চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই বিষয়টি নিয়ে একটু একাকী চিন্তা করো।"

আদনানকে কিছু বলতে না দিয়ে মোবাইলে কুরআনের অ্যাপস বের করে ফাতিমা বললো, "এখন, আমি তোমাকে কুরআনের কিছু আয়াত শুনাই। দেখো তোমার অন্তর উজ্জীবিত হয় কি না। তোমরা যেসব কথা এখন বলো যে, মানুষের সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য নেই, মানুষ মৃত্যুর পরে মাটির সাথে মিশে যাবে, মানুষের কোনো বিচার হবে না, ইত্যাদি বিভিন্ন কথা। কিন্তু দেখো, আল্লাহ তোমাদের এসব কথার উত্তর সেই ১৪০০ বছর আগেই কুরআনে দিয়ে গেছেন।

"কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?[২৮] মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিলো না?[২৯] তারা বলে, আমরা যখন মরে যাবো, এবং মাটি ও

হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? বলুন, হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।[৩০] কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।[৩১] এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাবো পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?[৩২] আয়াতগুলো নিয়ে একটু চিন্তা কি করবে না?"

আদনান কোনো কথা বলছে না। চুপ করে শুনছে। এতক্ষণের আলোচনায় আদনানের তেমন কোনো পরিবর্তন না হলেও, আয়াতগুলো পড়ে শোনানোর পরে আদনানের চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখা গেলো। কিছুক্ষণ চিন্তা করে আদনান উঠে নিজের রুমে চলে গেলো।

রাত তিনটা বাজে। ফাতিমা ঘুম থেকে উঠে দেখে টেবিল ল্যাম্প জ্বালানো এবং আদনান বসে বসে ল্যাপটপ দেখছে। ফাতিমা চোখ দু'টি মুছে উঠে বসলো। ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো, আদনান নিজের ছোটবেলার ছবিগুলো একটির পরে একটি সিরিয়ালি দেখে যাচ্ছে। আর কী যেন চিন্তা করছে।

ফাতিমা জিজ্ঞাসা করলো, "কী হয়েছে, আদনান?"

আদনানের উত্তর, "চিন্তা করে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক। এই যে ছোটবেলা থেকে দেখতে দেখতে ৩০ বছর হয়ে গেলো। ছবিগুলো দেখে নিজের পরিণতির কথা চিন্তা করছি। মৃত্যু কখন আসে, সেটা তো বলা যায় না। এই জীবন কি শুধুই খাওয়া, টাকা কামানো, খেলাধুলার জন্যই? নাকি এর কোনো উদ্দেশ্য আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। আমাকে অবশ্যই সেটা খুঁজে বের করতে হবে।"

ফাতিমা বললো, "তো? এখন কী করতে চাও?"

আদনান ঝলমলে চোখে প্রশ্ন করলো, "ঈমান কিভাবে আনতে হয় যেন?"

ফাতিমা মনের খুশিতে কেঁদে দিয়ে বললো, "আমার সাথে বলো, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

- "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

- "ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহু।"

- "ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহু।"

- "ওয়া রাসূলুহু।"

- "ওয়া রাসূলুহু।"

ফাতিমা বললো, "আল্লাহু আকবার। তুমি এখন একজন মুসলিম। এবার অর্থ বুঝে পড়ো, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত যোগ্য কোনো সত্ত্বা নেই।"

আদনান বললো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত যোগ্য কোন সত্ত্বা নেই।"

ফাতিমা বললো, "এবার বলো, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা এবং বার্তাবাহক।"

আদনান বলল, "আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা এবং বার্তাবাহক।"

হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় জ্বলজ্বল চোখে ফাতিমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিলো।"

[বিঃদ্রঃ বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এরকম ঘটনা অবাস্তব নয়। কিন্তু ইসলামিক শরী'য়াহ অনুযায়ী একজনের কুফরি প্রকাশ পাওয়ার পরে তার সাথে সংসার করা জায়িয নয়। এগুলো প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিছক কিছু গল্প। আদর্শিকভাবে কিছু এখান থেকে গ্রহণ না করার অনুরোধ করা হলো। আমাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু যেন শুধু গল্পের প্রধান তথ্যগুলো নিয়েই থাকে।

এটি ভ্রূণবিদ্যা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে নাস্তিকদের প্রচারিত মিথ্যাচারের জবাব। আশা করি তারা এরপর থেকে অপপ্রচারগুলো বন্ধ করবে। সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই। লেখাটিতে যা কিছু ভুল তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে এবং যা কিছু কল্যাণ, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

- [১] সূরা আল-ইমরান; আয়াত নং- ৫৯
- [২] সুনানে আবু দাউদ; অধ্যায়: সুন্নাহ, হাদিস নং- ৪৬৯৩
- [৩] সূরা আন'আম (৬); আয়াত নং-২
- [৪] সূরা সাফফাত (৩৭); আয়াত নং- ১১
- [৫] সূরা হিজর (১৫); আয়াত নং- ২৬
- [৬] সূরা আর-রহমান (৫৫); আয়াত নং- ১৪
- [৭] সূরা মু'মিনুন (২৩); আয়াত নং- ১২
- [৮] https://www.livescience.com/-3505chemistry-life-human-body.html
- [৯] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Earth
- [১০] সূরা সিজদাহ (৩২); আয়াত নং- ০৭,০৮
- [১১] *A Word for Word Meaning of Quran By Mohar Ali;* Volume: 02; Page: 371,924
- [১২] *Arabic-English lexicon* By Edward William Lane; Volume: 08; Page: 288
- E-link: http://lexicon.quranic-research.net/data/25_n/167_nTf.html
- Sperma Meaning: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/sperma-
- [১৩] সূরা ইনসান (৭৬); আয়াত নং- ০২
- [১৩.১] https://www.britannica.com/science/ovulation
- [১৩.২] সিমেন: https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/semen/
- [১৩.৩] *মুসনাদে আহমাদ,* প্রথম খণ্ড (ইঃফা), পবিত্রতা অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৯৬-১৯৮
- [১৩.৪] সূরা কিয়ামাহ (৭৫); আয়াত: ৩৭
- [১৩.৫] *সহিহ মুসলিম* (সিদ্দিকি আহমেদ অনূদিত); খন্ড: ০৮, অধ্যায় বিবাহ ও আযলের হুকুম, হাদিস নং- ৩৩৮১
- [১৩.৬] *মুসনাদে আহমাদ;* খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ৪৩৭ (হাদিসটি জয়িফ। শুধুমাত্র শব্দের ব্যবহার বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।)
- [১৪] *Arabic-English lexicon* By Edward William Lane; Volume: 05; Page: 417-423
- [১৪.১] https://translate.google.com/#auto/en/ %D%8 B%9 D%84%9 D%82%9 D%8 A9

- [১৫] *The Developing Human,* Clinically Oriented Embryology By Dr. Keith L. Moore; 10th edition; Page : 78
- [১৬] http://www.embryology.ch/anglais/fplacenta/cordon 01.html
- [১৭] *Arabic-English lexicon* By Edward William Lane; Volume: 08; Page: 275
- [১৮] *The Developing Human,* Clinically Oriented Embryology By Dr. Keith L. Moore: page: 619
- [১৯] *A Word for Word Meaning of Quran* By Mohar Ali; Volume: 02; Page: 1078
- [২০] সহিহ মুসলিম-তাকদীর অধ্যায়; হাদিস নং- ৬৪৮৫ (ইঃফাঃ)
- [২১] *Langman's medical embryology* (9th Edition); Chapter: Skeletal System Development: Page no- 171-196
- *The Developing Human. Clinically Oriented Embryology* By Dr. Keith L. Moore(8th edition): Chapter: The limbs: page : 441
- [২১.১] *Langman's medical embryology* (9th Edition): Chapter: Muscular System Development; Page no- 203
- [২২] *Langman's medical embryology* (9th Edition); Chapter: Muscular System Development; Page no- 199-208
- [২২.১] *The Fundamentals of Human Embryology* By John Allen and Beverley Kramer; 2nd Edition, Wits University Press(2010); Page no: 148
- [২৩] https://islamqa.info/en/115125
- [২৪] *সহিহ মুসলিম;* তাকদীর অধ্যায়; হাদিস নং- ৬৪৮২(ইঃফা)
- [২৫] *ফাতহুল বারি* (ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী); ভলিউম: ১১; পৃষ্ঠা: ৪৭৯-৪৮১
- [২৬] *সহিহ মুসলিম;* তাকদীর অধ্যায়; হাদিস নং- ৬৪৮৫(ইঃফা)
- [২৭] *আল-বুরহান আল কাশিফ 'আন ইজায আল-কুরআন;* পৃষ্ঠা: ২৭৫
- [২৮] সূরা মু'মিনুন (২৩); আয়াত নং- ১১৫
- [২৯] সূরা মারইয়াম (১৯); আয়াত নং- ৬৬
- [৩০] সূরা সাফফাত (৩৭); আয়াত নং- ১৬
- [৩১] সূরা আত-তাগাবুন (৬৪); আয়াত নং- ০৭
- [৩২] সূরা ফুসসিলাত (৪১); আয়াত নং- ৫৩

কুরআনের ভ্রূণবিদ্যা কি গ্রীকদের থেকে নকলকৃত?

ফাতিমার ছোটবেলার বান্ধবী সামিরা। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ, ভার্সিটি সব স্থানেই একসাথেই পড়ালেখা করেছে তারা। ভালো সম্পর্কের সূত্রেই সামিরা ছোটবেলা থেকেই ফাতিমার বাসায় আসতো। কিন্তু ফাতিমার বিয়ের পরে তাদের তেমন আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। তবে নিয়মিত ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে না পারলেও ফেসবুকে তার সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে ফাতিমা। কিন্তু ফাতিমা কিছুদিন ধরে লক্ষ করছে যে সামিরা কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। ফেসবুকে তার সব পোস্টেই যেন পরোক্ষভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষ দেখা যায়। সামিরার এরূপ পদস্খলন দেখে একদিন ফাতিমা ম্যাসেজে বললো,

- "সামিরা, কেমন আছিস?"

- "হ্যাঁ, ভালো আছি। আমি সবসময় ভালোই থাকি এবং থাকবো।"

- "এটা কেমন কথা, সামিরা? মানুষকে তো আল্লাহ যেকোনো সময়ই অসুস্থতা দিতে পারেন! এভাবে বলা কি ঠিক হলো?"

- "আরে, ওসব ধর্মীয় কথা বাদ দে তো!"

সামিরার এই অবস্থা দেখে ফাতিমা আর কথা বাড়ালো না। বাসায় আসলে বিস্তারিত আলোচনা করবে, এই আশায় বললো, "আচ্ছা, ঠিক আছে। ওসব কথা বাদ! আমার বাসায় আসিস। তোর দাওয়াত থাকলো।"

সামিরা বললো, “আচ্ছা, ঠিক আছে।”

কিছুদিন পর সামিরা ফাতিমার বাসায় বেড়াতে এলে ফাতিমা তাকে বেডরুমে নিয়ে বসালো। সামনে কিছু নাস্তা দিয়ে ফাতিমা জিজ্ঞাসা করলো, “কেমন আছিস?”

সামিরা উত্তর দিলো, “হ্যাঁ, ভালো আছি।”

- “তোর বাবা মা কেমন আছে?”

- “এই তো ভালোই।”

- “তারপর চাকরীর কী খবর?”

- “ছেড়ে দিবো ভাবছি!”

- “কেন?”

- “আছে। সামনে একটি প্ল্যান আছে।”

- “চাকরী বাদ দিয়ে আজেবাজে ব্লগ-ফ্লগ ঘোরাঘুরি করিস নাকি, হুম?”

- “হঠাৎ এ প্রশ্ন?”

- “না মানে, ফেসবুকে তোর লেখাগুলো আমি নিয়মিত পড়ি তো। তোর এরকম চিন্তাধারার কারণ জানার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলাম।” প্রশ্ন করলো ফাতিমা।

সামিরা উত্তর দিলো, “আমি জ্ঞান অর্জন করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছি, সেটা প্রচার করতেই পারি। তো তুই তো দেখি ইদানীং ভালোই ধর্মের মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজা শুরু করেছিস! ফেসবুকে পোস্টও দিচ্ছিস দেখলাম।”

ফাতিমা বললো, “এগুলো তো কুরআনের নিদর্শন। আমিও জ্ঞান অর্জন করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছি, সেগুলো ইসলাম প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রচার করতেই পারি। কেন? আমি যা লিখেছি, তার কোনোকিছু কি তোর কাছে ভুল মনে হয়েছে?”

সামিরা উত্তর দিলো, "না! ভুল মনে হয়নি। তবে তুই যেটাকে নিদর্শন হিসেবে প্রচার করেছিস, সেটি আসলে কোনো নিদর্শনই নয়। কোরানে ভ্রূণবিদ্যার ব্যাপারে ফেসবুকে তোর লেখা দেখলাম! কিন্তু কোরানের এই ভ্রূণবিদ্যা কোনো নিদর্শন নয়। মোহাম্মদ যখন এগুলো বলেছে, তারও অনেক আগে থেকেই এসব জ্ঞান গ্রীকদের কাছে ছিলো। সুতরাং, মোহাম্মদ সেখান থেকে এগুলো নকল করেছে। তাই এখানে নিদর্শনের কিছু নাই!"

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা, তাহলে তুই মেনে নিয়েছিস যে কুরআনের ভ্রূণবিদ্যা সঠিক। কিন্তু তোর বক্তব্য হলো, মুহাম্মাদ ﷺ এসব বিবরণ গ্রীকদের থেকে নকল করেছেন। তাই তো?"

সামিরা উত্তর দিলো, "হুম! হতে পারে!"

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা সামিরা! মুহাম্মাদ ﷺ তো গ্রীক ভাষা পড়তে বা লিখতে জানতেন না। তাহলে কীভাবে তিনি তাদের বিদ্যা অর্জন করে সেগুলো কুর'আনে বর্ণনা করবেন?"

সামিরা বললো, "হা হা! আমি তো তোকে যথেষ্ট জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী ভাবতাম। কিন্তু এই সাধারণ বিষয় তুই জানিস না? এটা কিন্তু আমি তোর কাছ থেকে আশা করিনি। আচ্ছা, শোন তাহলে। মোহাম্মদের এক সাথী ছিলো, তার নাম হলো হারিস বিন কালাদাহ। সে জন্মগ্রহণ করে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তায়েফের বনু সাকিফ গোত্রে। সে মেডিসিন বিষয়ে পড়ালেখা করেছে দক্ষিণ পারস্যের জুনদিশাপুরের একটি মেডিকেল স্কুলে। সেখানেই সে অ্যারিস্টটল, হিপোক্রিটাস ও গ্যালেনের দেওয়া ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে। পড়াশোনা শেষে সে আরবে চলে আসে, এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর মোহাম্মদ তার কাছ থেকে ভ্রূণবিদ্যা আর যত চিকিৎসা আছে, সবকিছু শিখে নিয়ে তারপর কোরানে বর্ণনা করেছে। সুতরাং, কোরানের ভ্রূণবিদ্যা গ্রীকদের থেকেই নকল করা।[১] তাই এতে বৈজ্ঞানিক নিদর্শনের কিছু নেই। হা হা!"

ফাতিমা বললো, "হুম! সামিরা, আমিও যে এই বিষয়ে জানতাম না তেমনটি নয়। তুই ব্যাপারটি বিস্তারিত জেনে বলেছিস নাকি অন্যের কাছ থেকে শুনেই প্রচার করে বেড়াচ্ছিস, সেটা জানার জন্যই জিজ্ঞাসা করলাম। মূলত তুই যে

ইতিহাস আমাকে বললি, সেই ইতিহাসে কিছু ত্রুটি আছে।"

সামিরা জিজ্ঞাসা করলো, "কেমন ত্রুটি?"

ফাতিমা বললো, "ত্রুটিগুলো আমি তোকে বলছি। কিন্তু এর আগে তোকে বুঝতে হবে 'রিজাল শাস্ত্র' কী জিনিস। রিজাল শাস্ত্র মুসলিমদের আবিষ্কৃত হাদিসের জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখার নাম। এর মাধ্যমে হাদিস বর্ণনাকারীগণের নাম ও পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়, তাই একে 'আসমাউর রিজাল' বলা হয়। একটি হাদিসে দু'টি অংশ থাকে- সনদ ও মতন। আর সনদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সনদে উল্লিখিত সাহাবা, তাবিঈ তথা সকল বর্ণনাকারীর সার্বিক অবস্থা জানা যায়। এ কারণে একে হাদিস শাস্ত্রের অর্ধেক বলা হয়ে থাকে। এছাড়া ইলমে হাদিসের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো রিজাল শাস্ত্র। এবার আমি তোকে তোর বলা কথার ত্রুটিগুলো বলছি।"

এই মুহূর্তে রুমে আদনানের বোন নাবিলা এসে বললো, "ভাবী, কার সাথে কথা বলছো? এই আপুটি কে?"

ফাতিমা বললো, "নাবিলা, এ সামিরা। আমার ক্লাসমেট। আর, সামিরা, এ নাবিলা; ও আমার ননদ।"

নাবিলা বললো, "ও! আপু কেমন আছেন?"

সামিরা বললো, "হ্যাঁ, নাবিলা ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?"

নাবিলা উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। তো, তোমরা কী নিয়ে কথা বলছো?"

ফাতিমা বললো, "এই তো কুরআনের ভ্রূণবিদ্যার বিরুদ্ধে নকলিকরণের অভিযোগ করেছে তোমার আপু। তাই আমি একটু বিশ্লেষণ করছি।"

নাবিলা বললো, "ও! তাহলে আমিও একটু শুনি।"

এই বলে নাবিলা, ফাতিমা ও সামিরার সামনে খাটের উপর বসে পড়লো। ফাতিমা আর সামিরাও নড়েচড়ে নাবিলাকে একটু বসার জায়গা করে দিলো।

ফাতিমা একটু নড়েচড়ে বসে বলা শুরু করলো, "সামিরা, প্রথমত তুই বলেছিস যে 'হারিস বিন কালাদাহ' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথী বা সাহাবি ছিলেন। এখন এই রিজাল শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা অনুসন্ধান করবো যে, সত্যিই তিনি সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কি না। রিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত বই *উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা* গ্রন্থটি লিখেছেন আলি ইবনুল আসির।[২] তিনি এই কিতাবে হারিস বিন কালাদাহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন, 'তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং তিনি সাহাবি নাকি সাহাবি নন-এই বিষয়ে মতভেদ আছে।[৩] ইবনে কিফতিও মন্তব্য করেছেন যে, তিনি সাহাবি ছিলেন কি ছিলেন না এ নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ সাহাবা তাদেরই বলা হয় যারা আল্লাহর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং ঈমান এনেছে, মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে। এই সূত্রে তিনি সাহাবা নন।[৪] অনেকের মতে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি অর্থাৎ তিনি মুসলিম নন।'[৫] বুঝলি?"

সামিরা বললো, "তাদের এই ফতোয়ার পক্ষে প্রমাণ কী?"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "তুই আবার দলিলের খোঁজও করিস? হা হা। আচ্ছা, এই কথার প্রমাণ একটি হাদিস থেকে পাওয়া যায়। হাদিসটিতে আছে, বিদায় হজ্জের সময় সা'দ (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখতে গেলে সা'দ (রাঃ) বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মনে হয় এই অসুস্থতায় আমার মৃত্যু ঘটবে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি এই আশা করি যে আল্লাহ্ তোমাকে সুস্থতা দান করবেন, এবং এর দ্বারা কিছু লোকের উপকার ও কিছু লোকের ক্ষতি পৌঁছাবেন।' তখন তিনি হারিস বিন কালাদাহকে বলেন সা'দকে (রাঃ) চিকিৎসা করে সুস্থ করার জন্য। উত্তরে হারিস বললো- 'ওয়াল্লাহি, আমি আশা করি যে, সে সুস্থ হয়ে যাবে।' তারপরে হারিস বললেন, 'তোমার কাছে কি আজওয়া খেজুর আছে?' সা'দ (রাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন হারিস খেজুর, হিলবাহ নামের এক ধরনের হলুদ শস্য ও চর্বি দিয়ে একধরনের ঔষধ তৈরি করে তাকে (রাঃ) খাওয়ায়। তখন, সে এমনভাবে সুস্থ হয়ে যায়, যেন কখনো অসুস্থই ছিলো না।'[৬] এই হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করেন ইবনে আবি হাতেম। তাঁর মন্তব্য ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর রিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-ইসবাহ ফি তামিয়্যিজ আল-সাহাবা* গ্রন্থে বর্ণনা করেন।[৭] তিনি উল্লেখ করেন, 'ইবনে হাতেম বলেন, 'আল-হারিস মুসলিম হিসেবে গৃহীত নয়। এই হাদিস থেকে

প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলিম অসুস্থ হলে অমুসলিম কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা নেওয়া বৈধ।'[৮] তাহলে এ থেকে তো প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হারিস বিন কালাদা মুসলিম কিংবা সাহাবা ছিলেন না।"

সামিরা কোনো কথা বলছে না। চুপ করে শুনছে। নাবিলা উঠে গিয়ে দুজনের জন্য কিছু নাস্তা নিয়ে এসে বললো, "আপু এগুলো খান, আর গল্প করেন।"

সামিরা খুশি হয়ে বললো, "আচ্ছা, ঠিকাছে। ফাতিমা, তুই বল। আমি শুনছি।"

ফাতিমা বললো, "এখন, হারিস বিন কালাদাহ মেডিসিন বিষয়ে দক্ষিণ পারস্যের জুনদিশাপুরের মেডিকেল স্কুলে পড়ালেখা করেছেন কি না, সেটা খন্ডন করি। অনেক ইতিহাসবিদ জুনদিশাপুরে মেডিকেল স্কুলের অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন। এমন একজন হলেন David C. Lindberg । তিনি বলেন, 'জুনদিশাপুরে মেডিকেল স্কুলের অস্তিত্বের পক্ষে আমাদের কাছে কোনো যুক্তিযুক্ত বা সন্তোষজনক প্রমাণ নেই।'[৯] আবার, ইতিহাসে ওই সময়ে এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন মেডিসিন বিষয়ক ঐতিহাসিক Roy Porter । তিনি বলেন, 'জুনদিশাপুরে মেডিকেল অ্যাকাডেমির অস্তিত্বের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।'[১০] আরো একজন ইতিহাসবিদ জুনদিশাপুরে মেডিকেল অ্যাকাডেমির অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করে বলেন, 'সেখানে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সম্ভবত কোনো হাসপাতাল থাকতে পারে। কিন্তু কোনো মেডিকেল স্কুলের অস্তিত্ব ছিলো না। কারণ আমরা দেখি, ৮ম শতাব্দীর প্রথম দিকে উমাইয়্যাহ খিলাফতের সময় জুনদিশাপুরে মেডিকেল কলেজ খ্যাতি অর্জন করে।'[১১] সুতরাং, ওই সময়ে জুনদিশাপুরে এমন কোনো মেডিকেল স্কুল ছিলো না যে সেখান থেকে হারিস বিন কালাদাহ ভ্রূণবিদ্যা শিখে এসে রাসূলুল্লাহকে ﷺ শিখাবে।"

ফাতিমাকে থামিয়ে সামিরা বললো, "কিন্তু আমি যে উইকিপিডিয়াতে দেখলাম, হারিস বিন কালাদাহ মুসলিম ছিলেন এবং মোহাম্মদের সাথী ছিলেন! এবং তিনি জুনদিশাপুরের মেডিকেল স্কুলে পড়েছেন।"

ফাতিমা বললো, "দ্যাখ, সামিরা! ইসলামের সব বিষয়ে যে তুই ইন্টারনেট থেকে সঠিক তথ্য পাবি - এমন তো নয়। ইসলামের প্রত্যেক বিষয় যাচাই করার

জন্য আলাদা আলাদা শাস্ত্র আছে। যারা জানে, তাদের কাছ থেকে তোকে এগুলো প্রমাণসহ জেনে নিতে হবে। এবার, তোকে তোর অজানা একটি তথ্য দিচ্ছি! এই বিষয়ে সর্বপ্রথম অভিযোগ তোলা হয় ১৯৯০ সালে খ্রিষ্টান মিশনারিদের পক্ষ থেকে। তারপর থেকে সবাই এটা বঙ্গানুবাদ করেছে, কিন্তু সত্য-মিথ্যা কেউ যাচাই করেনি বা করলেও ইসলামোফোবিয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিথ্যা অপপ্রচার করেছে। আর জুনদিশাপুরে মেডিকেল স্কুলের অনুপস্থিতির ব্যাপারে তো ঐতিহাসিকদের মতই উল্লেখ করলাম। তাঁরা তো কেউ মুসলিম নন যে, তুই পক্ষপাতিতার অভিযোগ তুলবি।”

এটুকু বলে ফাতিমা ট্রে থেকে কিছু আঙুর নিয়ে খেতে খেতে বললো, “তর্কের খাতিরে যদি তোর কথা মেনেও নেই যে, হারিস বিন কালাদাহ জুনদিশাপুরে ভ্রূণবিদ্যার ব্যাপারে জেনেছে, তবুও কিন্তু কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে কুরআনের ভ্রূণবিদ্যা তার থেকে নকল করা। কারণ, কুর’আনে ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে সূরা মু’মিনুনের ১৩-১৪ নং আয়াতে এবং এই আয়াত দুটি নাযিল হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় থাকাকালীন।[১২] অর্থাৎ, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের আগে। উল্টোদিকে, তায়েফের বনু সাকিফ গোত্রের বাসিন্দা হলো হারিস বিন কালাদাহ। এই তায়েফ ইসলামিক ইতিহাসের পাতায় আসে হুনাইনের যুদ্ধের পরে তায়েফ অবরোধের সময়। এই অবরোধ ২০ দিন ধরে অব্যাহত ছিলো।[১৩] এসময় আবু বাকরাহ সহ কয়েকজন দাসকে রাসূলুল্লাহ মুক্ত করে দেন। এই আবু বাকরাহ ছিলেন হারিস বিন কালাদার ক্রীতদাস। আর এই ঘটনা ঘটে মক্কা বিজয়েরও পরে এবং সেটা মদীনায় হিজরতের অনেক পরে।[১৪] এর আগে কোনো সময় হারিস বিন কালাদাহ-এর ব্যাপারে কোনো কিছু ইসলামের ইতিহাসে নেই বা আল্লাহর রাসূলের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে - এমন প্রমাণ নেই। তাই ভ্রূণবিদ্যার জ্ঞান হারিস বিন কালাদার কাছ থেকে নকল করার অভিযোগ ভিত্তিহীন মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। আমার মনে হয় তুই বুঝতে পেরেছিস যে তুই অপপ্রচারের শিকার।”

সামিরা বললো, “আচ্ছা মেনে নিলাম যে মোহাম্মদ হারিস বিন কালাদা থেকে ভ্রূণবিদ্যার জ্ঞান নকল করেনি। কিন্তু ভ্রূণবিদ্যার এই জ্ঞান তো অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটাস এবং বিশেষ করে গ্যালেনেরও ছিলো। তাই কোরানিক ভ্রূণবিদ্যা কোনো বৈজ্ঞানিক নিদর্শন নয়। এটা তো ওই সময়ের বিজ্ঞানীরাও জানতেন।”

ফাতিমা বললো, "সামিরা, তুই ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান রাখিস তা আমি জানি না। আমার মনে হয় তোর এই বিষয়ে জ্ঞান্ কম। তা নাহলে তুই গ্রীকদের ভ্রূণবিদ্যার জ্ঞান সঠিক বলতি না। ভ্রূণবিদ্যা এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে মানুষ অনেক প্রাচীনকাল থেকেই গবেষণা করে যাচ্ছে। কারণ, মানুষ কীভাবে তৈরি হয়-এই বিষয়ে প্রত্যেক মানুষেরই আগ্রহ থাকে। এই আগ্রহ থেকেই গবেষণা করতে করতে ভ্রূণবিদ্যা এখন বিজ্ঞানের একটি বৃহৎ শাখায় পরিণত হয়েছে। তোকে জানানোর জন্য আমি এখন কুরআন নাযিলের আগে ভ্রূণবিদ্যা বিষয়ক যত মতামত ছিলো সেগুলো একটু সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করছি। নাবিলা আমার ডায়েরিটা মনে হয় ড্রয়িং রুমে সোফার উপরে আছে। একটু নিয়ে এসো তো।"

নাবিলা উঠে গিয়ে অনেক্ষণ পরে ফিরে এসে বললো, "পাচ্ছি না তো, ভাবী!"

সামিরা টিটকারি মেরে বললো, "এই সামান্য জিনিস বলতে তোর ডায়েরি লাগে? এজন্যই তোদেরকে আমরা মাথামোটা বলি!"

"এত কিছু মুখস্থ রাখা তো সহজ বিষয় না। তুই অভিযোগ করেছিস। আমি সেটা খন্ডন করছি। আমাকে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করতে হচ্ছে। কিন্তু তুই তো কোনো প্রমাণ দিয়ে কথা বলিসনি। এজন্য তোর বেশি কিছু মুখস্থ থাকার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আমার বলতে ডায়েরিটি লাগবে। কারণ, আমি ভ্রূণবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করার সময় সবকিছু সেখানে লিখে রেখেছিলাম।" বলে ডায়েরিটি খুঁজতে উঠে গেলো ফাতিমা।

কিছুক্ষণ পর ফাতিমা ডায়েরিটি হাতে নিয়ে রুমে ঢুকলো। নাবিলার তো মাথায় হাত। বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলো, "এটা কোথায় পেলে?"

- "কেন? সোফায়।"

- "কই? আমি তো পেলাম না!"

- "পাশে পড়ে গিয়েছিলো।"

- "ও! এজন্যই পাইনি।"

- "আরেকটু ভালো করে খুঁজলে পেতে মনে হয়!"

-"স্যরি।" বলে মাথা নিচু করে থাকলো নাবিলা।

-"আরেহ! স্যরি বলার কিছু নেই। ইটস ওকে।" বলে আবার সামিরার পাশে গিয়ে বসলো ফাতিমা।

তারপর ডায়েরির দিকে তাকিয়ে ফাতিমা বললো, "তাহলে প্রথমে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ '*Garbha Upanishad*'[১৫] এর কথা বলি। এই বইয়ে ভ্রূণবিদ্যার ব্যাপারে বলা আছে, 'গর্ভধারণের উপযুক্ত সময়ে সহবাস করার কারণে পুরুষের বীজ বা শুক্রাণু ও নারীদের রজঃস্রাবের রক্তের সম্মিলিত হবার ফলে একটি ভ্রূণ অস্তিত্বে আসে। একদিন পরে এটি একটি মিশ্রিত বস্তুতে পরিণত হয়। সাতদিন বা এক সপ্তাহ পরে এটি একটি বুদবুদে পরিণত হয়। তার দুই সপ্তাহ পরে বা চৌদ্দ দিন পরে অর্থাৎ ২১তম দিনে গোলাকার বস্তু বা পিণ্ডে পরিণত হয়। একমাসে বা ৪ সপ্তাহে এটি কঠিন হয়ে একটি শক্ত পিন্ডে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মাসে বা ৮ সপ্তাহে মস্তিষ্ক তৈরি হয়। এবং তৃতীয় মাসে বা ১২ সপ্তাহে বাহু অর্থাৎ হাত-পা তৈরি সম্পন্ন হয়। চতুর্থ মাসে পেট ও শ্রোণীদেশ তৈরি সম্পন্ন হয়। পঞ্চম মাসে মেরুদণ্ড তৈরি সম্পন্ন হয়। ছয় মাসে নাক-চক্ষু-কান তৈরি সম্পন্ন হয়। সপ্তম মাসে ভ্রূণে জীবন সঞ্চারণ করা হয়। আট মাসে এই ভ্রূণ সম্পূর্ণ হয়, মানে সবদিক থেকে আরকি।'[১৬] কী বুঝলি?"

"কী বুঝবো? প্রথমে কিছু ভুল আছে।" বললো সামিরা।

ফাতিমা বললো, "শুধু প্রথমে না। অনেক জায়গায় ভুল আছে। প্রথম যে ভুল সেটি হলো, মানুষ সৃষ্টিতে রজঃস্রাবের রক্তের অংশগ্রহণ। আসলে কুরআনের আগে সব গ্রন্থেরই এমন ধারণা ছিলো যে, শুক্রাণু এবং রজঃস্রাবের রক্তের মিশ্রণের ফলে মানুষ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আসলে এই ধারণা ভুল। তারপরে, বুদবুদ, গোল পিণ্ড এগুলো ভ্রূণের বিবরণের জন্য কোনো গৃহীত বৈশিষ্ট্য নয়। তারপরের ভুল হলো, একটি ভ্রূণের মাথার অস্থি নির্দিষ্ট আকৃতিতে আসে ২০ সপ্তাহে।[১৭] তারপরেও ব্রেইনের বৃদ্ধি চলতে থাকে। কিন্তু উপনিষদে বলা আছে ৮ সপ্তাহে মস্তিষ্ক তৈরি হয়। সুতরাং, এই ধারণাও ভুল। তারপরের ভুল হলো, উপনিষদে বলা আছে ৭ মাস বয়সে ভ্রূণে জীবন্ সঞ্চার করা হয়। কিন্তু এই তথ্যও ভুল। কারণ, মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে কোনো সমস্যা ছাড়াই বেঁচে গিয়েছে তার নাম হলো, James Elgin Gill। ওর জন্ম

কানাডার ওটাওয়া-তে ১৯৮৭ সালের ২০শে মে। জন্মের সময় তার বয়স ছিলো ২১ সপ্তাহ ৫ দিন অর্থাৎ প্রায় ৫.৫ মাস।[১৮] তাহলে ৭ মাসেই যদি ভ্রূণে প্রাণ আসতো, তাহলে এই বাচ্চা বেঁচে যেতো না। আবার, উপনিষদে বলা হয়েছে, ৮ মাসে ভ্রূণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু ভ্রূণবিদ্যা বলে, একটি ভ্রূণের ফুসফুস পরিপূর্ণ হয় ৯ মাস শেষ হলে।[১৯] তাহলে দেখা যাচ্ছে, এসব ক্ষেত্রেও উপনিষদ ভুল তথ্য দেয়।"

"হুম।" বলে হাসিমুখে মাথা নাড়লো নাবিলা।

ফাতিমা বলতে থাকলো, "এবার ইংরেজিতে উপনিষদ থেকে কিছু পড়ে শোনাচ্ছি। মনোযোগ দিয়ে শোন। সেখানে বলা হয়েছে, 'If the potency of both the father and the mother are equal with no pulling force in either, it becomes an intersex. It is born as a blind or as a deaf or dumb or short or with other deficiency due to any mental confusion during the period of pregnancy. If the male reproductive fluid is split because of the air moving around in the body, twins are born. [২০]

> অর্থাৎ, পিতার বীর্যের শক্তি যদি মাতার শক্তির সমান হয়, তাহলে সন্তান হিজড়া তৈরি হয়। আর গর্ভধারণের সময় যদি একজন মা কোনো ধরনের মানসিক দুশ্চিন্তায় ভোগে, তাহলে সন্তান অন্ধ, বধির ইত্যাদি হিসেবে জন্ম নেয়। আর যদি শরীরে বাতাস চলাচল করার কারণে বীর্য দুই ভাগ হয়ে যায়, তাহলে জমজ সন্তান জন্মায়। সামিরা, এই বক্তব্য মনে হয় আমার আর খণ্ডন করা লাগবে না। তুই নিজেই বুঝেছিস যে বিজ্ঞান অনুযায়ী এই কথাগুলো কতটুকু অযৌক্তিক।"[২১]

এতটুকু বলে মনে হয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ফাতিমা। ফাতিমাকে বিরক্তির সুরে সামিরা বললো, "কিন্তু আমি তো ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে ভারতীয়দের উপনিষদের কিছু তোর কাছে জিজ্ঞাসা করিনি। আমি তো বলেছি গ্রীকদের কথা!"

ফাতিমা একনজরে ডায়েরির একটি পেজে চোখ বুলিয়ে বলা শুরু করলো, "হ্যাঁ, এবার গ্রীকদের ধারণা তোকে বলছি। গ্রীকদের মধ্যে ভ্রূণবিদ্যার ব্যাপারে মন্তব্য ও গবেষণাকারীদের মধ্যে হিপোক্রিটাস, অ্যারিস্টটল ও গ্যালেনের নাম

উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে হিপোক্রিটাস বলেন, 'বীর্য এমন একটি জিনিস, যেটি পিতা ও মাতার সমস্ত দেহ থেকে আসে। যখন ভ্রূণ হয়, তখন এটি মায়ের মেন্সট্রুয়াল ব্লাডের মাধ্যমে পুষ্টি পেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এজন্য সন্তান ধারণের পরে মায়েদের মেন্সট্রুয়েশান বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে এই মিশ্রণ থেকে মাংস ও নাভী তৈরি হয়।'[২২] হিপোক্রিটাসের প্রথম ভুল হলো, বীর্য কখনোই সম্পূর্ণ দেহ থেকে আসে না। এবং দ্বিতীয় ভুল হলো, ভ্রূণ মেন্সট্রুয়াল ব্লাডের মাধ্যমে পুষ্টি পায় না। আর এই পুষ্টির কারণে মেন্সট্রুয়েশান বন্ধও হয় না। নারীদের মেন্সট্রুয়েশান বন্ধ হওয়ার কারণ হলো, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলে জাইগোট হবার পরে বিভিন্ন স্টেজ অতিক্রম করে। তখন উৎপন্ন ট্রপোব্লাস্ট কোষ থেকে হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন বা hcG নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ল্যুটিনাইজিং হরমোন বা LH নামক আরেকটি হরমোন নিঃসৃত করে। এই ল্যুটিনাইজিং হরমোন বা LH ডিম্বাশয়ের মধ্যে কর্পাস ল্যুটিয়্যামকে নষ্ট হতে দেয় না। তখন কর্পাস ল্যুটিয়্যাম থেকে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। এই অতিরিক্ত হরমোনের কারণেই যখন কেউ গর্ভবতী হয়, তখন তার জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মেন্সট্রুয়েশান বন্ধ হয়ে যায়।[২৩] তাহলে তুই বুঝতেই পারছিস যে, হিপোক্রিটাসের ধারণাতেও প্রচুর ভুল ছিলো।"

"নাবিলা ফ্রিজ থেকে একটু ঠাণ্ডা পানি আনো তো।" বলে সামনে রাখা একটি বিস্কুট নিয়ে খাওয়া শুরু করলো ফাতিমা। নাবিলা উঠে গেলো পানি আনার জন্য। ফ্রিজ থেকে পানি এনে দিয়ে এবার ফাতিমার পাশে গিয়ে বসলো নাবিলা। বললো, "নাও, পানি খাও।"

ঢকঢক করে হাফ লিটার পানি একাই শেষ করে দিলো ফাতিমা। অনেকক্ষণ কথা বলায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে মনে হয়।

পানি খেয়ে ফাতিমা ডায়েরি থেকে আরেকটি পয়েন্ট দেখে নিয়ে বললো, "বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেন, 'একটি ভ্রূণ তৈরি হয় মেয়েদের মেন্সট্রুয়াল ব্লাড দিয়ে, যখন এটি ছেলেদের বীর্য দ্বারা সক্রিয় হয়।'[২৪] অ্যারিস্টটলও একই ভুল ধারণা পোষণ করতেন যে, ভ্রূণ তৈরি হতে মেন্সট্রুয়াল ব্লাড লাগে। এছাড়াও অন্যান্য ভুল তো রয়েছেই। সেগুলো আমি উল্লেখ করলাম না। তাহলে বোঝা

গেলো যে, অ্যারিস্টটলও জ্রণবিদ্যা সম্পর্কে প্রচুর ভুল ধারণা পোষণ করতেন। এবার তোকে গ্যালেনের ধারণা বলি। গ্যালেনের ধারণা অবশ্য হিপোক্রিটাস, অ্যারিস্টটল ও অন্যান্যদের থেকে উন্নত ছিলো। ক্লডিয়াস গ্যালেন বলেন, 'অ্যারিস্টটল যেমন বলেছিলেন যে মেয়েদের মেন্সট্রুয়াল ব্লাড বীর্য দ্বারা সক্রিয় হয়ে জ্রণ তৈরি হয়, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তেমন নয়। প্রকৃতপক্ষে জ্রণ তৈরি হয় ২টি বীর্য এবং মেন্সট্রুয়াল ব্লাডের মিশ্রণে। তারপরে এটি রক্ত দিয়ে পরিপূর্ণ হয়। তখনও হৃদপিণ্ড, স্নায়ু এবং যকৃত পরিপূর্ণ আকৃতিতে থাকে না। তারপরে হাড়ের উপরে মাংস তৈরি হয়। এর পরে প্রকৃতি তার হাত ও পা সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে।'[২৫] সামিরা দ্যাখ, গ্যালেনও বলেছেন যে, মেয়েদের মেন্সট্রুয়াল ব্লাড এবং পুরুষের ২টি বীর্য মিশ্রিত হয়ে জ্রণ তৈরি হয়। আর উনি ২টি বীর্য বলতে কী বুঝিয়েছেন তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। সুতরাং, গ্যালেনের ধারণাতেও ভুল ছিলো। এবার ইয়াহুদিদের ধারণা শুনবি?"

"বল, শুনি।" সামিরা উত্তর দিল।

ফাতিমা বললো, "ইয়াহুদীদের *Talmud* অনুযায়ী, 'একটি জ্রণের হাড়, রগ বা টেনডন, নখ, স্নায়ু এবং চোখের সাদা অংশ তৈরি হয় পুরুষের অংশ থেকে; তাই এগুলো সাদা রঙের। আর চামড়া, মাংস, রক্ত এবং চুল তৈরি হয় মায়ের অংশ থেকে এবং এগুলো হয় লাল।'[২৬] আধুনিক জীনতত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষের প্রত্যেকটি কোষ কেমন হবে সেই তথ্য কোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমে জিনের মধ্যে থাকে। এরপর জিনের প্রকটতা ও প্রচ্ছন্নতা অনুযায়ী একটি কোষ পিতা অথবা মাতার আকৃতি পায় এবং অনেকগুলো কোষ মিলেই একটি অঙ্গ তৈরি হয়।[২৭] সুতরাং, সবসময়ই যে একটি অঙ্গ পিতার মতো আর অন্য অঙ্গটি মাতার মতো হবে, এই ধারণা ভুল। সুতরাং আমাদের মাঝে আলোচনাতে একটি জিনিস স্পষ্ট হবার কথা যে, কুরআনের আগে যত গ্রন্থেই জ্রণবিদ্যার ব্যাপারে তথ্য আছে, সবগুলো বইতেই এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে সন্তান তৈরি হয় পুরুষের বীর্য এবং নারীদের মেন্সট্রুয়াল ব্লাডের মিশ্রণে। কিন্তু মূলত সন্তান তৈরি হয় পুরুষের শুক্রাণু ও নারীদের ডিম্বাণুর মিশ্রণে। এছাড়াও অন্যান্য ভুলত্রুটি তো আছেই। কিন্তু কুরআন জ্রণবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের সঠিক তথ্য দেয়। পবিত্র কুর'আনে সূরা মু'মিনুনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নুতফাহকে বা শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে জরায়ুতে স্থাপন করেন। তারপরে একে অর্থাৎ

জাইগোটকে একটি আলাকাহতে বা জোঁকের মতো বস্তুতে পরিণত করেন। তারপর এই আলাকাহকে মুদগাহতে বা চর্বিত মাংসপিন্ডে পরিণত করেন। এরপর এই মুদগাহ থেকে হাড় তৈরি করেন এবং অতঃপর এই হাড়কে মাংস দিয়ে আবৃত করে দেন। অতঃপর তাকে নতুন এক সৃষ্টিরূপে বের করে আনেন। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।' আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা অনুযায়ী কুর'আনে বর্ণিত এই পর্যায়গুলোর সবগুলোই সঠিক।"[২৮]

সামিরার প্রফুল্ল বদনটি আর অবশিষ্ট নেই। মুখ কালো করে বসে আছে। একটু থেমে তাই ফাতিমা আবার বলা শুরু করলো, "তাহলে দেখা যাচ্ছে কুরআনের পূর্ববর্তী সমস্ত জ্ঞানেই ত্রুটি ছিলো। কিন্তু কুরআনই ভ্রূণবিদ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো ভুল করেনি। প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা থেকে কুরআনের ধারণা উন্নত এবং গ্রহণযোগ্য। তাহলে কুরআন যদি তাদের থেকে নকলই করবে, তাহলে শুধু তাদের সঠিকগুলোই নিলো, কিন্তু ভুল কথাগুলো কুর'আনে আসলো না – এই ব্যাপারটি কি আশ্চর্যের নয়? তাহলে মুহাম্মাদকে ﷺ এই জ্ঞান কে দিলো, যেই জ্ঞান তখন কারোরই জানা ছিলো না! সুতরাং, এতেই প্রমাণিত হয় কুরআনের ভ্রূণবিদ্যা গ্রীকদের বা অন্যান্যদের থেকে নকলকৃত নয়। বরং এই বিষয়ে আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা, মুহাম্মাদকে ﷺ জানিয়েছেন ও তাঁর মাধ্যমে আমরা জেনেছি। এ কারণে কুরআন যে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত মুহাম্মাদের ﷺ উপর নাযিলকৃত একমাত্র সত্য গ্রন্থ এবং মুহাম্মাদ ﷺ যে সত্য নবী তাতেও কোনো সন্দেহ থাকে না।"

সামিরা মিথ্যাচারের জবাব পেয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে থাকলো। পরাজয়ের ছাপ যেন তার চেহারায় ফুটে উঠেছে! তখন ফাতিমা বললো, "দেখেছিস সামিরা, তোর মুক্তচর্চা কতটুকু নড়বড়ে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিলো! মুখের ফুঁৎকারেই সব উড়ে গেলো! তুই মুক্তচিন্তা কর, তাতে আমার সমস্যা নেই। একেকজনের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থাকতেই পারে, আমি সেটাকে সম্মান করি। কিন্তু তাই বলে এই না যে, একটি ধর্মের ব্যাপারে কিছু অপপ্রচারকারীদের বক্তব্য শুনেই লাফালাফি শুরু করবি! কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে উভয়পক্ষের প্রমাণ দেখা লাগে। যদি প্রমাণ বোঝার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে যে ওই বিষয়ে অভিজ্ঞ, তার কাছে গিয়ে জানতে হবে। তারপর তুই সিদ্ধান্ত নিবি যে, কে ঠিক আর কে ভুল। ঠিকাছে?"

সামিরা চুপ করে কতক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর বললো, "তুই কি বিশ্বাস করিস মোহাম্মদ যেসব কথা বলেছে, তার সবই যৌক্তিক?"

ফাতিমা বললো, "হ্যাঁ, তা-ই বিশ্বাস করি। সেসব কথা নাহয় আরেকদিন হবে। আজকের বিষয়ে তো পরাজয় মেনে নিলি? কী? তাই তো?"

ঘরে পিনপতন নীরবতা! আসলে সামিরা তার পরাজয় মেনে নিতে পারছে না। আজ পর্যন্ত সব বান্ধবীকেই সে এই বিষয়ে কথা বলে নাকানি-চুবানি দিয়েছে! কিন্তু ফাতিমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে এসে সামিরা তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। এই সময়ে নাবিলা বললো,

"ভাবী, আপু মনে হয় লজ্জা পাচ্ছে। ঠিকাছে আপু, আপনার স্বীকার করা লাগবে না। ভাবী, তোমার কথা শুনে আমার একটি আয়াতের কথা মনে পড়লো। গতকাল আয়াতটি পড়েছি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মধ্যে বলেন, 'তারা মুখের ফুঁৎকারেই আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করে দিতে চান; যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে।' [২৯] ঘটনাগুলোর সাথে আয়াতের খুব মিল, তাই না?"

ফাতিমা মাথা নেড়ে সম্মতি দিলো। সেই চৌদ্দশ বছর আগে আরবের মরুভূমিতেও এমনই কিছু লোকের উদ্ভট সব মিথ্যাচারের পরিপেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিলো এই আয়াত। আজও কি তাদের দৌরাত্ম্য কোনো অংশে কমেছে? না, কমেনি। বরং তা বেড়েছে। শুরু হয়েছে নতুন ধারায়। নতুন সব কৌশলে।

[কুর'আনে ভ্রূণবিদ্যা নিয়ে লেখার পরে কয়েকজন এই অভিযোগ করে যে, এই ভ্রূণবিদ্যা নাকি গ্রীকদের থেকে নকলকৃত। তাই তাদের অভিযোগ খণ্ডন করে লেখাটি লেখা। লেখাতে যা কিছু ভুল তা আমার এবং শয়তানের পক্ষ হতে এবং যা কিছু কল্যাণ, তার সবটুকুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

♦ [১] মিথ্যা অপবাদের লিংক: https://istishon.com/?q=node/18702

♦ [২] বইটির ডাউনলোড লিংক: http://islamicpdfbd.com/usdul-ghabah-fi-marfat-e-sahabah-pdf-download/

♦ [৩] *উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা* (আলি ইবনুল আসির রহঃ); খন্ডঃ১; পৃষ্ঠাঃ ৪৬৯(১৯৯৩)

♦ [৪] আল-ইসবাহ ফি তামিয়্যিজ আল-সাহাবা (ইবনে হাজার আসকালানি রহঃ); খন্ড: ১; পৃষ্ঠা: ৪-৫

♦ [৫] The Islamic World, from Classical to Modern Times; Development of the Biography of al-Harith ibn Kalada and the Relationship between Medicine and Islam; Page 127-137

♦ [৬] *উসুদ আল-গবাহ ফি মা'রিফাত আস-সাহাবা* (আলি ইবনে আল আসির রহঃ); খন্ড: ১; পৃষ্ঠা: ৪৬৯ (প্রকাশকাল: ১৯৯৩)

♦ [৭] *আল-ইসবাহ ফি তামিয়্যিজ আল-সাহাবা:* http://books.nafseislam.com/read-book.php?book_id=938 &book=al-asaba-fe-tameez-is-sahaba-22%---muqadma22%-

♦ [৮] Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba (Makhtabat al-Hadith ash-Sharif) by Ibn Hajar al-Asqalani (RH)

♦ *আল-ইসবাহ ফি তামিয়্যিজ আল-সাহাবাঃ* ইবনে হাজার আসকালানি (আল- মাকতাবাতুল ইলমিয়া বাইরুত থেকে প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ- ১৯৯৫); খন্ড: ০১; পৃষ্ঠা: ৬৮৭

♦ [৯] *The beginning of western Science* by David C. Lindberg; Chapter: 08; page: 160

♦ E-link: https://www.academia.edu/8977007/THE_BEGINNING_OF_WESTERN_EDUCATION

♦ [১০] *The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History Of Humanity* (1997); Page no: 94

♦ [১১] *A history Of medicine By Plinio Prioreschi*; Page: 364

♦ E-link: https://books.google.com.bd/books?id=q0IIpnov0BsC&pg=PA364 &lpg=PA364&dq=#v=onepage&q&f=false

♦ [১২] Opinion Of: Ibn kathir; Al-Baghawi; Al-Qurtubi

♦ *Tafsir Ibn Kathir* (Islamic Foundation, Bangladesh); Volume: 01; Page no: 29.30 (march2014-)

♦ [১৩] *ফাতহুল বারী:* ইবনে হাজার আসকালানি; ৮ম খণ্ড; পৃষ্ঠা: ৪৫

♦ [১৪] *উসুদ আল-গবাহ ফি মা'রিফাত আস-সাহাবা* (আলি ইবনে আল আসির রহঃ); খন্ড: ১; পৃষ্ঠা: ৪৬৯ (১৯৯৩)

♦ সীরাহ: *আর-রাহীকুল মাখতুম:* শফিউর রহমান মোবারকপুরী (আল-কুরআন একাডেমী পাবলিকেশন); অধ্যায়: হুনাইনের যুদ্ধ; পরিচ্ছেদ তায়েফ যুদ্ধ; পৃষ্ঠা: ৪৫২-৪৫৪

♦ [১৫] http://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/garbha.html?lang=sa

♦ ইংরেজি অনুবাদ:

♦ 1st part: The Developing Human, Clinically Oriented Embryology By Dr. Keith L. Moore (10th edition); Chapter: 01; Ancient Views of Human Embryology; page: 04.

♦ 2nd part: Dr. A. G. Krishna Warrier; Published by: The Theosophical Publishing House, Chennai

♦ E-Link:http://bharatkalyan97.blogspot.com/04/2014/a-framework-for-defining-consciousness.html

♦ [১৬] কেউ চাইলে এখান থেকে শব্দগুলো অনুবাদ করে দেখতে পারেন: http://spokensanskrit.de/index.php?script=DI&beginning=+0&tinput

♦ [১৭] *The Developing Human, Clinically Oriented Embryology* By Dr. Keith L. Moore (10th edition); Chapter: 14, skeletal system development (Development of neurocranium); page: 345

♦ [১৮] https://en.wikipedia.org/wiki/Preterm_birth#cite_note-Guinness148-2007

♦ http://worldjournals.org/articles/James_Elgin_Gill

♦ (Read: Notable Cases)

♦ [১৯] http://www.cpmc.org/services/pregnancy/information/fetal_development.html

♦ [২০] www.ece.lsu.edu/kak/GarbhaUpanishad.pdf

♦ [২১] http://www.news-medical.net/health/Hermaphroditism-(Intersex).aspx

♦ http://www.babymed.com/monozygotic-monoamniotic-monochorionic-mono-mono-dizygotic-dichorionic-twins

♦ http://www.nature.com/nrg/journal/v4/n11/full/nrg1202.html?foxtrotcallback=true

♦ [২২] *Hippocrate's* Section 8, Page- 321 & Page- 326

♦ [২৩] *Textbook of medical physiology by Guyton and Hall;* Chapter: Pregnancy and lactation; Topic: Human Chorionic Gonadotropin and Its Effect to Cause Persistence of the Corpus Luteum and to Prevent Menstruation and Function of Human Chorionic Gonadotropin.

♦ [২৪] Aristotle, *De Generatione Animalium,* Book II, *The Complete Works of Aristotle,* Volume: 01, page: 1148(Princeton, 1985; Interpreted by Prof. Dr. Keith Moore).

♦ [২৫] *Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine* (Galen: On Semen); Greek text with English trans. Phillip de Lacy, Akademic Verlag, 1992; section I:10-9:1; Page: 101 ,92-95

♦ [২৬] *Talmud* by Great Physician Samuel ha-Yehudi (Information collected from 'the Developing Human by Keith L. Moore; Topic: Ancient Views of Human Embryology, page- 05)

♦ [২৭] *Concepts Of Genetics* by Robert J. Brooker; Chapter: 2, Patterns of inheritance

♦ [২৮] তিন নং গল্প দ্রষ্টব্য: কুরআন কি ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়?

♦ [২৯] সূরা সাফ (৬১); আয়াত: ০৮

রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ভ্রূণের লিঙ্গ পার্থক্যকরণের সময় সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন?

আদনান ও ফাতিমার আজ ফুফু বাড়িতে বেড়াতে যাবার কথা। অনেকদিন ধরে ফুফু তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যাবার কথা বললেও ফাতিমা কখনো যেতে রাজি হতো না। এর কারণ ছিলো আদনানের সংশয়। এগনোস্টিক আদনানকে নিয়ে সে কোথাও যেতে ইচ্ছুক ছিলো না। কিন্তু এখন তো আর সেই সমস্যা নেই। আদনানের সংশয়ও কেটে গিয়েছে, নিয়মিত সালাতও আদায় করে, আবার সে কুরআনের ভাষা শেখাও শুরু করেছে। দু'জন একে অপরের দ্বীন পরিপূর্ণ করছে। ঘড়িতে দুপুর দুইটা বাজে। এখন তো ফুফুর বাসায় যেতে হবে! তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। কিন্তু আকাশ তো কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিও হচ্ছে। ওদিকে আদনানের ড্রাইভারও নেই। মায়ের অসুস্থতার কারণে ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছে। তাই গাড়ি নিয়েও যাওয়া যাচ্ছে না। আবার ফুফু বারবার ফোনও দিচ্ছেন তাড়াতাড়ি যাবার জন্য। কিন্তু কী আর করার? অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই!

কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে গেলো। তাই এই সুযোগে আদনান ও ফাতিমা ফুফু বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। ঘড়িতে যখন দুইটা বেজে আটচল্লিশ মিনিট, ঠিক তখন আদনান ও ফাতিমা ফুফু বাড়ি গিয়ে পৌঁছালো। আদনানের ফুফু আদনানকে দেখে খুবই খুশি। কিন্তু ফাতিমাকে তিনি তেমন একটা গুরুত্ব দিলেন না। বিয়ের

পরে আদনান ও ফাতিমা ফুফুর বাসায় একসাথে কখনো আসেনি। সেই সূত্রে রাগ করে আছেন ভেবেই ফাতিমা নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলো।

আদনানের ফুফু সেই ৩০ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। বর্তমানে ভার্সিটির শিক্ষিকা। তবে তিনি আবার নাকি বিজ্ঞানমনস্ক লোক! মুক্তচর্চা করতে পছন্দ করেন! তাঁর নাম জেবুন্নেসা হওয়ায় সবাই তাঁকে জেবু ম্যাম বলেই ডাকে। কারণ এলাকায় অনেকেই তাঁর ছাত্র অথবা ছাত্রী। আর আদনানের ফুফুর স্বভাবই হলো, কাউকে পেলেই জ্ঞান বিতরণ শুরু করা। আদনানের কাছ থেকে তার ফুফু সম্পর্কে এতটুকুই শুনেছে ফাতিমা।

দুপুরের খাওয়া শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে জেবু ম্যাম আদনানের কাছে গিয়ে বসলেন। বললেন, "বাবা, তোকে একটি জিনিস জানাতে চাই জিনতত্ত্বের ব্যাপারে। বিষয়টি বুঝলে তুই আরো ভালোভাবে মুক্তচিন্তা করতে পারবি।"

ফাতিমা এই কথা শুনেই বুঝতে পারলো যে, আদনানের পূর্বের অবস্থার পিছনে তার এই ফুফুরই মূলত হাত রয়েছে। তবুও ফাতিমা কিছু বললো না এই ভেবে যে, ফুফু কী বলেন সেটা শোনার আগে কিছু বলা সমীচীন হবে না।

বিভিন্ন কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে জেবু ম্যাম বললেন, "শোন বাবা, একটি সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে সেটা সম্পূর্ণই নির্ভর করে একজন পুরুষের উপর এবং কীভাবে নির্ভর করে, সেটা বলছি। মানুষের দেহে দুই ধরনের কোষ থাকে। একটি হলো দেহকোষ এবং অপরটি হলো জননকোষ। দেহকোষে মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয়। মাইটোসিস কোষ বিভাজনে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। আর জননকোষে মায়োসিস কোষ বিভাজন হয়। এই মায়োসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে গ্যামেট, মানে শুক্রাণু আর ডিম্বাণু তৈরি হয়। এই কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পায়। এই, শুনছিস তো নাকি?"

আদনান উত্তর দিল, "হুম। শুনছি তো। তুমি বলে যাও।"

আদনানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জেবু ম্যাম বললেন, "প্রতিটি প্রকৃত কোষের ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসের ভিতরে ক্রোমোজোম নামের

একটি পদার্থ থাকে, যেটি জীবের বৈশিষ্ট্য বংশপরাম্পরায় সঞ্চালিত করে। তুই কোনো পিতামাতার সন্তানদের দিকে লক্ষ করলে দেখবি যে, তাদের মধ্যে পিতার অথবা মাতার বা উভয়ের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে তাদের মধ্যে খুব বেশি মিল পাওয়া যায়। মনে কর, একটি ছেলের চোখ ও নাক হয়েছে তার মায়ের মতো। আবার, ছেলের চেহারা ও উচ্চতা হয়েছে তার বাবার মতো। এসব বৈশিষ্ট্য পিতা-মাতা থেকে সন্তানে বহন করার কাজ করে এই ক্রোমোজোম।"

জেবু ম্যামকে থামিয়ে দিয়ে আদনান বললো, "আমি তো এসব জানি, ফুফু! এগুলো কি এখন বলার সময়?"

বিরক্তির সুরে জেবু ম্যাম উত্তর দিলেন, "আহা! কেন বলছি সেটা একটু পরে বুঝবি। এখন শুধু শুনে যা। তো যা বলছিলাম সেটা হলো, কোষে এই ক্রোমোজোম সংখ্যা গণনা করা যায়। গণনা করে দেখা গেছে মানুষের একটি কোষের নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম আছে। তার মধ্যে ২২ জোড়া বা ৪৪টি ক্রোমোজোমকে বলে অটোজোম এবং ১ জোড়া বা ২টি ক্রোমোজোমকে বলে সেক্স ক্রোমোজোম। এই ২ জোড়াকে সেক্স ক্রোমোজোম বলার কারণ হলো এই দু'টি ক্রোমোজোমই সন্তানের সেক্স বা লিঙ্গ নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা এই দু'টি ক্রোমোজোমের উপর নির্ভর করবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই দু'টি ক্রোমোজোমকে 'XY' এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এই দু'টি ক্রোমোজোমকে 'XX' দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই 'Y' ক্রোমোজোমের কারণে ছেলে সন্তান হয়। যেহেতু এই 'Y' ক্রোমোজোম শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়, সেহেতু সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে এই বিষয়ে শুধুমাত্র পুরুষেরাই দায়ী।"

এ কথা বলে জেবু ম্যাম বিছানায় তাঁর পাশে থাকা মোবাইল বের করে একটি ছবি বের করে আদনানকে বললেন, "এই ছবিটি দ্যাখ, তাহলে কন্সেপ্ট আরো ক্লিয়ার হবে। এখানে ক্রোমোজোমের ক্রমবিন্যাস বা ক্যারিওটাইপ দেখানো হয়েছে।"
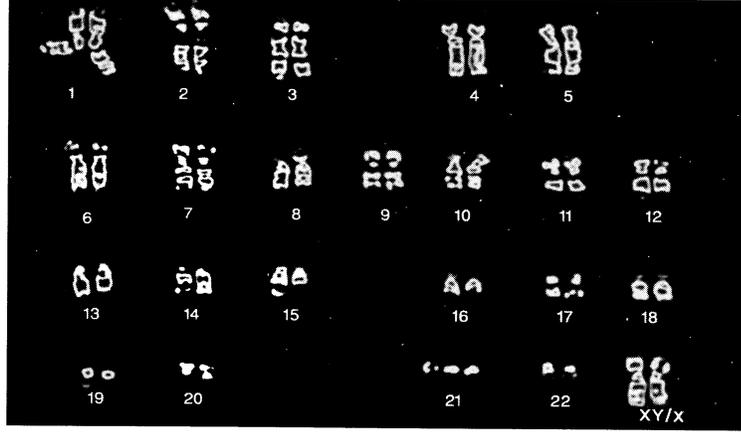
রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের ২১৫ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

আদনান বললো, "ওয়াও! দেখতে তো খুব সুন্দর লাগছে। কিন্তু এতে তোমার কী সমস্যা? তুমি কি বলতে চাও যে, আমাদের সমাজে সন্তান মেয়ে হবার কারণে নারীদের দোষী করা হয়, এটা যেন কেউ না করে, আর সেজন্য সবাইকে আমি সচেতন করবো, তাই তো?"

জেবু ম্যাম বললেন, "আরে না! না! এতক্ষণ তো কিছুই হয়নি। তবে এখন হবে! শোন তাহলে। একটি সন্তানের সেক্স ক্রোমোজোম 'XY' হবে নাকি 'XX' হবে, তা নির্ধারিত হয় নিষেকের সময়। পুরুষের শুক্রাণু ও নারীদের ডিম্বাণু মিলে জাইগোট তৈরি করে। এই জাইগোটে 'XY' ক্রোমোজোম থাকলে একটি ভ্রূণ ছেলের মতো করে বৃদ্ধি পায় এবং 'XX' থাকলে ভ্রূণ মেয়ের মতো করে বৃদ্ধি পায়। তাই সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে তা নিষেকের সময়ই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু মোহাম্মদ কী বলেছে জানিস?"

আদনান জিজ্ঞাসা করলো, "কী বলেছেন?"

জেবু ম্যাম বললেন, "মোহাম্মদ বলেছে যে সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে এটা নাকি আল্লার নির্দেশে হয়। এতটুকু বললেও মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু সে বলেছে, সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে এটা নাকি ভ্রূণের উপর বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হবার পরে নির্ধারিত হয়!"

আদনান বললো, "ফুফু, তুমি এটা কোথায় পেয়েছো?

জেবু ম্যাম মোবাইলে অ্যাপ ওপেন করলেন। অ্যাপ থেকে একটি হাদিস বের করে আদনানের সামনে দিয়ে বললেন, "এই দ্যাখ! মুসলিম শরীফে আছে। আমি পড়ে শোনাচ্ছি। তুই শোন।"

আদনান বললো, "আচ্ছা, পড়ো।"

এবার জেবু ম্যাম বললেন, "আদনান, ভালো করে শোন কী বলেছে। মোহাম্মদ বলেছে, 'যখন মাতৃগর্ভে নুতফার অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর উপর বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন আল্লা তালা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি নুতফাকে একটি রূপ দান করেন, তার কান, চোখ, চামড়া, মাংস ও হাড় তৈরি করে দেন। তারপর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে বলে, হে আমার রব! সে কি ছেলে হবে নাকি মেয়ে? তখন তোমার প্রভু যা চান সিদ্ধান্ত দেন এবং ফেরেশতারা আদেশ অনুসারে সেটা লিখে ফেলে।' [১] সুতরাং, মোহাম্মদের এই কথা থেকে বোঝা যায় যে, সে জানতো না নিষেকের সময় সন্তানের সেক্স বা লিঙ্গ নির্ধারিত হয়! অতএব, সে একজন ভণ্ড ও মিথ্যা নবী! হা হা হা। এখন বুঝেছিস এতকিছু তোকে কেন বললাম?"

আদনান দেখে বললো, "তাই তো! কিন্তু ফুফু একটা বিষয় তোমাকে বুঝতে হবে যে, যদি বিজ্ঞানের কোনো ঘটনা কুরআন ও সহিহ হাদিসের বিপরীতে যায়, তাহলে সেখানে দুইটি সম্ভাবনা থাকে। প্রথমত, তুমি কুরআন বা হাদিসের অর্থ না বুঝতে পারো অথবা সেই বিষয়ে তোমার পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকতে পারে। আরেকটি হলো, বিজ্ঞান এখনো সেটা সঠিকভাবে আবিষ্কার করতে পারেনি।"

এটুকু বলে ফাতিমার দিকে তাকিয়ে আদনান বললো, "আচ্ছা ফাতিমা, এই ব্যাপারে তোমার কাছে কি কোনো উত্তর আছে?"

আদনানের উত্তর শুনে জেবু ম্যাম বললেন, "এটা তুই কেমন কথা বললি, বাবা! তুই তো এমন ছিলি না! আর এই বিষয়ে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা তো একদম পানির মতো পরিষ্কার। এতে তো আর আবিষ্কারের কিছু নেই।"

ফাতিমা ম্যাডামের বিকৃত মুক্তচিন্তা চর্চা দেখে আর চুপ থাকতে পারলো না। ফাতিমা মৃদু স্বরে ফুফুকে জিজ্ঞাসা করলো, "ম্যাম, আপনি কি কখনো 'কুয়োর ব্যাঙ' এর গল্প শুনেছেন?"

জেবু ম্যাম উত্তর দিলেন, "গল্প করতে এখানে এসে বসিনি। তুমি কথা ঘুরাচ্ছো কেন?"

"ম্যাম বলেন, প্লিজ। আপনি নাকি খুব সুন্দর গল্প বলেন। সবার কাছে আপনার গল্পের সুনাম শুনেছি। থাক না ওসব কথা আজ।" বলে জোর করতে লাগলো ফাতিমা।

নিজের সুনাম শুনে জেবু ম্যাম খুশিতেই বলা শুরু করলেন, "একবার এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমুদ্রের কাছে থাকা কুয়ার মধ্যে সমুদ্রের পানিসহ ব্যাঙ ঢুকে পড়েছিলো। দুর্যোগ কমে যাবার পরে কুয়োর ব্যাঙ দেখলো তার রাজত্বে আরেক ব্যাঙ, যাকে সে চেনে না। তখন কুয়োর ব্যাঙ সমুদ্রের ব্যাঙকে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো,

-'তুমি আবার কোন জলাশয়ের?'

-'আমি সমুদ্রের।'

-'সেটা আবার কী জিনিস?'

-'সমুদ্র এমন জিনিস যে, সেখানে এখান থেকে অনেক বেশি পানি আছে।'

-'কত পানি? এ-এত?'

-'আরে না! সমুদ্র অনেক বড়!'

-'তাহলে এ-এ-ত।'

-'আরে না! আরো বড়!'

-'তাহলে এ-এ-এ-এত? এই জলাশয়ের, মানে কুয়ার সমান?'

-'আরে না! না! এর থেকে অনেএ-এ-এ-এ-এ-ক বড়।'

অবশেষে সেই কুয়োর ব্যাঙকে বুঝানোই গেলো না সমুদ্র কত বড়! বুঝবেই বা কী করে? সে তো কোনোদিন কুয়ার বাইরেই যায়নি! তাই কুয়ার পানি থেকে অধিক পানি কোথাও যে থাকতে পারে, সেটা সে বিশ্বাসই করে না!"

কিন্তু গল্প শেষ করেই জেবু ম্যামের চেহারার ভঙ্গি পাল্টে রাগ ফুটে উঠলো। বললেন, "কিন্তু এই গল্পের প্রসঙ্গ তুলে তুমি কী বোঝাতে চাও, সেটা পরিষ্কার করে বলো!"

ফাতিমা বললো, "স্যরি, ফুফুমনি। আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি। তাই একটু মজা করছিলাম। দয়া করে রাগবেন না। আচ্ছা ফুফুমনি, শাহারিয়ার আর প্রাচী কোথায়? ওদের দেখছি না যে!"

জেবু ম্যাম উত্তর দিলেন, "ওরা তো পড়াশোনার জন্য নিজ নিজ হোস্টেলে থাকে। বাসায় খুব কমই আসার সুযোগ পায়! তোমাকে একটি কথা বলে রাখি। আদনান আমাকে ফুফু ডাকে ঠিক আছে। কিন্তু তুমি আমাকে ন্যাকামো করে ফুফুমনি ডাকবে না! আমাকে ম্যাম বলেই ডাকবে। ঠিকাছে?"

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা, ঠিকাছে। তাহলে ম্যাম, আমার একটি জিজ্ঞাসা ছিলো। সেটি হলো, শাহারিয়ার যে ছেলে আর প্রাচী যে মেয়ে, এটা আপনি কীভাবে বুঝলেন?"

ভার্সিটির শিক্ষিকা হবার কারণে এই প্রশ্ন তাঁর কাছে তেমন বিদঘুটে লাগেনি। জেবু ম্যাম স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলেন, "বোকা মেয়ে! এটা কীভাবে বোঝে তুমি জানো না? ছোটবেলায় তাদের লিঙ্গ দেখে আর বড় হলে সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারগুলো দেখে বুঝেছি।"

ফাতিমা বললো, "কেন, ম্যাম? আপনি তাদের জেনেটিক সেক্স XX নাকি XY, সেটা কেন পরীক্ষা করে দেখলেন না?"

জেবু ম্যাম হেসে দিয়ে উত্তর দিলেন, "এই সাধারণ বিষয়ে কেউ কি এত ঝামেলা করে? আর সব জায়গায় তো এগুলো করাও হয় না। বাংলাদেশের ১% মানুষেরও জেনেটিক সেক্স নির্ধারণ করা নেই। আর এভাবে ছেলে-মেয়ে নির্ধারণ করতে বললে তো মানুষ আমায় পাগল বলবে!"

ফাতিমা বললো, "না! না! ম্যাম। আপনি কিন্তু এখানে একটা ভুল করেছেন। কারণ কিছু ক্ষেত্রে সন্তানের লিঙ্গ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছেলেদের মতো হলেও তার জেনেটিক সেক্স হয় 'XX' অর্থাৎ, মেয়েদের মতো! এই সমস্যা হয়

অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লাশিয়া হলে। আবার কিছু সময় সন্তানের লিঙ্গ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য মেয়েদের মতো হলেও তার জেনেটিক সেক্স হয় 'XY' অর্থাৎ, ছেলেদের মতো! এই সমস্যা হয় টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশান হলে। এগুলোকে 'সিউডো হারমাফ্রোডিটিজম' বলা হয়।[২] তাহলে ম্যাম, আপনি যা ভেবেছেন সেটা তো না-ও হতে পারে! একসময় জেনেটিক সেক্স পরীক্ষা করার পরে দেখা গেলো শাহারিয়ার মেয়ে, মানে XX আর প্রাচী XY অর্থাৎ, ছেলে।"

এই বলে ফাতিমা খিলখিল করে হেসে উঠলো। জেবু ম্যাম ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "অ্যাঁ! উম! ফাতিমা, তুমি ব্যাপারগুলো এত জটিল করছো কেন? সাধারণভাবে দেখলেই তো হয়। এত ঝামেলা করার তো দরকার নেই।"

আদনান মাঝখান থেকে বলে উঠলো, "তাহলে ফুফু, তুমি একটি সাধারণ হাদিসকে এত জটিল করছো কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ নাহয় একটি সাধারণ বিষয় আল্লাহর কাছ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে সাহাবাদের বলেছেন। ওই সময়ের মানুষ তো এসব ক্রোমোজোম, জিন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বুঝতোই না। তাই তাদের এসব বিষয় বুঝানোর কোনো দরকারই আল্লাহর রাসূলের ﷺ ছিলো না। উনি হয়তো এই হাদিস দিয়ে অন্য কিছু বুঝিয়েছেন।"

জেবু ম্যাম রেগে গিয়ে বললেন, "তুই কি তাহলে বলতে চাচ্ছিস যে, সন্তান ছেলে কি মেয়ে হবে এটা বিয়াল্লিশ দিন পরেই আল্লার অনুমতি পাবার কারণে আলাদা হয়?"

আদনান বললো, "সেটা আমি জানি না। তবে আমি এটা বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব কথা বলেছেন সেগুলো সবই ঠিক। আমি সেগুলো কোনো প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নিয়েছি।"

জেবু ম্যাম বিস্ময়ের সাথে বললেন, "কী? তুই কোনো প্রমাণ ছাড়াই এগুলো মেনে নিবি? এভাবে তো ধর্মান্ধরা বিশ্বাস করে! তুইও কি সেই দলে যোগ দিলি? এই দেশ কি এমন মুক্তমনা চেয়েছিলো? এই ধর্মান্ধরা...।"

জেবু ম্যামকে ভদ্রতার সাথে থামিয়ে দিয়ে ফাতিমা বললো, "ম্যাম, ধর্ম আর বিজ্ঞান দু'টি তো দুই মেরুর জিনিস। বিজ্ঞান এমন একটি শাখা যেখানে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে শারীরিক ও প্রাকৃতিক জগতের গঠন এবং আচরণের

পদ্ধতিগত, বুদ্ধিগত ও বাস্তব কার্যকলাপ সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। এখানে যা প্রমাণ করা যায়, সেটাই বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস হলো আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যা কিছু জানিয়েছেন সেগুলো প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নেওয়া। যেমন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মধ্যে বলেছেন, 'যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে; এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বোপরি, তারা পরকালের উপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।'[৩] আর, বিজ্ঞান তো কয়েকবছর আগেও গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেনি। তাই বলে কি পূর্বের এত বছর এই তরঙ্গ ছিলো না? অবশ্যই ছিলো। তাহলে বিজ্ঞান দিয়ে আপনি কীভাবে সব কিছু বিচার করবেন? এটাতো ম্যাম বোকামি! তারপরেও আপনি যখন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চাইছেন, আমি প্রমাণ দিচ্ছি।"

"কী প্রমাণ দিবে তুমি? তাহলে আমার কথা কি ভুল?" জেবু ম্যাম জিজ্ঞসা করলেন।

ফাতিমা বললো, "সাধারণত মানুষের প্রজননতন্ত্র দেখেই বোঝা যায় যে, সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে। মানুষের প্রজননতন্ত্র মূলত তিনটি জিনিস নিয়ে গঠিত। প্রথমত, গোনাড বা শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয়। তারপরে, জেনিটাল ডাক্ট যা পরবর্তীতে মেসোনেফ্রিক ও প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্টে রূপান্তরিত হয়। এবং সবশেষে, এক্সটারনাল জেলিটালিয়া বা, বাহ্যিক যৌন অঙ্গ। এগুলোর সাহায্যে কারো জেন্ডার নির্ণয় করা না গেলে তখন হরমোন এবং সাইকোলজিক্যালি জেন্ডার নির্ণয় করা হয়। মানুষের ভ্রূণে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রজননতন্ত্রের এই প্রধান অংশগুলির কোনো অংশই পার্থক্য করা যায় না। অর্থাৎ, এই অবস্থায় ছেলে বা মেয়ের জননতন্ত্রের অংশগুলো একই থাকে। এই অবস্থাকে বলে ইন-ডিফ্রেন্ট স্টেজ।[৪] আবার ভ্রূণবিদ্যা থেকে এটাও জানা যায় যে, ৬ সপ্তাহের আগে অর্থাৎ, বিয়াল্লিশ দিনের আগে সাধারণভাবে ভ্রূণটি ছেলে নাকি মেয়ে সেটা আলাদা করা অসম্ভব।"[৫]

তারপর ফাতিমা ব্যাগ থেকে দ্রুত মোবাইলটি বের করে ইন্টারনেট থেকে একটি ছবি ওপেন করে বললো, "ম্যাম দেখেন, আমার মোবাইলের দিকে তাকিয়ে ছবিটি দেখেন। তাহলে সহজেই ব্যাপারটি বুঝতে পারবেন। এখানে, প্রজননতন্ত্রের অবিভক্ত অবস্থা উপরে এবং বিভক্ত অবস্থা নিচে দেখানো হয়েছে।"

রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের ২১৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

ম্যাম মোবাইলের দিকে তাকালেন। তখন ফাতিমা বলা শুরু করলো, "এখানে উপরের যে ছবিটি আছে, সেটা হলো প্রজননতন্ত্রের সেক্সুয়ালি ইন-ডিফ্রেন্ট স্টেজ। অর্থাৎ, এই সময়ে এটা ছেলে কি মেয়ে সেটা বোঝা যায় না। এটা বিয়াল্লিশ দিনের আগের অবস্থা। কিন্তু নিচের ছবিতে বাম দিকের ছবিটি ছেলেদের প্রজননতন্ত্রের। এবং ডানদিকের ছবিটি মেয়েদের প্রজননতন্ত্রের। এটা বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হবার পরের কোনো সময়ের অবস্থা। বুঝেছেন, ম্যাম?"

মুখ কালো করে জেবু ম্যাম উত্তর দিলেন, "হুম! দেখলাম। কিন্তু তাহলে ছেলে এবং মেয়ের প্রজননতন্ত্র আলাদা কখন এবং কীভাবে হয়?"

ফাতিমা হালকা করে গলা ঝেড়ে তারপর বলা শুরু করলো, "হ্যাঁ ম্যাম, বলছি। ভ্রূণের বয়স যখন ৬ থেকে ৭ সপ্তাহ, অর্থাৎ ৪২ থেকে ৪৯ দিন, তখন ভ্রূণের ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে যদি 'Y' ক্রোমোজোম থাকে, তাহলে সেই 'Y' ক্রোমোজোমে অবস্থিত 'SRY' Gene নামক একটি জিন সক্রিয় হয়।[৬] তখন 'SRY' জিনটি 'SOX' নামক আরেকটি জিন সক্রিয় করে যেটি আবার 'SF1'

তারপর ফাতিমা ব্যাগ থেকে দ্রুত মোবাইলটি বের করে ইন্টারনেট থেকে একটি ছবি ওপেন করে বললো, "ম্যাম দেখেন, আমার মোবাইলের দিকে তাকিয়ে ছবিটি দেখেন। তাহলে সহজেই ব্যাপারটি বুঝতে পারবেন। এখানে, প্রজননতন্ত্রের অবিভক্ত অবস্থা উপরে এবং বিভক্ত অবস্থা নিচে দেখানো হয়েছে।"

রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের ২১৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

ম্যাম মোবাইলের দিকে তাকালেন। তখন ফাতিমা বলা শুরু করলো, "এখানে উপরের যে ছবিটি আছে, সেটা হলো প্রজননতন্ত্রের সেক্সুয়ালি ইন-ডিফ্রেন্ট স্টেজ। অর্থাৎ, এই সময়ে এটা ছেলে কি মেয়ে সেটা বোঝা যায় না। এটা বিয়াল্লিশ দিনের আগের অবস্থা। কিন্তু নিচের ছবিতে বাম দিকের ছবিটি ছেলেদের প্রজননতন্ত্রের। এবং ডানদিকের ছবিটি মেয়েদের প্রজননতন্ত্রের। এটা বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হবার পরের কোনো সময়ের অবস্থা। বুঝেছেন, ম্যাম?"

মুখ কালো করে জেবু ম্যাম উত্তর দিলেন, "হুম! দেখলাম। কিন্তু তাহলে ছেলে এবং মেয়ের প্রজননতন্ত্র আলাদা কখন এবং কীভাবে হয়?"

ফাতিমা হালকা করে গলা ঝেড়ে তারপর বলা শুরু করলো, "হ্যাঁ ম্যাম, বলছি। ভ্রূণের বয়স যখন ৬ থেকে ৭ সপ্তাহ, অর্থাৎ ৪২ থেকে ৪৯ দিন, তখন ভ্রূণের ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে যদি 'Y' ক্রোমোজোম থাকে, তাহলে সেই 'Y' ক্রোমোজোমে অবস্থিত 'SRY' Gené নামক একটি জিন সক্রিয় হয়।[৬] তখন 'SRY' জিনটি 'SOX' নামক আরেকটি জিন সক্রিয় করে যেটি আবার 'SF1'

ফ্যাক্টরসহ অন্যান্য জিন সক্রিয় করার মাধ্যমে ছেলেদের প্রজননতন্ত্র বিভক্ত করা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ছেলেদের শুক্রাশয় তৈরি করে। একই সাথে 'SOX' জিনটি 'WNT4' নামক আরেকটি জিনকে সক্রিয় হওয়া থেকে বাধা দেয় যাতে একই ভ্রূণে ছেলে ও মেয়ের প্রজনন্তন্ত্র গঠিত না হয়। এবার উৎপন্ন শুক্রাশয়ের সারটলি কোষ থেকে বিভিন্ন হরমোন নিঃসৃত হয়ে ছেলেদের জেনিটাল ডাক্ট থেকে এপিডিডাইমিস, ভাস ডিফারেন্স, সেমিনাল ভেসিকল ও লেডিগ কোষ থেকে বিভিন্ন হরমোন নিঃসৃত হয়ে বাহ্যিক যৌনাঙ্গ তৈরি হয়।"[৭] এভাবেই একটি ভ্রূণের জেন্ডার আস্তে আস্তে পুরুষে পরিণত হয়। ম্যাম, আমি মনে হয় আপনাকে বুঝাতে পেরেছি।"

"হ্যাঁ, গো অ্যাহেড।"

ফাতিমা আবার বলা শুরু করলো, "তারপরে, যে ভ্রূণের ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে 'Y' ক্রোমোজোম থাকে না, সেই ভ্রূণে 'WNT4' জিনটি সক্রিয় হয়। তারপর 'WNT4' জিনটি আবার 'DAX1' এবং 'TAFII 105' জিন সক্রিয় করার মাধ্যমে মেয়েদের প্রজননতন্ত্র বিভক্ত করা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মেয়েদের ডিম্বাশয় তৈরি করে। আবার এক্ষেত্রে 'WNT4' জিনটি 'SOX' নামক জিনকে সক্রিয় হওয়া থেকে বাধা দেয়, যাতে একই ভ্রূণে ছেলে ও মেয়ের প্রজনন্তন্ত্র গঠিত না হয়। এবার উৎপন্ন ডিম্বাশয় থেকে বিভিন্ন হরমোন নিঃসৃত হয়ে মেয়েদের জেনিটাল ডাক্ট থেকে জরায়ু, ফেলোপিয়ান টিউব এবং আলাদাভাবে বাহ্যিক যৌনাঙ্গ তৈরি হয়।[৮] এভাবেই একটি ভ্রূণের জেন্ডার আস্তে আস্তে মহিলাতে পরিণত হয়। ম্যাম একটু ওয়েট করুন। আমি আরেকটি ছবি দেখাচ্ছি। ছবি দেখে আমার কথার সাথে মেলানোর চেষ্টা করুন।"

ফাতিমা মোবাইলের লক খুলে গুগলে গিয়ে ইন্টারনেট থেকে আরেকটি ছবি ওপেন করলো। ছবিটি ওপেন করে ফুফুর হাতে মোবাইলটি দিয়ে দেখতে বললো। ছবিটি ছিলো এমন।

রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের ২১৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন
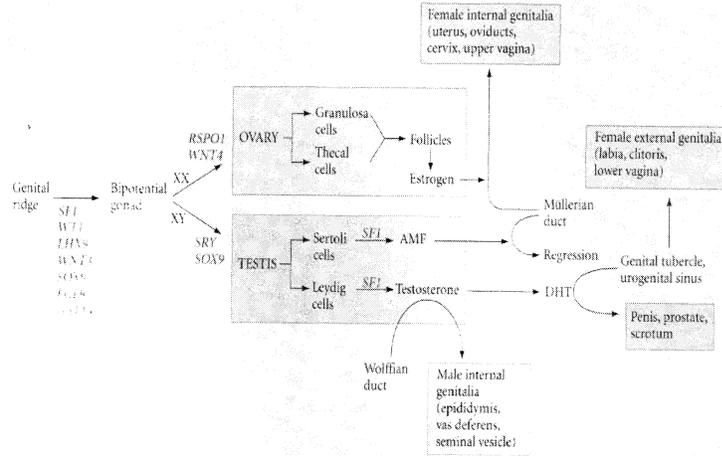
জেবু ম্যাম ছবির দিকে তাকিয়ে ফাতিমার বলা কথার সাথে মিলাচ্ছিলেন। মিলানো শেষে জেবু ম্যাম মোবাইলটি বিছানায় রেখে দিলেন। তখন ফাতিমা বললো, "এবার আপনি লক্ষ করলে দেখে থাকবেন যে, এর প্রত্যেক ঘটনাই ৬ সপ্তাহ অর্থাৎ, ৪২ দিনের পরে হয়। আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ ৪২ দিন পরে ছেলে কি মেয়ে হবে সেটা তাকদীরে লেখা হয় বলে আমাদের জানিয়েছেন, সেহেতু রাসূলুল্লাহ এই জননতন্ত্রের বিভক্তির মাধ্যমে ছেলে-মেয়ে আলাদা হবার কথাই বলেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। ম্যাম, এই সম্পর্কিত জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান জেনেছে হয়তো এই শতাব্দিতে, আর আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের জানিয়েছেন ১৪০০ বছরেরও আগে। ম্যাম, এই জ্ঞান ওই সময়ে একজন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ব্যতীত কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। তাই না? সুতরাং বোঝা গেলো যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত একজন সত্য নবী এবং রাসূল ছিলেন। আর...।"

ফাতিমাকে থামিয়ে জেবু ম্যাম বললেন, "কিন্তু তবুও তো ভ্রূণের লিঙ্গ পার্থক্যকরণে 'Y' ক্রোমোজোমেরই ভূমিকা অগ্রগণ্য থাকছে। আর এখানে জিনগুলোই তো সব কাজ করছে। তাহলে এখানে আল্লার আদেশের দরকার কী? হুঁহ!"

ফাতিমা বললো, "ম্যাম, এবার আপনি একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আসলে আপনার ধারণা হলো শুধুমাত্র 'Y' ক্রোমোজোমই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

কিন্তু আসলে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ সত্য না। প্রকৃতপক্ষে 'Y' ক্রোমোজোমের 'SRY' জিন ছাড়াও কিছু জিন লিঙ্গ নির্ধারণ এবং পার্থক্যকরণে সাহায্য করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'SF1 factor' নামক জিন, যেটি থাকে ৯ নং কোমোজোমে; 'SOX' নামক জিন, যেটি থাকে ১৭ নং ক্রোমোজোমে; 'DAX1' নামক জিন, যেটি থাকে 'X' ক্রোমোজোমে; এবং 'DMTR1' নামক জিন, যেটি থাকে ৯ নং ক্রোমোজোমে[৯]। সুতরাং, শুধু 'Y' ক্রোমোজোমই যে লিঙ্গ পার্থক্যকরণে সব কাজ করে, এই ধারণা ঠিক নয়।"

জেবু ম্যাম বললেন, "তাতে কী? আমার প্রশ্নের উত্তরই তো দিলে না।"

ফাতিমা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, এখন সেটা দিবো, ইনশা-আল্লাহ। একটু আগে আপনাকে যে জিনগুলোর কথা বললাম, সেগুলোর তো আর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি নেই যে, ইচ্ছামতো সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় হবে! যদি থাকতোই, তাহলে এইসব জিন সব ভ্রূণের ক্ষেত্রেই সমানভাবে সক্রিয় হতো কিংবা নিষ্ক্রিয় হতো। কিন্তু সেটা তো হয় না। মাঝে মাঝে কিছু ভ্রূণে এসব জিন সক্রিয় হয় না। ফলে সন্তান প্রজননতন্ত্র সংক্রান্ত জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। কখনো আবার ছেলে অথবা মেয়েদের প্রজননতন্ত্রের কোনো অঙ্গই তৈরি হয় না। আবার কখনো ছেলে অথবা মেয়ে উভয়ের প্রজননতন্ত্রের অঙ্গই তৈরি হয়। সুতরাং, তখন আমরা সাধারণভাবে তাকে মেয়ে অথবা ছেলে বলতে পারছি না। তাহলে বোঝা গেলো যে, এই জিনগুলোর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই। তাই আমরা বলি যে, এই জিনগুলো আল্লাহ তা'আলার আদেশেই সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হয়। আল্লাহ তা'আলা ভ্রূণের উপর ৪২ দিন অতিক্রম করলে যে ফেরেশতা পাঠান, সেই ফেরেশতাকে আদেশ দিলেই জিনগুলি সক্রিয় হয় এবং ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে ভ্রূণটি বিভক্ত হয়। আবার যদি আল্লাহর আদেশ না হয়,.তখন জিনগুলি আর সক্রিয় হয় না এবং ছেলে বা মেয়ের প্রজননতন্ত্র বিভক্তও হয় না। সুতরাং, আল্লাহ তা'আলার আদেশেই ভ্রূণ ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে সেটা নির্ধারিত হয় এবং তাকদীরে লেখা হয়।"

জেবু ম্যাম কিছু একটা বলতে গেলেন। কিন্তু ফাতিমা তার আগেই বলা শুরু করলো, "ম্যাম, আপনাকে একটি সুন্দর তথ্য দেই। ধরেন কোনো ভ্রূণের জেনেটিক সেক্স 'XY'। তাহলে সে নরমালি ছেলে হবে। তাই না?"

-"হ্যাঁ, তাই তো হবার কথা।"

-"এরকম জিনোটাইপের ভ্রূণটিও মেয়ে হতে পারে। সেটা জানেন?"

-"এ কী করে সম্ভব?"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "অনেক কিছুই সম্ভব। তাহলে শুনুন, ভ্রূণের 'XY' কোমোজোমের মধ্যে 'X' ক্রোমোজোমে যদি 'WNT4' রিজিয়নটির ডুপ্লিকেশান ঘটে, তাহলে 'DAX1' প্রোটিনটি বেশি তৈরি হয় এবং 'SRY' জিনটি সাপ্রেসড হয়। তাহলে ওই ভ্রূণের গোনাড হিসেবে ডিম্বাশয় হয়। এবং পরবর্তীতে ভ্রূণটি মেয়ে হিসেবে গড়ে ওঠে।[১০] তাহলে আপনার থিওরি কি থাকছে যে, 'Y' ক্রোমোজোম বা 'SRY' জিন থাকলেই সেই ভ্রূণ ছেলে হবে?"

দীর্ঘ সময় ধরে চুপ থাকার পরে আদনান বললো, "না, তাহলে ফুফুর থিওরি ভুল। আসলে এর সবই জিন সুইচিং এর উপর ডিপেন্ড করে। আর ফুফু, মুসলিমরা বিলিভ করে, এই কাজটি জিনের নিজের শক্তিতে হয় না। এটা আল্লাহ তা'আলার আদেশে হয়। বুঝেছো, ফুফু?"

ফাতিমাও আদনানের কথায় সায় দিয়ে বললো, "হ্যাঁ, একদম তা-ই।"

তখন আদনান জেবু ম্যামের দিকে ফিরে বসলো। এবং হেসে হেসে বললো, "ফুফু, এবার আমি তোমাকে 'কুয়োর ব্যাঙের' গল্পের মর্মকথা বুঝিয়ে বলছি। 'কুয়োর ব্যাঙ' যেমন মনে করে তার দেখা জলাশয়ের চেয়ে বড় কোনো জলাশয় হতেই পারে না, তেমনি এই সমাজের কিছু মানুষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। অথচ এটা ভুলে যায় যে, তার থেকে বেশি জ্ঞানও কেউ রাখতে পারে। আর জ্ঞান থাকলেও যে সে সঠিক পথ পায়, তেমনও না। আল্লাহ যাদের সঠিক পথ দেখান, তারাই সুপথপ্রাপ্ত হয়। যেমন ফুফু, আমিও তো তোমার মতোই ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় আজ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। তাই ফুফু, তুমিও...।"

জেবু ম্যাম ফাতিমার দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, "হুম! অনেক বুঝে ফেলেছিস তোরা! তোদেরও মগজধোলাই হয়েছে বোঝা যাচ্ছে! ঠিকাছে, এখন আমার আর সময় নেই। পরে আবার কথা হবে। এখন আমার একটু বাইরে যেতে হবে। তোরা এখন যেতে পারিস।"

এই বলে জেবু ম্যাম বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে ভিতরের রুমে চলে গেলেন। ফুফুর কথায় কিছু মনে না করে কিছুক্ষণ পরে ফাতিমা এবং আদনান ফুফুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। রাস্তায় থাকাকালীন হঠাৎ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলে আদনান ছাতা খুলে দু'জনের মাথার উপরে ধরে বললো,

"ফাতিমা, আমার কিন্তু 'কুয়োর ব্যাঙের' উদাহরণটি খুবই ভালো লেগেছে। সঠিক স্থানে তুমি সঠিক উদাহরণ দিয়েছো। তাই তোমার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।"

নিজের প্রশংসা ফাতিমা পছন্দ করে না। না শোনার ভান করে ফাতিমা বললো, "যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয় আর সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি তার সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে?[১১] আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছে সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে লাঞ্ছিত করেন।"[১২]

ছাতা হাতে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো আদনান। বললো, "তোমার এতকিছু কীভাবে মনে থাকে?"

"এই, চলো তো তাড়াতাড়ি! বাসায় অনেক কাজ। ঢং করার সময় নেই।" বলে ঠেলতে ঠেলতে আদনানকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো ফাতিমা। বৃষ্টিতে ছাতার নিচে সাদা পাঞ্জাবি আর কালো বোরকার মিশ্রণে দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন সমুদ্র তীরে হেঁটে চলা দুটি মুক্তা!

[আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই জ্ঞানের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। সেটি যারা বোঝে এবং সেই অনুযায়ী নিজে চলার চেষ্টা করে, তারাই বুদ্ধিমান। বিজ্ঞান এখনো পৃথিবীর সবকিছুই আবিষ্কার করে ফেলেছে, এমন তো নয়। তাই বিজ্ঞান দিয়েই সবকিছু জাস্টিফাই করার মানসিকতা পরিহার করা উচিত। আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেই আমি ইসলাম বিদ্বেষীদের অভিযোগকৃত হাদিসের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলার কাছেই। লেখাটিতে যা কিছু ভুল, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে এবং যা কিছু কল্যাণ, সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

♦ [১] *সহিহ মুসলিম;* তাকদীর অধ্যায়; হাদিস নং- ৬৪৮৫, ৬৪৮৭ (ইঃফা) এবং ৬৫৩৭, ৬৫৩৯ (ইঃসে)

♦ [২] *Medical Book of Forensic Medicine and Toxicology*; Written by Reddy; 33rd edition; page: 65

♦ [৩] সূরা বাকারাহ (২); আয়াত: ৩-৫

♦ [8] *Langman's Medical Embryology* by Thomas W. Sadler PhD (13rd edition); chapter: Urogenital system development; page: 277

♦ [৫] *The Developing Human, Clinically Oriented Embryology* By Dr. Keith L. Moore(8th edition); Page: 327

♦ [৬] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658794/

♦ [৭] *Langman's Medical Embryology* by Thomas W. Sadler PhD (12th edition); chapter: Urogenital system development; page: page: 243-253 (248)

♦ [৮] *Langman's Medical Embryology* by Thomas W. Sadler PhD (12th edition); chapter: Urogenital system development; page: 243-253 (248)

♦ [৯] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658794/

♦ [১০] *Developmental Biology* by Scott F. Gilbert; 9th edition; page: 521

♦ [১১] সূরা ফাতির (৩৫); আয়াত: ০৮

♦ [১২] সূরা আল-ইমরান (০৩); আয়াত: ২৬

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা হয়েও কেন অবিশ্বাসীদের চিরকাল শাস্তি দিবেন?

আদনানের গ্রামের বাড়ি খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার মোকামপুর গ্রামে। ঈদের পরে ফসল কাটার সময় কোনো ছুটি পেলেই ফাতিমাকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যাবার কথা আদনানের। আদনানের দাদাবাড়িতে তার চাচারাই মূলত পরিবারসহ থাকে। তারা মূলত কৃষিনির্ভর। বছরে যখন ফসল কাটা হয়, তখন ভালোই আনন্দের আমেজ তৈরি হয় গ্রামে। বিশেষভাবে যারা শহরে থাকে তাদের কাছে ফসল কাটা, ধান মাড়ানো, চাল সিদ্ধ করা, মুড়ি ভাজা সবকিছুই খুব আনন্দের বিষয়।

এই বছর কুরবানির ঈদ এমন সময় হয়েছে যে, একদম ঘরে ফসল উঠানোর কিছুদিন আগে। তাই আদনান ঈদের ছুটির সাথে কিছু সময় বাড়িয়ে ঈদের পরে গ্রামে যাবার প্ল্যান করলো। ফাতিমাকেও জানিয়ে রাখলো যে, এবার ঈদের পরে ফাতিমার বাড়িতে যাওয়া হবে না। এতে ফাতিমার কিছুটা মন খারাপ হলেও এতে সে দ্বিমত করলো না!

ঈদের আমেজ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আদনান, ফাতিমা এবং আদনানের বোন নাবিলা বুধবার সকাল ৭ টায় খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। টানা ৬ ঘণ্টার সফর শেষে তারা খুলনা এসে পৌঁছালো। খুলনা সোনাডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছু ফলফলাদি কিনে সোজা নদীঘাট। সেখানে গিয়ে আদনান মাঝিদের সাথে

কথা বলে একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকা ঠিক করলো যেটি সোজা মোকামপুর গিয়ে থামবে। অন্যভাবেও যাওয়া যেত, কিন্তু ফাতিমার ইচ্ছা সে নৌকায় উঠবে। তাই আদনান ফাতিমার ইচ্ছা পূরণ করতে নৌকাই ঠিক করলো। সবাই নৌকায় ওঠার পরে বেলা আড়াইটার দিকে নৌকা চলা শুরু করলো মোকামপুরের উদ্দেশ্যে। ভৈরবের ঢেউ চিরে নৌকা সমনে যেতে লাগলো। একপর্যায়ে নদীর ওপারের কোণা ঘেঁষে গাছপালার নিচ দিয়ে যাবার সময় মনে হলো সিলেটের রাতারগুল দিয়ে নৌকা বনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

ঐ দূরে মোকামপুরের ঘাট দেখা যাচ্ছে। সাথে ছোট ছোট কিছু অবয়বও দেখা যাচ্ছিলো। ঘাটের কাছে গিয়ে দেখা গেলো আদনানের চাচা এবং চাচাত ভাইয়েরা তাদের নিতে এসেছে। প্রথম সস্ত্রীক আদনান গ্রামের বাড়িতে এসেছে – যত্ন করতে হবে না?

বাড়ি পৌঁছানোর সাথে সাথে পিচ্চিগুলো আদনানকে জড়িয়ে ধরে এটা ওটা আবদার শুরু করে দিলো। এভাবে অসময়ে এরা আবদার করে বসবে, এটা আদনান বুঝতেই পারেনি। অনাথের মতো ফাতিমার দিকে তাকাতেই ফাতিমা কিছু চকলেট বের করে দিলো। সেগুলো দিয়ে আপাতত পরিস্থিতি শান্ত করলো আদনান। এরপর সবাইকে সালাম দিয়ে, কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করতে করতে ঘরে ঢুকে পড়লো আদনান। যুহরের সালাতের সময় শেষ হবার ভয়ে কোনো বিশ্রাম না নিয়েই তিনজন আগে সালাত আদায় করলো। এরপর ফ্রেশ হয়ে খেতে বসলো সবাই। খাওয়াদাওয়া শেষে কেবল বিশ্রাম নিতে যাবে এই সময়ে আদনানের চাচাত ছোট ভাই বলে উঠলো, "ভাইয়া, চলো নৌকা নিয়ে ধানের জমিত যাই। সিখানে ধান কাটা হসসে।"

নৌকায় ওঠার কথা শুনে ফাতিমা আর নাবিলার বিশ্রামের কথা মাথা থেকে উড়ে গেলো। তারা আদনানকে বললো, "আমরা বিশ্রাম রাতে নিবো ইনশা আল্লাহ। এখন চলো ধান কাটা দেখে আসি।"

আদনান বললো, "কাল গেলে হয় না? আজই যেতে হবে এমন তো নয়!"

ফাতিমা বললো, "না! আজই যাবো। তুমি যাবে? সেদিন না সূরা নিসায় পড়েছিলে যে, ছেলেরা মেয়েদের অভিভাবক। তো এখন ওই আয়াতের উপর

আমল করবে না?"

নাবিলাও ফাতিমার কথায় সায় দিয়ে বললো, "হ্যাঁ, ভাইয়া। আজই চলো না!"

বাঁকা চোখে কতক্ষণ ফাতিমার দিকে তাকিয়ে থেকে আদনান বললো, "ও চাচা! এদিকে আসেন তো! নৌকা নিয়ে বাইরে যেতে হবে। এরা ধান কাটা দেখবে।"

চাচা বিলে নৌকা নিয়ে আসলে সবাই নৌকায় করে রওনা দিলো ধান কাটা দেখতে। সেখানে গিয়ে দেখলো দু'জন লোক ধান কেটে কেটে আরেকটি নৌকায় উঠাচ্ছে। লোকটাকে আদনানের চেনা চেনা লাগছে। কাছে গিয়ে আদনান প্রশ্ন করে বসলো, "জাফর চাচা নাকি?"

আদনানকে অনেকদিন পরে দেখে জাফর চাচা চিনতে পারলেন না। সাথে আবার মুখে লম্বা দাড়ি! আদনানের চাচা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা আমাগে আদনান আর এটা উর বউ!"

জাফর চাচা বললেন, "ও! আদনান বাবাজি। কিরাম আছো, বাবা?"

আদনান উত্তর দিলো, "হ্যাঁ! আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?"

জাফর চাচা বললেন, "আমি তো ভালোই আছি, কিন্তু তোমরা ইরাম আরবের বেশ ধরিছো কেন? আগেই তোহ ভালো ছিলা! এই লম্বা দাড়ি, লম্বা জামা, বুরখা এগুলো তো আরবগে সংস্কিতি! বাঙালি হয়ে তোমরা কিশির জন্যি এগুলো পরবা? এগুলো তোহ উরা পরে উগে দেশে জম্মের গরমেরতে বাঁচতি। আমাগে দেশের আবহাওয়া তো উরাম না!"

আদনান ভদ্রতার সাথে জাফর চাচাকে বললো, "ঠিক আছে এরকম পোশাক আরবেরা পরে বা ওদের সংস্কৃতির অংশ। পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের আইন হলো ঢোলাঢালা হতে হবে। পুরুষদের ক্ষেত্রে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা থাকতে হবে এবং পায়জামা যেন টাখনুর নিচে না চলে যায়। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে মুখমন্ডল, হাতের কব্জি ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখতে হবে। এখন কেউ যদি এরকম ঢোলা লম্বা জুব্বা পরে, তাহলে যেহেতু আল্লাহর রাসূল ﷺ পরতেন- সেই কারণে

সওয়াব পাবে। আবার নারীরা ফিতনা এড়াতে এবং তাকওয়ার কারণে সম্পূর্ণ শরীরের পর্দা করলে এতে আল্লাহ তা'আলা তাদের পুরষ্কৃত করবেন। বিদেশি সংস্কৃতি হলেও এটা একটা ইসলামিক পোশাক। তাছাড়া বিদেশি সংস্কৃতি হলেই যে সবকিছু বর্জন করতে হবে এমন তো নয়।"[১]

জাফর চাচা বললেন, "আমি তো বাবা তুমারে ধর্মের কথা জিজ্ঞেস করিনি! ওতে আমার বিশ্বাস নাই। তুমাগে ধর্ম অনেক নির্মম আর কঠিন! এজন্যি আমার ওইসব ভালো লাগে না।"

আদনান জিজ্ঞাসা করলো, "তো! জাফর মিয়া, কোন জিনিস আপনার কাছে এত নির্মম আর কঠিন লাগলো?"

জাফর চাচা বললেন, "কথা হচ্ছে যে যারা আল্লাকে মানবে না তাগে উনি আজীবন জাহান্নামের আগুনে পুড়াবেন! রক্ত মিশ্রিত পুঁজ খাতি দিবে! কাঁটাওলা ফল খাওয়াবে! একজন স্রষ্টা কিশির জন্যি এত কঠিন হবে? কিশির জন্যি উনি নিজের তৈরি মানুষকেই উনারে না মানার জন্যি সারাজীবন এই শাস্তি দিবেন? এই জন্যিই এগুলোর উপর বিশ্বাস নেই!"

আদনান বললো, "আচ্ছা জাফর মিয়া, আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না যে, আপনি তো জান্নাত জাহান্নাম এগুলো বিশ্বাসই করেন না! তাহলে আপনার এত ভয় পাবার কী আছে?"

আদনানের শিশুসুলভ উত্তর শুনে ফাতিমা আর নাবিলা হো হো করে হেসে দিলো। তারপর ফাতিমা জাফর চাচাকে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা চাচা, আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন?"

জাফর চাচা উত্তর দিলেন, "আমার দুইটা ছাওয়াল। কোনো মাইয়ে নেই। মজার বিষয় হচ্ছে দুই ছাওয়ালই জমজ। তারপরে আর তুমার আন্টির কোনো ছাওয়াল-মাইয়ে হয়নি। এক ছাওয়ালের নাম আতিক আর আরেকজনের নাম সজীব। দুইজনই কলেজে পড়তেছে। আর উগেও আমি আমার আদর্শে গড়ে তুলতিছি। কিন্তু সমস্যা হলো, সজীবের রেজাল্ট সেইরাম ভালো না। পড়াশুনা করতিই চায় না। পড়াশোনা না করলি কি মাস্টার ওরে ফাও নাম্বার দেবে? ও সকালে বাড়ি থেকে বাইর হয় আর রাতি ফেরে। মাস্টার তো তাও ওরে পাশ

করায়! আমি হলি পাশই করাতাম না। আমি হসসে খুব ন্যায়পরায়ণ মানুষ। আমার ছাওয়াল বলে পড়াশুনায় পাশ করায়ে দেবো – এমন মানুষ আমি না। এদিক দিয়ে আবার আতিক বাবাজি খুবই ভালো। সারাদিন পড়াশুনা করে। রেজাল্টও ভালো। কিলাশে সবসময় রোল এক থেকে তিনের এর মধ্যে থাকে। ওর সব চাওয়াগুলো আমি পূরণ করার চিষ্টা করি। আমি যে তোমাগে জমিতে ধান কাটতিছি, এ কাজ কি আমার সাজে? আমার বাড়িতে গরুর খামার আছে, হাঁস-মুরগি, ছাগল সবই আছে। এগুলো দিয়েই সংসার চালাসসি। কিন্তু এগুলো করতিছি আমার ছাওয়ালের বই কিনার জন্যি।"

ফাতিমা জাফর চাচাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "আচ্ছা চাচা ঠিকাছে, জিজ্ঞাসা না করতেই অনেককিছু বলেছেন। আচ্ছা চাচা, সজীব তো আপনারই ছেলে। তাহলে আপনি তো তাকে পাশ করিয়ে দিতেই পারেন, যদিও সে লেখাপড়া ঠিক মতো করে না!"

জাফর চাচা বলেন, "না, মা! আমি একজন ন্যায়পরায়ণ মুক্তচিন্তার মানুষ হইয়ে কেমনি আমার ছাওয়ালকে দুর্নীতি করায়ে পাশ করাবো? তাহলি যে ছাওয়ালগুলো সারাবছর লেখাপড়া করে, তাগে প্রতি অবিচার হয়ে যাবে না? তাই আমি এই কাজের পক্ষে না!"

ওদিক থেকে রসুল মিয়া চিৎকার করে বলে উঠলো, "ও জাফর! তুমার গল্প এখন বাদ দেও! ধান কাটা আইজকের মতো শেষ। এবার চলো বেলা ডুবার আগে ধান মাড়াই করতি হবে। আর ও আদনান বাবা, চলো বাড়ি যাইয়ে কথা কই!"

এদিকে আসরের সময় হয়ে যাওয়াতে আদনান, ফাতিমা ও নাবিলা দ্রুত নৌকায় চাচার সাথে বাড়ির দিকে রওনা দিলো। আর চাচাতো ভাইকে জাফর মিয়ার সাথে আসতে বলে চাচা নৌকা চালানো শুরু করলেন। যাত্রাপথে আদনান ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "ফাতিমা, তুমি তো উনার কোনো প্রশ্নের উত্তরই দিলে না। শুধু কিছু ফালতু আলাপ করে সময় নষ্ট করলে। আমি তো তবুও উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তোমরা তো হো হো করে কথা উড়িয়ে দিলে!"

ফাতিমা বললো, "উত্তর দেবার সময়ই তো পেলাম না। তো দিবো কী করে? চলো, বাড়ি গিয়ে দেখি উত্তর দেওয়া যায় কি না।"

বাড়ি পৌঁছানোর পরে সবাই আসরের সালাত আদায় করে বাড়ির উঠানে চেয়ার নিয়ে বসলো ধান মাড়াই দেখার উদ্দেশ্যে। উঠানের সামনেই রসুল মিয়া আর জাফর চাচা মেশিনে ধান মাড়াই করছিলেন। আদনান আর ফাতিমা দেখার উদ্দেশ্যে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে রসুল মিয়া বললেন, "বাবা, একটু পাশে যাইয়ে দাঁড়াও। নাকে-চোখে ময়লা যাবে। এই খড়কুটো ভালো জিনিস না। এতে রোগ হয়।"

ফাতিমা উৎসুক মনে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা জাফর চাচা! এই খড়কুটোগুলো ফেলে দিচ্ছেন কেন?"

জাফর চাচা বললেন, "এইগুলো দিয়ে এখন কোনো কাজ নেই। আমাগে এখন ধান দরকার। ধান আলাদা হইয়ে যাওয়ার পরে এই খড়কুটো দিয়ে হয় চুলায় আগুন জ্বালানো হবে অথবা গরুকে খাওয়ানো হবে। এছাড়া এই খড়কুটো কোনো কাজে আসে না।"

ফাতিমা বললো, "হ্যাঁ, জাফর চাচা! আপনি ঠিক বুঝেছেন যে, এই খড়কুটো থেকে ধান আলাদা করে নেওয়ার পরে এর আর তেমন কাজ থাকে না। তাই এটি আগুনে পোড়ানো হয় অথবা গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন আপনাকে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষ এবং জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সেটি হলো আমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাহ করবো।[২] তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। সাথে সাথে আমরা রাসূলকে ﷺ আল্লাহর প্রেরিত দূত ও বান্দা হিসেবে মেনে নিবো। এটাই হচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করার সীমারেখা। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করবে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সৎ থাকলো এবং এই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করতে পারবে না, তাকে দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কোনো কাজ নেই এবং সে অপ্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য হবে। তাই আমরা যেমন অপ্রয়োজনীয় খড়কুটো আগুনে পুড়িয়ে দেই, ঠিক তেমনি আল্লাহর কাছেও ওই সৃষ্টি যে তাঁকে স্বীকার করেনি সে অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং তাকেও আল্লাহ চিরকাল জাহান্নামের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবেন।[৩] আমি কি বুঝাতে পারলাম, জাফর চাচা?"

জাফর চাচা বললেন, "না, এত সহজে তো আমি ছাইরে দিসসি না! আসসা তুমি কী কইরে মানুষ আর স্রষ্টাকে একই কাতারে আইনে উদাহরণ দিলে? মানুষ তো নিষ্ঠুর হয়। কিন্তু স্রষ্টা তো দয়াময় হবেন। তিনি কি পারতেন না সবাইকে একসাথে জান্নাতে দিতে?"

ফাতিমা উত্তর দিলো, "এর উত্তর কিন্তু আপনি আগেই দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম যেমন রয়েছে সৃষ্টিকর্তা, ঠিক তেমনি রয়েছে দয়াময়। আবার তাঁর গুণবাচক নামের মধ্যে রয়েছে ন্যায়পরায়ণ এবং সুবিচারক। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা চাইলেই সবাইকে জান্নাতে দিতে পারতেন। কিন্তু যে ব্যক্তিগুলো সারাদিন মদ, জুয়া, গান-বাজনা, সুদ, ব্যভিচার, অনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং অপরদিকে যারা আল্লাহর হুকুম মেনে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে, সুদের ব্যবসা না করে মানুষকে বিনা সুদে টাকা ধার দিয়েছে, যারা সমাজে নৈতিকতা বজায় রেখেছে তাদের পুরষ্কার কি এক হয়? যদি এদের দুই শ্রেণীকে আল্লাহ তা'আলা একই পুরষ্কার দিতেন, তাহলে যারা ভালো কাজ করেছে তাদের প্রতি অবিচার হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো ন্যায়বিচারক এবং সুবিচারকও বটে। তাই তিনি এই অবিচার করবেন না। যার যেটা প্রাপ্য, বিচারের দিন তাকে তিনি সেটাই দিবেন। সেদিন কাউকে বিন্দুমাত্র ঠকানো হবে না। দেখেন জাফর চাচা, আপনি যদি আপনার ছেলে পড়াশোনা না করার কারণে তাকে পাশ করাতে না চান আপনার সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দোহাই দিয়ে, তাহলে যিনি জগৎসমূহের মালিক এবং সমস্ত ন্যায়পরায়ণদের উপরে যার ন্যায়পরায়ণতা, তিনি কী করে ভালো মানুষগুলোর প্রতি অবিচার করবেন? তাই এক্ষেত্রে তিনি সঠিক বিচারই করবেন। এতে তো দোষের কিছু নেই!"

জাফর চাচা বললেন, "এখানে তুমি কিন্তু একটি ভুল কইরলে। তুমি মনে কর যে যারাই আল্লাকে বিশ্বাস করে না তারাই ব্যভিচার, চুরি, মানুষকে ঠকানো ইত্যাদি কইরে থাকে। কিন্তু অনেক মানুষ আসে যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু এগুলোও করে না। আবার অনেকে আসে যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে, কিন্তু ওইসব কাজও করে। তাই এইভাবে সবাইরে দোষারোপ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়!"

ফাতিমা বললো, "দেখেন চাচা, আমি কিন্তু বলিনি যে যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে

তারা এমন কাজ করে না। হ্যাঁ, তারাও ওসব কাজ করে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও যে ছেড়ে দেবেন – এমন নয়। যার যার মন্দ কর্মের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। আর এভাবে যদি শাস্তি দেওয়া না হয়, তাহলে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে। অপরাধ বেড়ে যাবে। সুতরাং, শাস্তি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এবার আসি যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না কিন্তু ওসব কাজ করে না এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কী হবে? আসলে এমন লোক পাওয়া খুব কঠিন। যদিও উপরে উপরে থাকতে পারে, তবে ভিতরে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে ওদের অন্তরেও এসব অপরাধের আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। শুধুমাত্র সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সুযোগ পেলেই কাজে লাগায়। আচ্ছা চাচা, আপনি বলেছিলেন আপনার বাসায় গরু-ছাগল রয়েছে। তো গাভীর দুধ তো বিক্রি করেন। নাকি?"

জাফর চাচা উত্তর দিলেন, "কোন কথা থেকে কোথায় চইলে গেলে তুমি? এই কথা জাইনে এখন কী হবে?"

ফাতিমা বললো, "চাচা, আগে বলবেন তো!"

-"হয়! গাভীর দুধ প্রতিদিন বিক্রি করি।"

-"ও! তো দুধে আপনি পানি মেশান না?"

-"এগুলো কী বলো? দুধে পানি মেশানোর মতো দুই নম্বর কাজ আমি করি নে। আমি একেবারে খাঁটি দুধ বিক্রি করি। ক্রেতাগে কইয়েই দি যেন পানি মিশায়ে নেয়। আমি দুধে এক ফোঁটা পানিও মিশাই নে!"

-"আচ্ছা! কেউ যদি বলে আপনি পানি মেশান, তাহলে সে কি অপরাধ করবে?"

-"অপরাধ করবে মানে? কঠিন অপরাধ করবে! সে আমার সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে আর এটা অপরাধ হবে না? তারে তো আমি মেম্বার সাহেবের কাছে বিচারের জন্যি নিয়ে যাতাম! হুঁ!"

-"হ্যাঁ চাচা, তখন আপনার সেই ব্যক্তির বিচার করাই উত্তম হবে। এই একই কাজ আল্লাহ তা'আলাও করবেন। আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্রষ্টা এবং তিনি নিজেই এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যুগে যুগে নবীদের নিদর্শন দেখিয়েছেন।

তাঁদের সাথে কথা বলেছেন, তাঁদের উপর ওয়াহী নাযিল করেছেন। তাঁরা মানবজাতির কাছে সেই স্রষ্টার পরিচয় তুলে ধরেছেন। এরপরেও যদি কেউ তাঁকে স্রষ্টা হিসেবে অস্বীকার করে, তাহলে সেটা হবে সবথেকে বড় অপরাধ।[৪] আর এই অপরাধ তিনি ক্ষমা করবেন না।[৫] তাই যে তাঁকে সৃষ্টিকর্তা না মেনে ভালো কাজ করবে, তার এই ভালো কাজের বদলা আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে দিবেন। কিন্তু বিচারের দিনে সেই ভালো কাজ তার কোনো উপকারেই আসবে না। সে চিরকাল জাহান্নামের শাস্তিই ভোগ করবে।[৬] তাই এখানেও আল্লাহ তা'আলার অবিচার লক্ষ করা যাচ্ছে না, চাচা!"

ফাতিমার চৌকস উত্তরগুলো শুনে জাফর চাচার চোখ আর উপরে উঠলো না। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে রসুল মিয়া বললেন, "মিয়া! কত কইছি তুমারে যে, ওইসব জটিল চিন্তা করার দরকার নাই। সহজভাবে জীবনযাপন করো। দুনিয়ার আল্লাহর কথাই মাইনে চলো। তাইলে পরকালে সুখে থাকবা। তা তো শুনবা না! এহন শিক্ষা হয়সে?"

তখনো জাফর চাচার মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না। কী যে একমনে চিন্তা করেই যাচ্ছেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে আদনান বললো, "জাফর মিয়া! আজ আপনার আর কাজ করা লাগবে না। চাচার কাছ থেকে মজুরী নিয়ে বাড়িতে চলে যান। বাড়িতে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাববেন যে, আর কতদিনই বা বাঁচবেন। আপনার এই চিন্তাধারার কারণে যদি চিরকাল জাহান্নামের শাস্তির মধ্যে থাকা লাগে তাহলে তা কতই যন্ত্রণার! আর এই বয়সেও যদি আপনি আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসেন, তাহলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। চিরকাল জান্নাতের নিয়ামতে পুরস্কৃত করবেন।[৭] আপনি তো শুধু কুরআনের শাস্তির আয়াতগুলো নিয়েই বেশি চিন্তা করছেন! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং ঈমান আনি, তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কী লাভ?[৮] এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তিনি যা দিয়েছেন, সেখান থেকে ব্যয় করি, তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরষ্কার। তারপরে, আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছো না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহ তো

পূর্বেই তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন – যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'।[৯]

ফাতিমা তখন মোবাইল এগিয়ে দিয়ে আদনানকে বললো, "এই আয়াতটি বলতে পারো।"

আদনান মোবাইলটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলো, "একজন ঈমানদার বান্দাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা দয়ার সুরে বলেন, 'যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।'[১০] এই আয়াতগুলো কি একটু মনে নাড়া দেয় না, চাচা?"

জাফর চাচা কোনো কথা বলছেন না। একদৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পরে ফাতিমা আবার বলা শুরু করলো, "চাচা, আমরাও তো মানুষ। আল্লাহর বিধান মানতে গিয়ে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আমাদের ভুলত্রুটি হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। আমাদের তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১১] এরপরেও কি চাচা আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন দয়া আপনি অনুভব করেন না? শুধু আল্লাহ্কে শাস্তিদাতা হিসেবেই দেখলেন?"

এতটুকু বলতেই দূর থেকে মাগরিবের আযানের শব্দ শোনা যাচ্ছে, "কল্যাণের পথে এসো; এরই সাথে জাফর মিয়ার কান্নার আওয়াজ! মনে হয় কিছু হলেও তিনি বুঝেছেন! কুরআন তো এমনই। পাথরের মতো হৃদয়গুলোকেও মোমের মতো গলিয়ে দেয়।

[জাফর চাচার সাথে এবং ফাতিমা'র কথোপকথনের সময় ফাতিমা পর্দার বিধান সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পারেনি। তাই এভাবে কথা বলা শরী'য়াহ সম্মত নয়। কিন্তু ঘটনার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এভাবে কথা না বলে অন্য কোনো উপায় ছিলো না। শুধুমাত্র গল্প হিসেবেই এগুলো বিবেচনা করার অনুরোধ থাকলো।

সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলার কাছেই। লেখাটিতে যা কিছু ভুল, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে এবং যা কিছু কল্যাণ, সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

- [১] পুরুষের পোষাক: https://islamqa.info/en/36891
- নারীদের পোষাক: https://islamqa.info/en/235
- [২] সূরা আয-যারিয়াত (৫১); আয়াত: ৫৬
- [৩] কিতাবুয যুহদ: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল
- [৪] https://islamqa.info/en/113901
- [৫] সূরা তাওবা (০৯); আয়াত: ৮০
- [৬] সূরা বাকারাহ (০২); আয়াত: ১৬১-১৬২
- [৭] সূরা বাকারাহ (০২); আয়াত: ৮২
- [৮] সূরা নিসা (০৪); আয়াত: ১৪৭
- [৯] সূরা হাদীদ (৫৭); আয়াত: ৭-৮
- [১০] সূরা হাদীদ (৫৭); আয়াত: ১৬
- [১১] সূরা যুমার (৩৯); আয়াত: ৫৩

মহামারির ইসলামী সমাধান কি অমানবিক?

আমি আদনান। ফাতিমা আমার স্ত্রী। প্রথম যখন আমাদের বিয়ে হয়েছিলো, তখন মনে হয়েছিলো আমাদের পরিবার এভাবে আমাদের বিয়ে দিয়ে ঠিক করেনি। কারণ আমরা কেউ কারো মতো ছিলাম না। একজন যদি উত্তর মেরুর মানুষ হই, তো অন্যজন দক্ষিণ মেরুর। একজন সংশয়বাদী আর অন্যজন বিশ্বাসী। এভাবে তো ফাতিমার আমার সাথে থাকাই ঠিক ছিলো না। তবুও কী মনে করে ছিলো, সেটা ফাতিমাই ভালো বলতে পারবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পরিবার কাজটি ঠিক করেনি। যদিও আমার সংশয়ের কথা আমার পরিবার জানতো না। কিন্তু আমি যে সালাত আদায় করতাম না, সেটা তো তারা দেখতোই। তবুও কী মনে করে তারা এই সিদ্ধান্ত নিলো কে জানে?

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে কত কিছুই আল্লাহ তা'আলা পরিবর্তন করে দিলেন। এখন মনে হয় আল্লাহ্ তা'আলা ফাতিমাকে আমার জন্য হেদায়েতের মাধ্যম হিসেবেই কবুল করেছেন। হয়তো আমার বাবা-মার দু'য়ার কারণেই আল্লাহ তা'আলা ওকে আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আগে অন্তরে একপ্রকার অশান্তি অনুভব হতো। কিন্তু এখন একপ্রকার প্রশান্তি অনুভব করি। এই অনুভূতি আসলে কেমন, সেটা বলে বুঝানো যাবে না। আমার জীবনের এই কালো অধ্যায়গুলো সাদা করে দেওয়ার জন্য ফাতিমার অবদান আমি ভুলতে পারি না। এজন্য আমি সবসময় ওর ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেই। এতদিনের পরিচয়ে আমি লক্ষ করলাম যে, ফাতিমা খুব সত্যান্বেষী একটি মেয়ে। পড়াশোনার প্রতি

ওর প্রচণ্ডরকম ঝোঁক। আমি তো অফিসে থাকি। ওয়ার্কার, বায়ার, ইনভেস্টর – কতজনকে যে সামলানো লাগে! মার কাছে শুনলাম অধিকাংশ সময় ফাতিমা পড়াশোনা করেই কাটায়। আমার প্রায়ই ওকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া লাগে। এই তো গতকাল মাত্র গ্রামের বাড়ি থেকে এলাম। এরই মধ্যে আজ বলে বসলো, "তুমি তো আজ ফ্রি আছো। চলো তো একটু লাইব্রেরিতে যাই।"

যেহেতু কোনো কাজ নেই, তাই আমিও রাজি হয়ে গেলাম। দুইজন বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। নাবিলাকেও যাওয়ার জন্য বললাম। কিন্তু ও যেতে ইচ্ছুক না। অবশ্য ও যে ফাঁকিবাজ, লাইব্রেরিতে ওর যাওয়ার কথাও না। শেষমেষ মাকে বলে আমরা দুইজনই গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলাম। যাত্রাপথে মহাখালি এসে ফাতিমার ফোন বেজে উঠলো। বাইরে গাড়ির শব্দে শুনতে সমস্যা হবে ভেবে ফাতিমা ফোন রিসিভ করে লাউড স্পিকারে দিয়ে বললো, "হ্যালো সামিরা, কেমন আছিস?"

ফোনে উত্তর এলো, "হ্যাঁ, ভালো আছি। তুই কেমন আছিস?"

-"আমিও আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। কোথায় তুই? হঠাৎ ফোন দেওয়ার কারণ কী?"

-"আমি জাতীয় সংসদের সামনে। তোর বাসায় যেতে চাচ্ছিলাম। তুই কি বাইরে? এত শব্দ কেন?"

-"হ্যাঁ, আমি তো একটু ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাচ্ছি। তুই এখন যেখানে আছিস, সেখান থেকে তো লাইব্রেরি দূরে নয়। কোনো দরকার থাকলে লাইব্রেরিতে চলে আয়। আমি দোতলায় দক্ষিণ দিকে বসবো, ইনশা-আল্লাহ।"

-"আচ্ছা, ২০ মিনিট পরে রওনা দিচ্ছি।"

কথোপকথন শেষে আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, এই সামিরা কে?"

"সামিরা আমার ক্লাসমেট ছিলো ছোটবেলায়। মিরপুরে থাকে।" ফাতিমার উত্তর।

কিছুক্ষণ পরে আমরা লাইব্রেরিতে চলে আসি। কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে আমি সোজা দক্ষিণ দিকের একটি নিরিবিলি টেবিলে গিয়ে বসে পড়লাম। ফাতিমা কী একটা হিস্ট্রির বই নিয়ে এলো। পাশ থেকে দেখে বুঝতে পারলাম বইটির নাম *A History of Disease in Ancient Times* এবং বইটি লিখেছেন Phillip Norrie নামের এক ভদ্রলোক। আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই বই পড়ে তুমি কী করবে?"

ফাতিমা উত্তর দিলো, "বই পড়লে জ্ঞান বাড়ে। স্পিনোজা বলেছিলেন, 'ভালো খাদ্যবস্তু পেট ভরে, কিন্তু ভালো বই মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।' আর জন মেকলে বলেছিলেন, 'প্রচুর বই নিয়ে গরীব হয়ে চিলোকোঠায় বসবাস করবো, তবু এমন রাজা হতে চাই না যে বই পড়তে ভালোবাসে না।' তাই তোমারও উচিত প্রচুর বই পড়া। বুঝলা? যা-ই হোক, এই বইটিতে প্রাচীন সব রোগের বিস্তারিত উপাত্ত দেওয়া আছে। এগুলো আমার বিভিন্ন কাজে লাগতে পারে।"

আমি ফাতিমাকে বললাম, "আচ্ছা, তাহলে তুমি বসে বসে বই পড়ো। আমি একটু লাইব্রেরিতে ঘুরে আসি।"

এই বলে আমি উঠে পড়লাম। এখানে কী কী বই আছে সেটা দেখার জন্য দোতলার দরজার দিক দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। একটা কলাম ঘুরে উল্টো দিকে আসতে আসতে আবার দরজার দিকে গিয়ে দেখলাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কিছু বই রাখা আছে। ভাবলাম এখান থেকে একটি বই আমি পড়তে পারি। হঠাৎ একটি মেয়ে সামনে এসে বললো, "এক্সকিউজ মি! আপনি শেখ আদনান না? ফাতিমার হাসব্যান্ড?"

আমি কিছুটা বিব্রতবোধ করলাম। এরপরে উত্তর দিলাম, "হুম। আপনি কে? আমাকে চিনলেনই বা কী করে? আমি তো আপনাকে চিনি না!"

মেয়েটি উত্তর দিলো, "আমি ফাতিমার ফ্রেন্ড সামিরা। আপনাকে ফেসবুকে দেখেছি। ফাতিমার সাথে একটি ছবি আছে আপনার। এখন সামনাসামনি দেখে মনে হলো আপনিই সেই লোক। তাই শিওর হয়ে নিলাম। ফাতিমা আমাকে এখানে আসতে বলেছে। ওর সাথে আমার একটু দরকার আছে। ও কোন টেবিলে বসেছে?"

"আচ্ছা আমার সাথে আসুন।" এই বলে আমি সামিরাকে নিয়ে লাইব্রেরির দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলোম। দক্ষিণ দিকে পৌঁছে বললাম, "ফাতিমা, তোমার ফ্রেন্ড চলে এসেছে।"

ফাতিমা বললো, "এত তাড়াতাড়ি কীভাবে আসলি? রাস্তায় জ্যাম ছিলো না মনে হয়, তাই না?"

"হুম।" সামিরার উত্তর।

"কিন্তু তুমি ওকে চিনলে কী করে?" আমাকে লক্ষ্য করে ফাতিমার প্রশ্ন। আমি বললাম, "আমি চিনিনি। তোমার ফ্রেন্ডই আমাকে চিনেছে। ফেসবুকে নাকি আমার আর তোমার ছবি দেখেছে।"

একথা শুনে ফাতিমা বললো, "ও আচ্ছা। সামিরা, এদিকে আয়। পাশে এসে বস। আদনান, তুমি সামনের চেয়ারে বসতে পারো অথবা আমার এই পাশে আসতে পারো।" আমি উত্তর দিলাম, "আচ্ছা, সামনেই বসছি।"

ওদিকে সামিরা ফাতিমার পাশে বসতে না বসতেই বলে বসলো, "তোর অভ্যাস আর গেলো না! সারাদিন খালি পড়াশোনা আর পড়াশোনা। এই অভ্যাস তোর কবে যাবে? আমার মনে হয় যাবে না! তো কী পড়ছিস দেখি?"

ফাতিমা বললো, "এই তো পূর্ববর্তী সময়ের কিছু রোগ যেমন, Plague, Small Pox ইত্যাদির ইতিহাস পড়ছি। এখানে যা দেখলাম, ওই সময়ে এই রোগগুলোর কোনো ট্রিটমেন্ট ছিলো না। তাই এই রোগ হলে মৃত্যু অবধারিত।[১] কী কী কারণে এই রোগ হতো, তারা কীভাবে এগুলোর মোকাবেলা করতো ইত্যাদি বিষয়গুলো পড়ে দেখছি। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, সেদিন একটি ওয়েবসাইটে দেখলাম, শুধুমাত্র ১৪ শতকেই পৃথিবীতে প্রায় ৭৫ মিলিয়ন মানুষ Plague রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে।[২] এটা কিন্তু একটা ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অব পিপল! এমনকি ট্রিটমেন্ট বের হবার পরেও ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালে বিশ্বে মোট ১২৫০৩ জন প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৮৪৩ জনই মারা গিয়েছে এবং এর মধ্যে আফ্রিকারই ৯৭.৬ পার্সেন্ট।[৩] এমনকি এই বছরের সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরেই মাদাগাস্কারে প্লেগের মহামারি দেখা দিয়েছে।"[৩.১] সামিরা বললো, "হুম, সত্যিই দুঃখজনক! আচ্ছা ফাতিমা, একটা প্রশ্নের উত্তর

দে। কেউ যদি এই প্রচুর সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়, তাহলে কি আমরা তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারি কিংবা তাকে কি আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী বলতে পারি? অথবা তাকে কি আমরা ব্যক্তি হিসেবে অমানবিক বলতে পারি?"

আমি সাথে সাথে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, অবশ্যই সে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী! সে অবশ্যই দোষী এবং অমানবিক ব্যক্তি! তাকে হিটলারের উপাধি দেওয়া উচিত!"

আমার উত্তর শুনে সামিরা বললো, "এক্স্যাক্টলি এটাই একটা সাধারণ সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের চিন্তা। কিন্তু মোহাম্মদ তো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ছিলো না। এজন্যে সে এই বিশাল পরিমাণ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। তাই প্লেগে এই বিপুল পরিমাণ মানুষের মৃত্যুর জন্য এক হিসেবে মোহাম্মদও দায়ী ছিলো। এ কারণে সে একজন অমানবিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি। এবং যেহেতু সে ইসলাম ধর্মের নবী, সেহেতু ইসলামও একটি বর্বর ধর্ম!"

সামিরার এই কথা শুনে আমার চোখ দু'টি ডাবের মতো হওয়ার উপক্রম। চিন্তা করলাম যে, হায়! হায়! সম্পূর্ণ কথা না শুনে কী স্টেটমেন্ট দিলাম? ফাতিমার দিকে তাকাতেই মনে হলো সে-ও কিছুটা বিরক্তি বোধ করেছে সামিরার কথা শুনে। ফাতিমা তখন সামিরার দিকে ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করলো, "সামিরা, তুই কি এগুলো বলতেই আমার সাথে দেখা করতে এসেছিস?"

মাঝ থেকে আমি বললাম, "ফাতিমা, এটা লাইব্রেরি। এখানে এত জোরে কথা বলা যাবে না। তোমরা যদি এসব বিষয়ে কথা বলতেই চাও, তাহলে চলো বাইরে কোনো রেস্টুরেন্টে যাই।"

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা চলো, কোনো রেস্টুরেন্টেই যাই। সামিরার অভিযোগগুলো আমার শোনা দরকার। তুমি গাড়ি বের করতে লাগো। আমি আর সামিরা বইটি জমা দিয়ে আসছি।"

তারপর আমি নিচে এসে গাড়ি বের করতে করতে ওরা নেমে এলো। আমি ওদের গাড়িতে নিয়ে সোজা Chef's Cuisine-এ চলে আসলাম। ফাস্ট ফুডের জন্য এই রেস্টুরেন্টটি ভালোই। গাড়ি থেকে ওদের নামতে বলে বললাম, "তোমরা ভিতরে গিয়ে কী খাবে, সেটা অর্ডার দাও। আমি গাড়ি পার্ক করে আসছি।"

গাড়ি পার্ক করে এসে ওদের সাথে বসলাম। তারপর কী অর্ডার করেছে জিজ্ঞাসা করলাম।

ফাতিমা বললো, "কোল্ড কফি। আর কিছু না।"

আমি বললাম, "শুধু কফি খাবে? আরো কিছু নাও।"

ফাতিমা বললো,"সামিরাই বলেছে বেশি কিছু খাবে না। আর আমার এখন খাওয়ার মুড নেই! আচ্ছা, কী যেন বলছিলাম?"

আমি উত্তর দিলাম, "তুমি বলছিলে যে, সামিরা কি এই কাজেই তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে কি না।"

ফাতিমা সামিরার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, "ও হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন বল। সামিরা, তুই কি এগুলো বলতেই আমার সাথে দেখা করতে এসেছিস? তুই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো কারণ ছাড়া অমানবিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী বলতে পারিস না। কী জন্যে তোর এমনটা মনে হলো, সেটা প্রমাণসহ বল। প্রমাণ ব্যতীত এভাবে তুই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দোষারোপ করতে পারিস না!"

সামিরা বললো, "না, আমি ঠিক এ কারণে তোর সাথে দেখা করতে আসিনাই। কথায় কথায় উঠেছিলো, তাই বলেছিলাম। আর আমি দোষারোপ কোথায় করলাম? যা সত্যি, তা-ই তো বলেছি। তোদের সহি বোখারি আর মুসলিমে আছে, মোহাম্মদের সময় যখন কোনো স্থানে প্লেগ রোগ মহামারি আকারে প্রকাশ পেতো, তখন সে তাদের হুকুম দিয়েছে যে, ঐ এলাকা থেকে কেউ যেন বাইরে না যায়। আবার ওই এলাকার ভিতরে কেউ যেন না ঢোকে।"[৪]

ফাতিমা বললো, "হুম, তাতে কী সমস্যা?"

সামিরা বললো, "সমস্যা তো আছে। আমি জানি তুই এখন বলবি যে, কোনো এলাকায় যখন Plague মহামারি আকারে প্রকাশ পায়, তখন ওই এলাকায় ঢুকলে তো তাদেরও প্লেগ হবে। অথবা তুই বলতে পারিস যে, যে ব্যক্তি Plague রোগে আক্রান্ত হয় সে যদি এলাকার বাইরে যায়, তাহলে সে তো ওই এলাকাতেও প্লেগ ছড়াবে। তাই তো? আমি কি ঠিক বললাম?"

তখন ফাতিমা বললো, "হুম। এটা তো তিনি ঠিকই বলেছেন।"

তখন সামিরা বললো, "হুম, এতটুকু তো ঠিকই ছিলো। কিন্তু মনে কর, কোনো এলাকায় ১০০০ মানুষ বসবাস করে। সেখানে ২০০ লোক প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে। এটিকে মহামারি হিসেবে ধরা যায়। কিন্তু তুই দ্যাখ, ওই এলাকার ৮০০ লোকেই কিন্তু সুস্থ আছে। তুই এটা জানিস যে, প্লেগ একটি Pandemic Disease। অর্থাৎ, এটি যখন মহামারি আকারে ছড়ায় তখন একটি বিস্তৃত এলাকাসহ আক্রান্ত হয়। এমনকি সম্পূর্ণ দেশও আক্রান্ত হতে পারে। এরকম হয়েছিলো চায়না এবং ইন্ডিয়াতে ১৮৫৫ সালে এবং ১২ মিলিয়ন লোক এতে মারা যায়। একে তৃতীয় প্লেগ প্যানডেমিক বলে।[১] যা-ই হোক, তাহলে এখন এই ৮০০ লোককে যদি মোহাম্মদের আদেশ অনুযায়ী এলাকা ত্যাগ করতে না দেওয়া হয়, তাহলে একসময় ওই ৮০০ জন লোকও প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। এভাবেই অল্প সংখ্যক রোগী প্লেগে আক্রান্ত হলেও মোহাম্মদের আদেশ মানার কারণে অনেক স্থানে সে সংখ্যা কয়েকগুণে গিয়ে দাঁড়ায়। তাহলে এই অতিরিক্ত মানুষের মৃত্যুর কারণে কি আমি মোহাম্মদকে দোষী বলতে পারি না? এখানে আমার দোষ কোথায়?"

আমি চিন্তা করলাম, "তাই তো! এমন বাধ্যবাধকতা কেন দেওয়া হলো?" আমার মাথায় কোনো উত্তরই আসছিলো না। আর আমি এ বিষয়ে তেমন জানিও না। নিচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে জিহ্বায় বারবার কামড় দিতে লাগলাম।

ফাতিমা কিছুক্ষণ পরে একটু কাশি দিয়ে বললো, "আচ্ছা, এই ব্যাপার। ভালোই জেনেছিস দেখছি। তাহলে তোর মতে এই ক্ষেত্রে মানবতার মানদণ্ড হলো, অল্পসংখ্যক লোক যারা প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে তারা তো মারা যাবেই! কিন্তু যে কয়জন আপাতত সুস্থ আছে তাদের বাঁচানো। মানে হলো, অধিক মানুষের বেনিফিটের দিকে লক্ষ রেখে কম সংখ্যক মানুষকে ইগনোর করা। এক্ষেত্রে এটাইতো তোর দৃষ্টিতে মানবতা। তাইতো?"

সামিরা মাথা নেড়ে বললো, "হুম।"

ফাতিমা বললো, "এটাই তোদের প্রবলেম। তোরা হাদিস পড়বি। কিন্তু সেটা বোঝার জন্য পড়বি না। তোরা পড়বি ভুল ধরার জন্য। আর যখন কোনো হাদিস

পেয়ে যাবি, যেটি নিজের স্বল্প বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে জাস্টিফাই করতে পারবি না, তখন অজ্ঞতাবশত ইতিহাসের সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিটিকে দোষারোপ করে বেড়াবি! এগুলোই তোদের কাজ।"

ফাতিমার এই কথা শুনে আমি আগ্রহ সহকারে ফাতিমার দিকে তাকাতেই ও বললো, "সামিরা, তোকে আগে প্লেগ সম্পর্কে কিছু বেসিক জ্ঞান দেই। *Yersenia pestis* নামক একটি ব্যাক্টেরিয়ার কারণে প্লেগ হয়।[৬] এই জীবাণুটি রোডেন্ট বর্গীয় প্রাণী, যেমন-ইঁদুরে বসবাস করে, সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এজন্য এই ইঁদুরকে এই রোগের রিজার্ভার বলা হয়। ইঁদুর থেকে এই ব্যক্টেরিয়া কিছু মাছি জাতীয় প্রাণী যাকে 'Fleas' বলি, যেমন-*Xenopsilla cheopis*-এর মাধ্যমে মানুষের দেহে আসে।[৭] এজন্য 'Fleas'-কে বলা হয় এই রোগের ভেক্টর। এখন প্লেগের ব্যাক্টেরিয়া যখন মানুষকে আক্রমণ করে, তখন একজন মানুষও প্লেগের জীবাণুর জন্য আশ্রয়দাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। তখন তার থেকে আবার অন্য একজন আক্রান্ত হতে পারে। তাই মানুষকে Plague-এর ক্যারিয়ারও বলা হয়।"[৮]

"এক্সকিউজ মি স্যার, আপনাদের কফি।" ওয়েটার বললো। আমি বললাম,"ভাই, একটু পরে একটা লাচ্চি দিয়ে যেও তো।" ছেলেটি একটি হাসি দিয়ে চলে গেলো। ফাতিমা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো, "তাহলে রিজার্ভার, ভেক্টর আর ক্যারিয়ার কাকে বলে বুঝেছিস?"

সামিরা বললো, "হুম, বুঝলাম।"

তখন ফাতিমা-বললো, "আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে একবারেই বুঝেছিস! যা-ই হোক, এখন প্লেগের Source of infection এবং Mode of transmission কীভাবে হয় সেটা জানিস?"সামিরা উত্তর দিলো, "হুম। তোর কথামতো তো সংক্রমিত ইঁদুর, fleas, আর প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তিই Source of infection । আর Mode of transmission জানি না।"

ফাতিমা বললো, "হুম, ঠিক বলেছিস। সাধারণত প্লেগ পাঁচভাবে ট্রান্সমিট হতে পারে। তার মধ্যে একটি হলো, মানুষ থেকে মানুষে। আমাদের আজ এই একটা টাইপই দরকার। বাকিগুলো না হলেও চলবে। তাহলে যেহেতু মানুষ Source of infection, সেহেতু সংক্রমিত মানুষ থেকে সরাসরি তার থুথু, কফ, হাঁচি দিলে

বের হওয়া তরল বা সাধারণ কথোপকথনের মাধ্যমেও প্লেগ ছড়াতে পারে।[৯] তাহলে বুঝতেই পারছিস যে, একটি এলাকায় এই রোগ দেখা দিলে তা মহামারি হতে আর বেশি সময় লাগবে না। বুঝেছিস?"

সামিরা বিরক্তির সুরে বলে উঠলো, "ফাতিমা, তুই মনে হয় আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এদিক সেদিক করে এড়িয়ে যাবার ট্রাই করছিস! এটা অবশ্য তোদের একটা স্ট্র্যাটেজি। কিন্তু আমি আজ তোকে ছাড়ছি না। এগুলো জেনে আমার কোনো লাভ নেই। তুই সরাসরি আমার প্রশ্নের উত্তর দে!"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "শোন সামিরা, আমি যদি তোর প্রশ্নের উত্তর না-ই দিতে পারতাম, তাহলে এখানে বসে বসে শুধু শুধু তোর সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করতাম না! আমি যেগুলো তোকে বলছি, সেগুলো ভালো করে শোন, নাহলে পরে যা বলবো তার কিছুই বুঝবি না। ঠিকাছে?"

পরিস্থিতি আমার কাছে একটু গরম মনে হচ্ছে! তাই সাথে সাথে আমি ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে বললাম, "ফাতিমা, তোমার মনে হয় গলা শুকিয়ে গিয়েছে। এই নাও, পানি খাও।"

ফাতিমা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "খাচ্ছি কোল্ড কফি। গলা শুকাবে কেন? হা হা।"

ওরা দুই জনেই হেসে দিলো। ওরা আমাকে বোকা ভাবুক আর যা ভাবে, ভাবুক। আমি এটাই চেয়েছিলাম যে ওরা দুইজন যেন শান্তভাবে কথা বলে। এখানে আমি অন্তত সফল। নিচের দিকে তাকিয়ে এটাই ভাবছিলাম আর মুচকি হাসছিলাম।

"এই যে, কী চিন্তা করছো? কফি খাও। তাহলে গলা শুকাবে না। সামিরা, আমরা যেন কোথায় ছিলাম?" ফাতিমার প্রশ্ন।সামিরার উত্তর আমিই দিলাম। বললাম যে, "আমরা Modes of transmission-এ ছিলাম।"

ফাতিমা কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বলা শুরু করলো, "আচ্ছা, Plague সাধারণত তিন ধরনের হয়। একটি বুবনিক প্লেগ। অপরটি নিউমোনিক প্লেগ এবং আরেকটি হলো সেপ্টিসেমিক প্লেগ।[১০] এর মধ্যে বুবনিক প্লেগই বেশি হয়। এবং এক্ষেত্রে মানুষ Source of infection নয়। কিন্তু ট্রিটমেন্ট না করলে পরবর্তীতে

নিউমোনিক ও সেপ্টিসেমিক প্লেগ হয়। এখন, যেহেতু সেই সময়ে এই রোগের চিকিৎসা ছিলো না, সেহেতু সেই সময়ে বুবনিক প্লেগ হলেও তা পরে নিউমোনিক প্লেগে রূপ নিতো। সেই ক্ষেত্রে মানুষ প্লেগের Source of Infection । তাহলে এখানে আমাদের মূল ফোকাস থাকবে নিউমোনিক প্লেগের উপর। ওকে? উম... আচ্ছা, এখন তুই বল যে, তুই কি 'Incubation period' এবং 'Exposure' সম্পর্কে কিছু জানিস?"

সামিরা উত্তর দিলো, "না, আমি এই ব্যাপারে কিছু জানি না।"

ফাতিমা বললো, "ঠিকাছে, তাহলে আমিই বলছি। Incubation Period হলো, মনে কর একটি রোগ সংঘটনে সক্ষম একটি জীবাণু আজ তোর শরীরে ঢুকেছে। কিন্তু ওই জীবাণুর কারণে যে রোগ হবে, সেই রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পেলো সাত দিন পরে। তাহলে এই মধ্যবর্তী সাতদিন সময়কে Incubation Period বলা হয়।[১১] প্লেগের বিভিন্ন ভ্যারিয়েশান মিলে এর Incubation Period হলো ১-৭ দিন।[১২] এটা ভালো করে মনে রাখিস। আর মেডিকেল টার্মিনোলজি অনুযায়ী সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে 'Exposure' বলতে বোঝায় যে, একটি এলাকায় সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়লে ওই এলাকার এনভাইরনমেন্টে থাকা। অর্থাৎ, মনে কর মিরপুরে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে যা বাতাসের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। এখন তুই ওই এলাকায় থাকিস। তখন বলা হবে ওই রোগের পরিবেশে তুই 'Exposed' হয়েছিস।[১৩] তোকে কি আমি বুঝাতে পারলাম?"

সামিরা বললো, "হুম, বুঝেছি। তারপর?

ফাতিমা বললো, "এবার তাহলে তোকে তোর প্রশ্নের উত্তর দেই। মনে কর, ঢাকার সাভার এলাকাজুড়ে প্লেগ রোগ মহামারি আকারে প্রকাশ পেয়েছে এবং তার কোনো চিকিৎসাও নেই। একের পর এক উপজেলা আক্রান্ত হয়েই চলেছে। এখন ধর, সাভারে ৫ হাজার মানুষ বসবাস করে। এর মধ্যে ২ হাজার মানুষ অলরেডি আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। বাকি ৩ হাজার জন আপাতদৃষ্টিতে এখনো সুস্থ। কিন্তু এই ৩ হাজার মানুষ কিন্তু সাভারে ওই আক্রান্ত এলাকার পরিবেশে Exposed হয়েছে। তার মানে এদের মধ্যেও ওই এলাকায় Exposed হওয়ার কারণে জীবাণু ঢুকতে পারে। কিন্তু কার শরীরে জীবাণু ঢুকেছে এবং কার শরীরে ঢোকেনি এটা ওই incubation period-এর আগে অর্থাৎ ২-৭ দিনের আগে

বোঝা যাবে না। এখন তোর যুক্তি অনুযায়ী এই ৩ হাজার লোক সাভার থেকে বের হয়ে এর আশেপাশের ২০ টি গ্রামে পালিয়ে গেলো। কিন্তু পালিয়ে যাবার ৪-৫ দিন পরে দেখা গেলো ওই ৩ হাজার লোকের মধ্যে ১ হাজার লোকের প্লেগ দেখা দিলো এবং এরা ওই ২০ টি গ্রামেই অসমভাবে অবস্থান করছে। আলটিমেটলি তখন রেজাল্ট কী হবে? ওই ২০টি গ্রামের পরিবেশও কিন্তু তখন প্লেগের জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হলো। পরবর্তীতে ওই ২০ টি গ্রামের আরো ১০ হাজার মানুষ প্লেগে আক্রান্ত হবে। তোর বুদ্ধি অনুযায়ী যদি এভাবে প্রত্যেক এলাকা থেকে লোকেরা পালিয়ে অন্য এলাকায় আশ্রয় নিতে থাকে, তাহলে প্রত্যেকেই প্লেগের জীবাণুযুক্ত পরিবেশে Exposed হওয়ায় Incubation period অতিক্রমের মধ্যেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে যাবে। এতে করে একসময় পুরো বাংলাদেশ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। তারপর, এটি যেহেতু প্যানডেমিক রোগ, সেহেতু একটি উপমহাদেশও প্লেগে আক্রান্ত হতে পারে। নিশ্চয়ই তখন ফলাফলটি ভালো হবে না। এবার বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কাউকে প্লেগে আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হতে নিষেধ করে ভুল করেছিলেন?"

সামিরা অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। কয়েক মিনিট যাবার পরে ফাতিমা বললো, "কী? এখন তো মুখ থেকে আর কথা বের হবে না। কাউকে দোষারোপ করার আগে ভালোভাবে জিনিসটি জানতে হয়। তারপরে সিদ্ধান্তে আসতে হয়। হুট করে এভাবে না জেনে অপবাদ দিলে হয়তো তোদের মহলে বাহবা পাবি! কিন্তু আমার কাছে না। আর আদনান, তোমার কিন্তু সম্পূর্ণ কথা শুনে তারপর উত্তর দেওয়া উচিত ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে তোমার এই কথা বলা ভুল হয়েছে।"

ফাতিমাকে আবার একটু এক্সাইটেড মনে হচ্ছে। এবার আমি কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, "ওকে, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি তো প্রথমে জানতামই না যে সামিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দোষারোপ করবে! জানলে তো বলতাম না।"

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা যা-ই হোক, আর না করার চেষ্টা করবে। সামিরা, তুই প্লেগে আক্রান্ত এলাকার আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ মানুষকে যে অন্য এলাকায় পালিয়ে যাবার পক্ষে যুক্তি দিলি, সেটা কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবেও ভুল। 'International

Health Regulation' কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী- 'Internationally Quarantinable disease' হলো তিনটি। তারমধ্যে একটি হলো Plague।[১৪] Quarantine বলতে বুঝায়, কোনো ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ 'Incubation Period' পর্যন্ত কোথাও আলাদা করে রাখা। প্লেগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 'Incubation Period' হলো ৭ দিন।[১৫] অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তির ভিতরে প্লেগের জীবাণু থাকে, তাহলে ৭ দিনের মধ্যে প্রকাশ পাবেই। তাই তাকে এই ৭ দিন কোথাও আলাদা করে রাখা হয়। এই পদ্ধতি প্রত্যেক দেশের এয়ারপোর্টে বিদ্যমান। এখন কেউ যদি প্লেগে আক্রান্ত কোনো এলাকা থেকে আমাদের দেশে আসে, তাহলে তাকে এয়ারপোর্টে বা অন্য কোথাও ৬ দিন আলাদা করে রাখা হবে। তার গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। যদি ওই সময়ের মধ্যে তার প্লেগের কোনো উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে তাকে তার দেশে ফেরত পাঠানো হবে। অথবা সুস্থ করে তারপরে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। আর যদি ওই সময়ে প্লেগের কোনো উপসর্গ না পাওয়া যায়, তাহলে তাকে এয়ারপোর্ট থেকে রিলিজ দেওয়া হয়। এটাই 'World Health Organization' এর নির্দেশ।[১৬] তাহলে যে পদ্ধতি প্রত্যেক দেশের এয়ারপোর্টগুলোতে আছে, সেই পদ্ধতির জন্য কোনোদিন তো তোকে সেসব দেশের প্রশাসনকে দায়ী করতে দেখলাম না। তাহলে একই পদ্ধতি ১৪০০ বছর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাস্তবায়ন করলে তুই কেন তাঁকে দোষারোপ করলি? এখানেই তোদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ডবাজি প্রকাশ পায়। হা হা।"

সামিরা এখনো কোনো কথা বলছে না। স্থিরভাবে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। কফির কাপও সামনে পড়ে আছে। দুই-এক চুমুক দিয়েছে মনে হয়। সম্ভবত ও লজ্জা পেয়েছে। একটু পরে ফাতিমা আবার বলা শুরু করলো, "আমি জানি, এর কোনো উত্তর তোর কাছে নেই। ঠিকাছে, তাহলে এতক্ষণের আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, মহামারির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ চিন্তা করেছিলেন বৃহত্তর মানুষের উপকারের কথা। তিনি এটা বুঝেছিলেন যে, কয়েকজন মানুষের বিনিময়ে যদি হাজারো মানুষ বেঁচে যায়, তাহলে সেটাই লাভ। তুইও এটা বলেছিলি যে, অল্প কয়েকজনের বিনিময়ে যদি অধিক সংখ্যক মানুষকে রক্ষা করা যায়, তাহলে সেটাই ভালো এবং সেটাই উত্তম মানবিকতা। তাহলে এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরও মানবিকতাই প্রকাশ পেয়েছে এবং এতে তাঁর কোনো দোষ নেই। বরং এর জন্য তাঁর প্রশংসা করা উচিত। সুতরাং, তিনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তই দিয়েছিলেন। আর যে

মানুষগুলো ওই এলাকায় থেকে মারা গিয়েছে, সেই মানুষগুলোকেও তাদের সবরের জন্য আল্লাহ পরকালে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শহীদদের মর্যাদা দান করবেন।[১৭] এর থেকে বড় পাওয়া আর কী থাকতে পারে? সুতরাং, ইসলাম বর্বর ধর্ম নয়, বরং একটি সুন্দর জীবন ব্যবস্থা। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, শরিয়াহ সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি কথাই আল্লাহ্‌র আদেশেই বের হয়েছে।[১৮] আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে এক নিরক্ষর মানুষ এমন একটি বৈজ্ঞানিক ও মানবিক সিদ্ধান্ত নিজ থেকে দিবে, সেটা ভাবাই যায় না। তাই বলা যায়, তিনি এই নির্দেশ ওহীপ্রাপ্ত হয়েই আমাদের দিয়েছিলেন। অতএব, তাঁর হুকুমই আল্লাহ্‌র হুকুম। সুতরাং, এতে প্রমাণিত হলো যে, তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন সত্য রাসূল। এখন কি তুই তোর ভুল বুঝতে পেরেছিস?"

এতক্ষণ পরে সামিরা মুখ খুললো। একবারে বাকি কফিটুকু শেষ করে বললো, "আচ্ছা আমি তোকে যে কথা বলতে এসেছিলাম সেটা হলো, আমার জার্মানির ভিসা হয়ে গিয়েছে। সামনের মাসে চলে যাবো। আর হয়তো কয়েক বছর পরে দেখা হতে পারে। তাই শেষবারের মতো বিদায় জানাতে এসেছিলাম। ভালো থাকিস।"

এই বলে সামিরা চেয়ার থেকে উঠতে গেলে ফাতিমা বললো, "সামিরা, আমার প্রশ্ন কিন্তু এটা ছিলো না! তুই নিজেই কিন্তু কথা ঘুরালি। আর......"

ফাতিমাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "থাক ফাতিমা, এমনিতেই ও লজ্জিত হয়েছে। আজ আর ডাকার দরকার নেই। ওকে ছেড়ে দাও।"

ফাতিমা বললো, "হুম! তাও ঠিক। আসলে অজ্ঞতাই সব সমস্যার মূল। জ্ঞান হলো আলোর মতো। আমার রব বলেন,

وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আমি বললাম, "এই, ওয়েট...ওয়েট। এই আয়াতের অর্থ আমি জানি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা মিথ্যা তো বিলুপ্ত

হওয়ারই ছিলো।'[১৯]

নামাযের সময় হয়ে যাওয়ায় লাচ্চি আর খেতে পারলাম না আমরা বিল পে করে বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় আসার পথে ফাতিমা জানালা খুলে দিলো। জানালা দিয়ে আযানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। আশেপাশের সকল মসজিদগুলো থেকে একই সাথে আযানের ধ্বনি ভেসে আসায় মনোরম এক তরঙ্গের উদ্ভব হচ্ছে। এজন্যই-মনে হয় ঢাকাকে মসজিদের শহর বলা হয়।

[বিঃদ্রঃ সামিরার সাথে আদনানের এভাবে ফ্রি-মিক্সিং শরী'য়াহ সম্মত নয়। গল্পের চিত্রায়নে এগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে যেহেতু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আদনান এবং ফাতিমা রয়েছে, সেহেতু ছেলে বা মেয়ে যে-ই বিপরীতে থাকুক, একজনের পর্দার জন্য সেটা সমস্যা। এজন্য এগুলোকে নিছক গল্পে হিসেবে পড়ার অনুরোধ।

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তখনের সিদ্ধান্ত মেডিকেল সাইন্স এখন প্র্যাক্টিস করে। কোথাও প্লেগের মহামারি দেখা দিলে সেখানে ট্রিটমেন্ট দিতে যাওয়া নিষেধ একমাত্র কেমোপ্রফাইল্যাক্সিস নেওয়া ছাড়া। আবার কাউকে সেখান থেকে বের হতেও দেওয়া যাবে না। কিন্তু আক্রান্ত লোকদেরকে আইসোলেশন করে রাখার সুবিধা রয়েছে। যাতে তারা অন্য সবার আক্রান্ত হবার কারণ না হয়। সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলার কাছেই। লেখাটিতে যা কিছু ভুল, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে এবং যা কিছু কল্যাণ, সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

♦ [১] *Park's Textbook Of Preventive And Social Medicine* (23rd edition); Chapter: Zoonoses; Page no: 296

♦ [২] https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Death

♦ [৩] WHO (2010); Weekly Epidemiological Record; No. 5 ,06th Feb, 2010

♦ [৩.১] http://www.who.int/csr/don/-02october-2017-plague-madagascar/en/

♦ http://www.who.int/csr/don/-29september-2017-plague-madagascar/en/

♦ [৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬৬৬ ; ই. ফা.- ৫৫৮০, ৫৫৮১, ই. সে.-৫৬০৭, ৫৬০৮

♦ সহিহ বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী); হাদিস নং- ৬৪৮৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন-৬৫০২

♦ [৫] https://en.wikipedia.org/wiki/Third_plague_pandemic

♦ [৬] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8993858

♦ [৭] *Park's Textbook Of Preventive And Social Medicine* (23rd edition); Chapter: Zoonoses; Page no: 293

♦ [৮] *Park's Textbook Of Preventive And Social Medicine* (23rd edition); Chapter: Zoonoses; Page no: 293

♦ [৯] *Park's Textbook Of Preventive And Social Medicine* (23rd edition); Chapter: Zoonoses; Page no: 295

♦ [১০] https://www.healthline.com/health/plague

♦ [১১] https://en.wikipedia.org/wiki/Incubation_period

♦ [১২] http://plague.emedtv.com/plague/plague-incubation-period.html

♦ [১৩] http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exposure

♦ [১৪] Code of Federal Regulations: 1985-1999; Page49-, Section: 61,123
E-Link: https://goo.gl/M39QC6

♦ [১৫] *Park's Textbook Of Preventive And Social Medicine* (23rd edition); Chapter: Zoonoses; Page no: 295

♦ [১৬] Code of Federal Regulations: 1985-1999; Page49-, Section: 61,122

♦ [১৭] https://islamqa.info/en/151904

♦ [১৮] সূরা আন-নাজম (৫৩); আয়াত-৩

♦ [১৯] সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭); আয়াত নং-৮১

দেখা-শোনা-জানার ক্রম: একজন অজ্ঞেয়বাদীর অজ্ঞতা

ফুফাতো ভাই শাহারিয়ার ফোন দিয়েছিলো সকালে। বললো যে, কাল সকালে ওদের ভার্সিটিতে নাকি একটা সিম্পোজিয়াম হবে। সেখানে মানুষের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা হবে। ফাতিমাকে সাথে নিয়ে আমাকে যেতে বললো কিন্তু টিকিট খরচ আমার দেওয়া লাগবে এই শর্তে। আমার টিকিট খরচ শাহারিয়ার দিবে কেন? এমনিতেই ও স্টুডেন্ট এবং আমার ছোটভাই। সম্ভবত টিকিট খরচ বেশি, এইজন্যে আমাকে ডেকেছে। যাতে আমি টিকিট খরচও দিয়ে দেই। কোনো সমস্যায় পড়েছে হয়তো।

অজানা বিষয় জানার জন্য মানুষের মধ্যে আগ্রহ সেই প্রাচীন যুগ থেকে। সেরকমই আগ্রহের একটি বিষয় হচ্ছে, একজন মায়ের গর্ভে কীভাবে ভ্রূণ বেড়ে ওঠে? বিজ্ঞানের এই শাখাকে বলে ভ্রূণবিদ্যা। প্রাচীন যুগ থেকেই বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই বিষয়ে তাঁদের ধারণা শেয়ার করেছেন। এমনকি এই যুগেও অনেক এম্ব্রায়োলজিস্ট তাঁদের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল আমাদের সাথে শেয়ার করছেন। এভাবেই বিজ্ঞানের 'ভ্রূণবিদ্যা' নামের শাখাটি বর্তমানে ভ্রূণ সম্পর্কে আমাদের প্রচুর তথ্য দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই এ ব্যাপারে অজ্ঞ বা খুবই কম জানে। আমি আবার একটু কৌতূহলী ধরনের। এসব বিষয় কেন যেন আমাকে খুব টানে! তাই আমি এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলাম।

কিন্তু ফাতিমাকে রাজি করানো যাবে কি না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না! তবুও

চেষ্টা করতে দোষ কোথায়? দুপুরে বাসায় গিয়ে লাঞ্চ করে রেস্ট নেওয়ার সময় ফাতিমাকে অফার দিলাম আমার সাথে শাহারিয়ারের ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য। যা ভেবেছিলাম তা-ই! সে যেতে রাজি না। অনেক চেষ্টা করেও কাজ হলো না। অবশেষে শেষ টোপ ফেললাম। বললাম, "আমার ফুফাতো বোন প্রাচীকে তো চেনোই। ও একটু এগ্নোস্টিক টাইপের। ঠিক ফুফুর মতো। প্রাচী তো তোমার বয়সী। তাই তুমি ওকে ইসলামের দাওয়াত ভালো দিতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা তো আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন ইসলাম প্রচার করার। তাই না?"

এবার দেখলাম একটু পজিটিভ। বললাম, "তাহলে আমি শাহারিয়ারকে বলে দিলাম আমরা যাবো ইনশা-আল্লাহ?" ফাতিমার সম্মতি পেলাম। এবার আরেক রুমে গিয়ে শাহারিয়ারকে ফোন দিলাম। কাল সেমিনারে আসার সময় যেন প্রাচীকে নিয়ে আসে সেজন্য প্রেশার দিলাম। শাহারিয়ার প্রথমে একটু অসম্মতি প্রকাশ করলেও প্রাচীর টিকিট খরচ আমি দিয়ে দিবো বললে ও রাজী হয়ে গেলো।

পরের দিন সকালে গাড়িতে করে রওনা দিলাম ভার্সিটির উদ্দেশ্যে। এক ঘণ্টা পরে ভার্সিটি চত্বরে পৌঁছে দেখলাম শাহারিয়ার আর প্রাচী গেইটে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। গাড়ি দেখেই চিনে ফেলেছে। হাত দিয়ে থামানোর ইশারা দিলে গেইটে গাড়ি থামালাম। ওদের গাড়িতে উঠিয়ে ভিতরে চলে গেলাম। গাড়ি পার্ক করে টিকিট কাউন্টারে গিয়ে ১৬০০ টাকা দিয়ে চারটি টিকিট কাটলাম। ভালোই ব্যবস্থাপনা দেখছি। টিকিটে প্রত্যেকের নামও লিখে দিচ্ছে। লেকচার গ্যালারির নিচে ওরা দাঁড়িয়ে ছিলো। সেখানে গিয়ে সবাইকে যার যার টিকিট বুঝিয়ে দিলাম।

শাহারিয়ার বললো, "ভাইয়া, আমার টিকিট কাটলে কেন?"

আমি ওর কান মলে দিয়ে বললাম, "হুম, বুঝেছি! এবার ভিতরে চল। আচ্ছা, টিকিটের দাম এত কেন?"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "ভালোই ফর্মালিটি মেইন্টেইন করো দেখছি!"

শাহারিয়ার উত্তর দিলো, "অনুষ্ঠান শেষে লাঞ্চ আছে। এজন্য মনে হয়। আচ্ছা, চলো ভিতরে যাই।"

এবার বুঝলাম শাহারিয়ার কেন এই অনুষ্ঠানে এসেছে। সাধে তো আর দেখতে

ভোম্বল না! স্টুডেন্ট অবস্থায় আমিও তো কম ছিলাম না। যা-ই হোক, কথা বলতে বলতে সবাই গ্যালারিতে চেক পয়েন্টে চলে গেলাম। টিকিট দেখিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। শাহারিয়ার সবাইকে গ্যালারিতে বসার ব্যবস্থা করে দিলো। আমরা চারজন চতুর্থ সারিতে লাইন দিয়ে বসলাম। ফাতিমা আমার ডান পাশে ছিল আর বামে শাহারিয়ার। আর প্রাচী বসলো ফাতিমার পাশে।

কিছুক্ষণ পরে গোল ফ্রেমের চশমা পরে একজন লোক এবং তাঁর পিছনে কিছু লোক এসে গ্যালারির স্পিকার প্যানেলে বসলেন। আমরা সবাই তাঁদের সম্মান দিলাম। গোল চশমা পরা লোকটি সবার মাঝখানে বসলেন। মনে হচ্ছে এই লোকই আজ মূল লেকচার দেবেন।

ঘড়িতে এগারোটা বাজে। কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হলো অনুষ্ঠান। এরপরে সবার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুরু হলো। প্রায় সব কথাই আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিলো। তবুও সব বোঝার ভান করে মাথা নাড়াচ্ছিলাম। স্টুডেন্ট লাইফের অভ্যাস। হে হে। সবার শেষে আসলো সেই গোল চশমা পরা লোকের বক্তৃতার পালা। তিনি মাইক্রোফোন নিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, "সবাই তো অনেক কিছুই বললেন। আমি সহজে আপনাদের কিছু বলার চেষ্টা করি।"

বয়সে এই গ্যালারির সবচেয়ে বয়স্ক তাঁকেই লাগছে। কিন্তু কথা বলছে আপনি আপনি করে। মনে হচ্ছে খুব ভদ্রলোক। ভাবলাম যে, এই স্যারের সহজ বক্তৃতা মনে হয় আগের সবার মতো মাথার উপর দিয়ে যাবে না। এবার একটু নড়েচড়ে বসলাম। অধিক আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করলাম। উনি যা বলছেন, সাথে সাথে আবার প্রোজেক্টরের সাহায্যে স্লাইডে দেখিয়ে দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ শুনে দেখলাম ভালোই লাগছে।

তিনি বলছিলেন, "আপনারা তো সবাই জানেন যে, পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীদের ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জাইগোট তৈরি হয়। এরপরে এতে বিভাজন শুরু হয়। তারপর থেকে মায়ের গর্ভে প্রায় ৯ মাস ভ্রূণে বিভিন্ন অঙ্গ প্রকাশ পেতে থাকে এবং একটি পর্যায়ে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। আজকের আলোচনার বিষয় যেহেতু দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তি নিয়ে, তাই আপনাদের আজ এই দুটি বিষয়েই বলবো। প্রথমে চোখের ব্যাপারে বলি। ভ্রূণে চোখ তৈরি শুরু হয় ২২তম দিনে। চারটি অংশ এখানে অংশগ্রহণ করে। প্রথমটি হলো, নিউরোএক্টোডার্ম। এখান

থেকে তৈরি হয় রেটিনা। যেখানে প্রতিফলিত ছবি কেমিক্যাল সিগন্যাল আকারে ব্রেইনে গেলে আমরা দেখতে পাই। দ্বিতীয়টি হলো, সার্ফেস এক্টোডার্ম। এখান থেকে তৈরি হয় লেন্স। যেখানে আলো পরে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনায় গিয়ে পড়ে। এই দুই অংশের মধ্যে অবস্থিত মেসোডার্ম থেকে আসে চোখের ধমনী এবং শিরা। আর সর্বশেষ নিউরাল ক্রেস্ট থেকে আসে সাদা অংশ, যাকে স্ক্লেরা বলে।[১] চোখের ডেভেলপমেন্ট মূলত ৩ থেকে ১০ সপ্তাহ পর্যন্ত হয়।[২] তারপরেও চোখের স্নায়ুগুলোর ডেভেলপমেন্ট হতে থাকে। তখনও চোখের পাতা বন্ধ থাকে। এজন্য ভ্রূণ কিছুই দেখতে পারে না। পরবর্তীতে ৭ মাসের মধ্যে চোখের পাতা খুলে যায়। তখন ভ্রূণ দেখতে পায়।[৩] জন্মের পরে একটি শিশু কিন্তু তার চোখ দিয়ে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পারে না। বাচ্চার জন্মের পরেও ৬ থেকে ৮ মাস লেগে যায় চোখে পরিষ্কার কোনোকিছু দেখতে।[৪] এখন আপনারা বলুন যে, আপনারা বুঝেছেন কি না।"

সবাই সমস্বরে সম্মতি দিলো। তিনি একটু মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, "আপনাদের একটি গল্প বলি। কোনো এক কলেজের একটি শিক্ষকের পড়ানো কেউ বুঝতো না। কিন্তু শিক্ষক যখন জিজ্ঞাসা করতেন যে তারা বুঝেছে কি না, সবাই বলতো 'জ্বি, স্যার।' কিন্তু ছাত্রের দিকে তাকালে তিনি দেখতেন যে, যে যার কাজে ব্যস্ত। কেউ লেকচার খেয়ালই করছে না। শিক্ষক বুঝতে পারলেন যে, ছাত্ররা তাঁর সাথে মজা নিচ্ছে। যেমন ছাত্র, তেমন শিক্ষক! একদিন লেকচারের ফাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'এই, তোরা নাকি কলেজের বাগানের আম চুরি করেছিস?' ছাত্ররা বললো, 'জ্বি, স্যার।' এরপরে এটা নিয়ে সে কী কাণ্ড!"

স্যারের কৌতুক শুনে গ্যালারির সবাই সশব্দে হাসাহাসি শুরু করলো। ভালো টিচারের বৈশিষ্ট্যই এমন যে, কোনো কঠিন লেকচার দেওয়ার মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের একটু রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করবে। এখানে স্যারও সেই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করলেন। স্যার সবাইকে হাসি থামাতে বলে আবার বলা শুরু করলেন, "এবার শ্রবণশক্তির কথা বলি। মানুষের কানের তিনটি অংশ। বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ এবং অন্তঃকর্ণ। কানের ডেভেলপমেন্ট মূলত ৩ থেকে ১৮ সপ্তাহ পর্যন্ত হয়। ১৮ সপ্তাহে বা প্রায় ৫ মাসে একটি ভ্রূণের কান শব্দ শোনার জন্য উপযোগী হয়। আর ২৫ থেকে ২৬ সপ্তাহ বা ৬ মাসে ভ্রূণটি বাইরের কোনো শব্দে প্রতিক্রিয়া দেখায়।[৫] বাচ্চার জন্মের ১ মাস পরেই সে ভালোভাবে শুনতে পায়।[৬] আপনারা

মনে হয় বুঝতে পারেননি! তাই না?"

সবাই বললো, 'না স্যার, বুঝেছি।"

স্যার হেসে দিয়ে বললেন, "তাহলে আপনারা সেই স্টুডেন্টদের মতো নন। আমি সেটাই বুঝলাম। ধন্যবাদ আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনার জন্য। আপনারা একটি জিনিস কি ভেবে দেখেছেন যে, আমি এতক্ষণ যা কিছু বললাম এবং দেখালাম তার সবটুকুই আপনারা কান দিয়ে শুনেছেন এবং চোখ দিয়ে দেখেছেন? এবং ব্রেইন দিয়ে বুঝতে পেরেছেন। আমাদের এই সিম্পোজিয়ামের একটি উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তার দুটি চোখ এবং দুটি কানের মূল্য বুঝুক। যাদের এই দুটি অঙ্গ নেই, তারা দেখতে বা শুনতে পারে না। তাদের কাছে পৃথিবীটা খুব কষ্টের! তাই সিম্পোজিয়ামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, এখান থেকে প্রাপ্ত অর্থ আমরা তাদের রিহ্যাবিলিটেশনে কাজে লাগাবো।"

আমরা সবাই করতালি দিয়ে তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালাম। স্যার আবার মাইক্রোফোনটি নিয়ে বললেন, "এবার একটি গল্প বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। একবার এক শিক্ষক ক্লাসের ছাত্রদের একটি ব্যাক্টেরিয়ার ছবি এঁকে টেবিলের উপর রাখতে বললেন। যে সবচেয়ে সুন্দর ছবি জমা দেবে, তাকে স্যার পুরষ্কার দেবেন বলে ঘোষণা দিলেন। সবাই ব্যাকটেরিয়ার ছবি এঁকে স্যারকে জমা দিলো। একটি ছেলে সাদা কাগজ জমা দিলো। শিক্ষক এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সেই ছাত্র উত্তর দিলো, 'স্যার আমি ব্যাক্টেরিয়া এঁকেছি ঠিকই, কিন্তু ব্যাক্টেরিয়া তো খালি চোখে দেখা যায় না। তাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।' হা হা হা।"

স্যারের সাথে আমরাও হাসতে থাকলাম। তারপর স্যার বললেন, "সবাই ছেলেটিকে বোকা বললেও আমি কিন্তু ছেলেটিকে জিনিয়াস বলবো।"

এই বলে স্যার সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। এবং যাওয়ার সময় ক্যান্টিনে লাঞ্চ করে যেতে বললেন। আমরা সবাই গ্যালারি থেকে বেরিয়ে ক্যান্টিনে চলে গেলাম। একটি টেবিলে চারজন একসাথে বসলাম। ফাতিমা আমাকে ধন্যবাদ দিলো তাকে-এরকম সুন্দর একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে আসার জন্য। ধন্যবাদটি অবশ্য শাহারিয়ারের পাওয়ার কথা। কিন্তু ক্রেডিটটা

আমিই নিলাম। কিন্তু ভোম্বলটা গড়গড় করে বলে দিলো যে, ফাতিমাকে সে আসতে বলেছে। এর জন্যে আবার আরেকটি ট্রিট চেয়ে বসেছে ফাতিমার কাছে। আমি প্রাচীকে বললাম, "শাহারিয়ারকে খাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলিস না কেন?" প্রাচী উত্তর দিলো, "তাহলে আমি বাড়িতে দুই দিন ওর যন্ত্রণায় আর কোনো খাবারই পাবো না।"

প্রাচীর কথা শুনে ফাতিমা বললো, "আমার ভাইও এমন ছিলো। খাবারের প্রতি আগ্রহ বেশি। আচ্ছা আদনান, তোমাকে আজকে স্যার যে লেকচার দিলেন সেই আলোকে কুরআনের কিছু সৌন্দর্য তুলে ধরবো। স্যার তাঁর লেকচারে বলেছেন, ভ্রূণের কান শব্দ শোনার জন্য উপযুক্ত হয় প্রায় ৫ মাসে এবং চোখ দেখতে উপযোগী হয় প্রায় ৭ মাসে। এবং জন্মের পরেও এক মাসের মধ্যে কান ভালোমতো শুনতে পায় এবং চোখ ভালোভাবে দেখতে পায় ৬ থেকে ৮ মাস পরে। তার মানে মানুষের কান আগে হয়, তারপরে চোখ। আর মানুষ আগে শব্দ শুনতে পায় এবং পরে দেখতে পায়। ঠিক এই ব্যাপারটি কুর'আনেও আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা সাজদাহ এর ৯ নং আয়াতে..."

এটুকু বলতেই প্রাচী ফাতিমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, "ফাতিমা, আমি আম্মুর কাছে তোমার ব্যাপারে জেনেছি। শুনেছি তুমি ভালোই যুক্তি দিয়ে কথা বলো। দুঃখের ব্যাপার হলো, ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তোমরা একেক সময় একেক পদ্ধতি ব্যবহার করো। বর্তমানে তোমরা ইসলামের প্রচারের ধরন একটু চেঞ্জ করেছো। তোমরা বর্তমানে ইসলামকে বিজ্ঞানের সাথে উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করো। তুমি যে বিষয়ে বলতে চাচ্ছো, সে বিষয়ে আমি অনেক আগে থেকেই জানি। কিন্তু আমি প্রমাণ করতে পারবো যে, তোমার যুক্তি ভুল।"

ফাতিমা বললো, "প্রাচী, ইসলামে রয়েছে পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। অর্থনীতি, পরিবার নীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে ইসলাম অন্যান্য সবার দেওয়া নীতির চেয়ে সুন্দর। আর ঠিক এ কারণেই খিলাফাহ চলাকালীন তাঁদের সমৃদ্ধি আকাশচুম্বী ছিলো। আর বৈজ্ঞানিক নিদর্শন সম্বলিত কিছু তথ্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন। সুতরাং

আমরা সেটা বলতেই পারি। আর আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, সেই বিষয়ে তুমি কী জানো? আর আমার কোন যুক্তি ভুল? অবশ্য আমি এখনো কোনো যুক্তি দেইনি। এত ওভার রিঅ্যাক্টিভ হওয়ার তো কিছু নেই।"

প্রাচী বললো, "ওভার রিঅ্যাক্টিভ মোটেও হইনি। তুমি সূরা সাজদা'র ০৯ নং আয়াতের কথা বলবে যে, ওই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লা ভ্রূণকে সুষম করে, তাতে রূহ সঞ্চার করে এবং তাতে দেয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ। যেহেতু এখানে আগে কানের কথা এসেছে এবং পরে চোখের কথা এসেছে, সেহেতু কান আগে হয় আর চোখ পরে হয়। তোমাদের ক্লেইমটা এমন। আর এতেই তোমরা কোরানকে বিজ্ঞানময় বলতে থাকো। কিন্তু এভাবে যদি একটি শব্দের পরে আরেকটি আসলে সেটা তৈরি হওয়ার ক্রম বুঝায়, তাহলে আমি অন্য আয়াত দিয়ে বৈজ্ঞানিক ভুল বের করতে পারবো। যেমন ধরো, কোরানে সূরা নাহলের ৭৮ নং আয়াতে আছে, আল্লা আমাদেরকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছে। এবং আমাদের দিয়েছে কান, চোখ ও হৃদপিণ্ড। এবার তাহলে বলো যে, পরপর থাকার কারণে যদি সৃষ্টির ক্রম বুঝায়, তাহলে এই আয়াত বিজ্ঞানসম্মত থাকে কি না। নিশ্চয়ই তুমি বলবে না যে, বাচ্চা জন্ম হবার পরে চোখ এবং কান হয়। এখানে আরেকটি বৈজ্ঞানিক ভুল হলো, এই আয়াতে বলেছে কান এবং চোখ তৈরি হওয়ার পরে হৃদপিন্ড তৈরি হয়। কিন্তু বিজ্ঞান বলে হৃদপিন্ড ভ্রূণের প্রথম ফাংশানাল অর্গান। এটি ২২ থেকে ২৩ দিনেই পাম্প শুরু করে।[৭] এখন তাহলে বলো যে, কোরান ভুল নাকি তোমার যুক্তি ভুল।"

ফাতিমা মনোযোগ দিয়ে প্রাচীর কথাগুলো শুনছিলো। ওর কথা শেষে ফাতিমা ব্যাগে হাত দিয়ে একটি পকেট কুরআন বের করলো। কুরআনটি খুলতে খুলতে বললো, "প্রাচী, তুমি আসলেই আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম, প্রায় সেটাই বলেছো। এবং এর সাথে কিছু ভুলভ্রান্তি উল্লেখ করেছো। তুমি বলেছো যে, কান ডেভেলপমেন্ট শেষ হয় প্রায় ৫ মাসে এবং চোখ ডেভেলপমেন্ট শেষ হয় ৬-৮ মাসে। যেহেতু কান চোখের আগে ডেভেলপ করে, তাই আমি 'অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ' – এই আয়াত থেকে বৈজ্ঞানিক মিরাকল বলবো। কিন্তু আমি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বলতাম। তুমি এখানে যে শব্দের অনুবাদ চোখ বলেছো, সেই শব্দটি হলো 'আল-আবসার (الْأَبْصَارَ)'। শব্দটি এসেছে 'বাসারুন (بَصَرٌ)' থেকে। এই

শব্দের অর্থ মূলত দৃষ্টি বা দৃষ্টিশক্তি।[৮] আবার যে শব্দটির অনুবাদ কান করেছো, সেই শব্দটি হলো ‘আস-সাম’আ (السَّمْعَ)’। শব্দটি এসেছে ‘সাম’উন (سَمْع)’ থেকে এই শব্দের অর্থ শোনা বা শ্রবণ করা।[৯] অর্থাৎ, কুর’আনে যেখানে সাম’উন এবং বাসারুন শব্দ এসেছে, সেখানে এর অর্থ হবে যথাক্রমে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি। কারণ চোখ ও কান হিসেবে আরবিতে অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়। চোখের আরবি প্রতিশব্দ আ’ঈন (عَيْن)।[১০] এবং কানের আরবি প্রতিশব্দ উযুন (أُذُن)।[১১] যদিও ‘সাম’উন (سَمْع)’ এবং ‘বাসারুন (بَصَر)’ শব্দ দুটি দিয়ে কান ও চোখ মাঝে মাঝে উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু কিছু কিছু ‘আলিম এই শব্দগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ, সাম’উন এবং বাসারুন শব্দের অর্থ হবে যথাক্রমে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি। এগুলো আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে। যা-ই হোক, আমি মিরাকলটা এভাবে বলবো যে, স্যারের কথা মতো মানুষ আগে শ্রবণশক্তি পায় এবং পরে দৃষ্টিশক্তি পায়। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। অতএব, কুরআন এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিই আমাদের জানিয়েছে সেই ১৪০০ বছর আগে। এবার তোমার বাকি ক্লেইমগুলোর যৌক্তিকতা আছে কি না এবং কুরআন ভুল নাকি আমার যুক্তি ভুল, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আগে আমাকে সূরা নাহলের সেই আয়াত দেখতে হবে। কত নম্বর আয়াত বলেছিলে যেন?”

প্রাচী বললো, “সূরা নাহল। চ্যাপ্টার সিক্সটিন অ্যান্ড ভার্স সেভেন্টি এইট। আর সূরা সাজদা। চ্যাপ্টার থার্টি টু অ্যান্ড ভার্স নাইন।”

ফাতিমা মোবাইলে কুরআনের অ্যাপ ওপেন করে সেখান থেকে কিছুক্ষণ আয়াতগুলো দেখে নিলো। তারপর প্রাচীর প্রশ্নের উত্তরে বললো,

“আসলে প্রাচী, এক্ষেত্রে কুরআনও ভুল নয় এবং আমার যুক্তিও ভুল নয়। বরং, তোমার উত্থাপিত প্রশ্নগুলোই অযৌক্তিক। একটি ভাষাকে যখন তুমি অন্য ভাষায় অনুবাদ করবে, তখন অনেক শব্দের মূল অর্থ তুমি সবসময় অনুবাদ দিয়ে প্রকাশ করতে পারবে না।”

“সেটা কেমন?” প্রশ্ন করলো প্রাচী।

ফাতিমা বললো, “আচ্ছা বলছি। প্রথমে সূরা সাজদাহ’র আয়াত নিয়ে

আলোচনা করি। সূরা সাজদাহ'র ৯ নং আয়াতের কয়েক আয়াত আগের অর্থ দেখলে ৯ নং আয়াতে যে পরপর 'শ্রবণশক্তি' এবং 'দৃষ্টিশক্তি' শব্দ ব্যবহারে এদের ক্রমই বুঝানো হয়েছে, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি তোমাকে ৭ থেকে ৯ নং আয়তগুলো পড়ে শোনাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' এই আয়াগুলোতে প্রথমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আদম 'আলাইহিস সালামকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর আদম 'আলাইহিস সালামের বংশধরদের তিনি পুরুষ এবং মহিলার রিপ্রোডাক্টিভ ফ্লুইড তথা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু থেকে তৈরি করেছেন। কারণ পানির নির্যাস বলতে বীর্যের নির্যাস শুক্রাণু এবং ফলিকুলার ফ্লুইডের নির্যাস ডিম্বাণুকে বুঝায়। এখানে 'অতঃপর' শব্দটি আরবি যে শব্দের অনুবাদ সেই শব্দটি হলো ছুম্মা (ثُمَّ)। এটি এমন একটি শব্দ, যার অর্থ এই আয়াতে বিরতির সাথে ক্রম নির্দেশক।[১২][১] তার মানে আদম 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ মাটি দিয়ে তৈরির পরে সময়ের ব্যবধান ছিলো। এবং ক্রমানুযায়ী বংশধরদের পুরুষ এবং মহিলার রিপ্রোডাক্টিভ ফ্লুইড তথা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু থেকে তৈরি করেছেন। এর পরে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ।' এই আয়াতটিও আল্লাহ তা'আলা আবার 'ছুম্মা' শব্দ দিয়ে শুরু করেছেন। অর্থাৎ, এই আয়াতের ঘটনাগুলো আগের আয়াতের ঘটনার পরে কিছুক্ষণ হলেও বিরতিতে সংঘটিত হয় এবং ক্রমানুসারে হয়। এই আয়াতে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি আরবি 'ওয়াও (و)' বা 'এবং' দিয়ে যুক্ত। এই আয়াতের প্রথমে 'সুম্মা' এবং পরে 'ওয়াও' দিয়ে শব্দগুলোর সংযুক্তি এদের সৃষ্টির ক্রমই নির্দেশ করে। বুঝতে পেরেছো?"

প্রাচী উত্তর দিল, "হুম। তারপর?"

ফাতিমা বললো, "ব্যাপারটি এমন যে, একজন বললো, 'আমি ফুটবল খেলতে যাবো। তারপর আমি ক্রিকেট খেলবো। তারপর আমি বাসায় এসে ফ্রেশ হবো,

[১] 'ছুম্মা' শব্দটির আরো কিছু অর্থ আছে। যেমন- একই সাথে, উপরন্তু, তারপর ইত্যাদি। এই আয়াতে গল্পে উল্লেখিত অর্থই গ্রহণযোগ্য

খাবো, পড়তে বসবো।' এখানে ফ্রেশ হওয়া, খাওয়া, পড়তে বসা ইত্যাদি প্রত্যেকটি ঘটনাই ক্রমানুসারে সে করবে কারণ সে বাক্যের আগে 'তারপর' শব্দটি যুক্ত করেছে। ছেলেটি যদি প্রত্যেকটি কাজের কথা বলার আগে 'তারপর' শব্দটি যুক্ত করত, তাহলে তার বক্তব্যের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেত। যেমন- 'রেলের ওপর দিয়ে চলে যে গাড়ি, সেই গাড়িতে ভ্রমণ আরামদায়ক।' এ কথা যদি আমরা বলি 'রেলগাড়িতে ভ্রমণ আরামদায়ক' তাহলে বাক্যটি একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ত হলো, আবার অন্যদিকে শ্রুতিমধুরও হয়। অল্প কথায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা একটি বিশেষ গুণ। আর আল্লাহ'র কুরআনের এই গুণ তো প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায়ই দেখা যায়। অতএব, ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলাও অল্প শব্দেই ব্যাপক অর্থ বুঝিয়েছেন। সুতরাং, এই আয়াত দিয়ে আমি কুরআনের বৈজ্ঞানিক মিরাকল প্রচার করতেই পারি। যেই ঘটনা মানুষ গত শতাব্দীতে জেনেছে, কুরআন আমাদের সেই ঘটনার ইঙ্গিত ১৪০০ বছর আগে দিয়েছে। আল্লাহু আকবার! প্রাচী, তোমাকে কি বুঝাতে পারলাম?"

ফাতিমার এক্সপ্লানেশান আমার কাছে অস্থির লেগেছে। আর কুরআনের ভাষা শৈলীও মাশা-আল্লাহ। অল্প কথায় আল্লাহ তা'আলা কত কিছুই না বুঝিয়েছেন! সুবহানাল্লাহ। এরই মধ্যে প্রাচী বললো,

"ঠিকাছে, তুমি তো তোমার যুক্তি যে ঠিক; সেটা প্রমাণ করলে। কিন্তু তাহলে কিন্তু সূরা নাহলের আয়াতটি অনুযায়ী কুরআন ভুল হয়ে যায়। ওখানে তো বলা হয়েছে কান এবং চোখ মায়ের গর্ভ থেকে বের হওয়ার পরে ডেভেলপ হয়। এবার কী বলবে?"

ফাতিমা বললো, "সূরা নাহলে তুমি যেই শব্দের অনুবাদ কান এবং চোখ বলেছো, সেই শব্দের অনুবাদ শুধু কান এবং চোখেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে,এই আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা সাম'উন এবং বাসারুন শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং অনেক তাফসিরকারকদের মতে এই আয়াতে শব্দদুটি দ্বারা উদ্দেশ্য যথাক্রমে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা তো কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।' এখন এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিন্তু 'ছুম্মা' বা 'অতঃপর'

শব্দটি ব্যবহার করেননি। এখানে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ তা'আলা একই আয়াতে আমাদের প্রতি একটির পরে আরেকটি অনুগ্রহ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, এই আয়াতে ঘটনাগুলো ক্রম নির্দেশ করে না।

ওয়াও ফাতিমা, খুব সুন্দর ব্যাখ্যা। প্রাচী, এত কম জ্ঞান নিয়ে তুই কুরআনের ভুল ধরতে যাস? আফসোস হয় তোদের দেখলে রে! এদিকে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখি শাহারিয়ার নেই। কখন যে উঠে গিয়েছে দেখিনি। আমি তো মনোযোগ দিয়ে ফাতিমা আর প্রাচীর বিতর্ক শুনছিলাম। দূরে তাকিয়ে দেখি শাহারিয়ার নিজেই খাবার নিয়ে আসছে। মনে হয় আমাদের বকবকানি ওর ভালো লাগছিলো না। খাদ্য প্রিয় মানুষ, খাবারের খোঁজেই গিয়েছে। কাছে এসে বললো,

-'তোমাদের কথাবার্তা শেষ হয়েছে?'

-'না, শেষ হয়নি। আর তুই তোর একার খাবার নিয়ে এসেছিস? অথচ আমরা এখানে কয়েকজন মানুষ না খেয়ে আছি!'

-'তোমাদের কথা কখন শেষ হয় তার ঠিক নেই! আমি ততক্ষণ ওয়েট করতে পারলাম না। স্যরি!'

-'ইটস ওকে। আচ্ছা, তুই এখানে বসে খেতে থাক।'

শাহারিয়ার আমার পাশের চেয়ারে বসে খাওয়া শুরু করলো। আমি আবার ওদের তর্কে মনোযোগ দিলাম।

প্রাচীকে অবজ্ঞার সুরে বলতে শুনলাম, "এখনো তো মূল প্যাঁচই বাকি। আমি জানতাম তুমি এভাবেই আমার একটি প্রশ্ন এস্কেইপ করবে। এসব তর্কে আমি এক্সপার্ট। সুতরাং, আমি বুঝি কে কোথায় চালাকি করতে পারে। তুমি এখানে একটি চালাকি করেছো!"

প্রাচী বারবার ফাতিমার কাছে হেরেও ভালোই নিজের স্মার্টনেস দেখাচ্ছে। ফাতিমা চাইলেই ওকে অপমান করতে পারতো। কিন্তু ও তেমন না। আমি হলে এতক্ষণে প্রাচীর খবর ছিলো। অজ্ঞ মানুষ বিদ্যার বড়াই দেখালে আমার বিরক্তি লাগে।

বোতলের পানিতে গলা ভিজিয়ে প্রাচীকে ফাতিমা বললো, "তো, কী চালাকি করলাম? হয়তো তোমার কিছু প্রশ্ন আমি ভুলে গিয়ে থাকতে পারি। মনে করিয়ে দাও। তাহলেই উত্তর দিবো, ইনশা-আল্লাহ।"

প্রাচী বললো, "সূরা নাহলের ৭৮ নম্বর আয়াতে তো শেষে হৃদপিণ্ড আছে। তুমি তো সেটাকে অন্তর বলে কাটিয়ে গেলে! যদিও শ্রবণশক্তির পরে দৃষ্টিশক্তি হয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির পরে তো আর হৃদপিণ্ড হয় না! তাই না?"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "ও, এই ব্যাপার। এখন বুঝলাম, তোমার আসলে আরবি ভাষার জ্ঞান নেই। হয়তো কোনো ব্লগ থেকে লেখাটি পড়েছো এবং অনুবাদ দেখেই কুরআনের ভুল ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো। তুমি সূরা সাজদাহ'র ৯ নং আয়াতের অর্থ বলেছিলে, আল্লাহ ভ্রূণকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তাতে দেন কান, চোখ ও অন্তঃকরণ। আবার 'সূরা নাহল'-এ বলতে গিয়ে তুমি বলেছো যে, কান এবং চোখের পরে হৃদপিণ্ড দেন। কিন্তু দুই সূরাতেই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি হলো 'আল-আফইদাহ (ٱلْأَفْـِٔدَةَ)'। তাহলে তুমি দুই জায়গায় দুই অর্থ কেন বললে?"

প্রাচী উত্তর দিলো, "দুই অর্থই তো আছে। তাহলে আমি তো ইচ্ছামতো ব্যবহার করতেই পারি।"

ফাতিমা বললো, "না, তোমার সেই যোগ্যতা নেই যে তুমি বুঝবে কোথায় কোন অর্থ বুঝানো হয়েছে। তাই যে জানে, তার কাছ থেকে তোমার জেনে নেওয়াই উচিত ছিলো। যা-ই হোক, আমাদের আলোচিত শব্দটি হলো 'আল-আফইদাহ (ٱلْأَفْـِٔدَةَ)'। এই শব্দটি 'ফুয়াদ (فُؤَاد)' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ আবেগী অন্তর, হৃদপিন্ড ইত্যাদি।[১৩] কুরআনের এসব শব্দের মূল অর্থ না বুঝে অনুবাদ পড়লে বিভ্রান্তিতে পড়াই স্বাভাবিক। ফুয়াদের একটি অর্থ হৃদপিন্ড, কিন্তু সবসময় আল্লাহ তা'আলা 'হৃদপিন্ড' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেননি। এক্সাম্পল হিসেবে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নবুয়ত পেলেন, তখন জিবরাঈলকে ('আ) তাঁর প্রকৃত রূপে দেখেছিলেন। তখন তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে যান। কিন্তু তাঁর অন্তর অর্থাৎ, 'ফুয়াদ' তাঁকে অস্বীকার করেনি। অর্থাৎ, তিনি মনে করতে পারতেন যে, হয়তো শয়তান বা জিন দেখেছেন। কিন্তু জিবরাঈলের চেহারা ও দৈহিক বিশালতা দেখে তাঁর অন্তর অর্থাৎ, 'ফুয়াদ' এই চিন্তায় সাড়া দেয়নি।[১৪] তুমি কি শুনছো?"

"হুম, শুনছি। বলতে থাকো।" বলল প্রাচী।

ফাতিমা বললো, "এই ঘটনা সংক্রান্ত আয়াত সূরা নাজমে আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সে যা দেখেছিলো, তার ফুয়াদ তথা অন্তর সেটাকে মিথ্যে মনে করেনি।' আবার কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার যে বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই শ্রবণ, দৃষ্টি এবং ফুয়াদ বা অন্তর সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।'[১৬] এই আয়াতে দেখো প্রথমে বলেছেন জ্ঞানের কথা। জ্ঞান আসলে কী? জ্ঞান হলো, তথ্য, বুদ্ধিবৃত্তি, দক্ষতা যা অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়।[১৭] এই অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাই দেখা, শোনা এবং বুদ্ধির মিশ্রিত রূপ। তারপর বলেছেন, 'নিশ্চয়ই শ্রবণ, দৃষ্টি এবং ফুয়াদ সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো।' এই আয়াতে প্রথমে যেহেতু জ্ঞান অর্জনের উপকরণের কথা বলা হয়েছে এবং পরে সেই উপকরণ বা ইন্দ্রিয় সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, সেহেতু এই আয়াতে 'ফুয়াদ' এর অনুবাদ হৃদপিণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এই আয়াতে ফুয়াদের সঠিক অনুবাদ হবে অন্তর। যা দিয়ে আমরা চিন্তা করি। আবার সূরা নাহলের ৭৮ নং আয়াতেও বলা হয়েছে, জন্মের পরে তো আমরা কিছু জানতাম না। তিনি আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও ফুয়াদ বা অন্তর দিয়েছেন। এখানেও প্রথমে জন্মের পরে আমাদের অজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে এবং কীভাবে আমাদের জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করেছেন, সেটা বলেছেন। সুতরাং, জ্ঞানের সাথে যেহেতু হৃদপিন্ডের সম্পর্ক নেই, তাই এই আয়াতেও 'ফুয়াদ' এর অনুবাদ হৃদপিণ্ড করা যুক্তিযুক্ত নয়। সঠিক অনুবাদ হবে অন্তর। এবার বুঝেছো, কেন আমি সূরা নাহলের ৭৮ এবং সাজদাহ'র ৯ নং আয়াতে ফুয়াদের অর্থ অন্তর বলেছি?"

প্রাচী কোনো কথা বলছে না! কী-ই বা বলবে? ওর আর কোনো অস্ত্র আপাতত নেই। হা হা। ফাতিমা গ্লাসে রাখা পানি দিয়ে গলা ভিজিয়ে আবার বলা শুরু করলো, "প্রাচী, নিচে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকাও। লজ্জার কিছু নেই। কেউ ভুল জানতেই পারে। কিন্তু সত্য জানার পরে গ্রহণ করার সৎ সাহস থাকা দরকার।"

প্রাচী মাথা উঁচু করে ফাতিমার দিকে তাকালে ফাতিমা বললো, "এবার কোনো শিশুর অন্তঃকরণ অর্থাৎ, যার সাহায্যে চিন্তা করে, সেটা কিন্তু ১ বছরেও

ডেভেলপ করে না। বরং, এগুলো শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির পরেই ডেভেলপ করে। সুতরাং, এই আয়াতও বিজ্ঞান অনুযায়ী সঠিক। এবার কি তুমি ভুল স্বীকার করতে প্রস্তুত?"

প্রাচী উত্তর দিলো, "এ বিষয়ে আমি তোমার সাথে অন্যসময়ে কথা বলতে চাই। সময় করে বাসায় ডাকলে এসো প্লিজ। ঠিকাছে?"

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা, ঠিকাছে। তোমার ভার্সিটি ছুটি হলে বোলো। আমি আসবো ইনশা-আল্লাহ। তোমার সাথে একটি ঘটনা শেয়ার করি। আমার এক বোন কানাডায় থাকে। সেখানে ফার্মাসি পড়ছে। ও দেশে আসলে আমি যখন বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তখন ও বলে, 'ওগুলো ডক্টরদের বিষয়। আমার বলা ঠিক হবে না।' ওদের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ করলাম যে, ওরা নিজের লিমিট বোঝে। যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, সেগুলো সোজা বলে দেয় যে, সে জানে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য, আমাদের দেশে অনধিকার চর্চা করার মতো লোকের অভাব নেই। এমন একটি টেন্ডেন্সি এদেশের মানুষ পোষণ করে, যেন সব বিষয়ে তাকে জ্ঞান জাহির করতেই হবে! এই তো সেদিন আদনানের কাছে শুনলাম, ও একটি দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। কিছু লোক নাকি চা খাচ্ছিলো। তখন, একটি কোম্পানির ওয়ার্কার কিছু বেকারির মাল দিতে এসে বসে চায়ের অর্ডার দিলো। দোকানদার উনাকে চিনি বেশি নাকি কম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিয়েছিলো, 'আরে ভাই, আমার কোনো ডায়াবেটিসের চিন্তা নাই। ওসব কোনো রোগ না। সবই ডাক্তারদের টাকা ইনকামের ধান্দা। এমনও রোগ আছে যাতে দিনে ১ কেজি চিনি খাওয়া লাগে!' এই ঘটনা শুনে আমি তো অবাক! আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন পৃথিবীর কোন রোগে দিনে ১ কেজি চিনি খাওয়া লাগে। আমার জানা নেই। আর এটাও জানা নেই যে, এই জাতি কবে এই অভ্যাস ত্যাগ করবে!"

আমি প্রাচীকে বললাম, "প্রাচী, ফাতিমা কী জন্য তোকে কথাগুলো বলেছে, বুঝেছিস?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি।" প্রাচী মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলো।

"আদনান, আমাদের খাবারগুলো প্যাকেট করে নিয়ে আসো। আজ আর

বসবো না। বাসায় চলো।” বললো ফাতিমা। আমি টিকিটগুলো নিয়ে গিয়ে ফাতিমা, প্রাচী আর আমার খাবার নিয়ে এলাম। ওদিকে শাহারিয়ার বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলো। খাবার হাতে নিয়ে ফাতিমা শাহারিয়ারকে ডাক দিয়ে খাবারের প্যাকেটটি দিয়ে বললো, “ট্রিট চেয়েছিলে না? এই নাও।”

তৎক্ষণাৎ ট্রিট পেয়ে শাহারিয়ারের মুখের দিকে যেন তাকানোই যাচ্ছে না। খুশীতে দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! আমি তাহলে আর প্রাচীকে বঞ্চিত করব কেন? আমার প্যাকেটটি প্রাচীকে দিয়ে বললাম, “যা, বাড়ি গিয়ে ফুফুকে নিয়ে খাস।”

ওদের বিদায় দিয়ে আমি আর ফাতিমা গাড়িতে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। গাড়ি নিয়ে শাহারিয়ার আর প্রাচীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফাতিমা হাত নাড়িয়ে বিদায় দিলো। কিন্তু আমি দেখছিলাম প্রাচী বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে তর্জনী চুলকাচ্ছিলো। এটা ওর ছোটবেলার অভ্যাস। আমি জানি যে, আজকের পরাজয়ের প্রতিশোধের উন্মত্ততা এখন তার স্নায়ুতে বয়ে যাচ্ছে। জেদি মেয়ে বলে কথা! হিংসা তো ওর পৈতৃক সূত্রেই প্রাপ্ত সম্পদ।

[ইসলামিক শরী'য়াহ অনুযায়ী কোনো মুসলিমের জন্য তার ফুফাতো বোন এবং কোনো মুসলিমাহ'র জন্য তার ফুফাতো ভাই মাহরাম নয়। আবার দেবর এবং ভাবী একে অপরের মাহরাম নয়। এদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের পর্দা করা ফরজ। এবং কথা বলার সময় হিজাব মেইন্টেইন করা জরুরী। এখানে এগুলো কিছুই হয়নি। এক্ষেত্রেও গল্পটি শুধুমাত্র একটি গল্প হিসেবেই পড়ার অনুরোধ রইলো। সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলার কাছেই। লেখাটিতে যা কিছু ভুল, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে এবং যা কিছু কল্যাণ, তার সবটুকুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

♦ [১] *The Developing Human* by Keith L. Moore and T. V. N. Persaud; 10th edition; page: 417

♦ [২] http://education.med.nyu.edu/course...

♦ [৩] *Larsen's Human Embryology* by Gary C. Schoenwolf, Steven B. Bleyl, Philip R. Brauer, Philippa H. Francis-West; 5th edition; page: 498

♦ [8] https://www.babycenter.com/0_baby-s...

♦ [৫] https://www.healthline.com/health/p...

♦ [৬] https://www.babycenter.com/0_baby-s...

♦ [৭] *The Developing Human* by Keith L. Moore and T. V. N. Persaud; 10th edition; page: 284(CVS)

♦ [৮] *Al-Mawrid*; By Dr. Rohi Baalbaki; Dar As-Salam Publication; Page: 238

♦ [৯] *Al-Mawrid*; By Dr. Rohi Baalbaki; Dar As-Salam Publication; Page: 643

♦ [১০] *Al-Mawrid*; By Dr. Rohi Baalbaki; Dar As-Salam Publication; Page: 789

♦ [১১] *Al-Mawrid*; By Dr. Rohi Baalbaki; Dar As-Salam Publication; Page: 68

♦ [১২] *Al-Mu'jam Al-Waseet;* Volume One; Page: 105

♦ [১৩] *Arabic-English Lexicon;* by Edward William Lane; volume: 06; page: 107,108

♦ [১৪] *তাফসির ইবনে কাছির* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন); খণ্ড: ১০; পৃষ্ঠা: ৫১৪

♦ [১৫] Surah Najm(53); Verse: 11

♦ [১৬] Surah Al Isra(17); Verse: 36

♦ [১৭] According to Merrium Webster Dictionary

মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের প্রতিষেধক

ফাতিমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম রেস্টুরেন্টে। অনেকদিন বাইরে খাওয়া হয় না। তাই ভাবলাম একটু পেটকে সান্ত্বনা দিয়ে আসি। আমি কোথাও খেতে গেলে বোনটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। আমার একমাত্র ছোটবোন নাবিলা। ওকে রেখে খেতে ইচ্ছা করে না। ক্লাসে আর টিচারের কাছে যাওয়া ছাড়া বাড়ির বাইরে ও তেমন কোথাও যায় না। তাই আমি আমার সাথে মাঝে মাঝে ওকে এদিক সেদিক নিয়ে যাই। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। নাবিলাকে আর ফাতিমাকে রেডি হতে বলে আমি গাড়ি বের করতে নিচে নেমে গেলাম। গাড়ি বের করে ওদের জন্য ওয়েট করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে ওরা নেমে এলো। আমি ওদের গাড়িতে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় খেতে চাও তোমরা?"

নাবিলা উত্তর দিলো, "ভাইয়া, লেক টেরাসে চলো। ওখানের কম্বো আমার খুব পছন্দের!"

আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার মত কী?"

"ওখানেই চলো। নাবিলার প্রিয় কম্বো আমিও খেয়ে দেখি কেমন লাগে।" ফাতিমা উত্তর দিলো।

সন্ধ্যায় রাস্তায় প্রচুর জ্যাম থাকে। গাড়ি চালানোই তখন কষ্টকর হয়ে যায়। তবুও অনেক কষ্টে গিয়ে পৌঁছলাম। আর যা-ই হোক, উত্তরায় রেস্টুরেন্টগুলোর মধ্যে লেক টেরাসের পরিবেশ তুলনামূলক সুন্দর। গাড়ি রেখে ভিতরে গিয়ে একটি টেবিলে ৩ জন বসলাম। অর্ডার সব নাবিলা আর ফাতিমা দিলো। আমি শুধু ফালুদা অ্যাড করলাম। অর্ডার দিয়ে সামনে তাকাতেই দেখি একটি ছেলে আমার দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে। আমি প্রথম দেখাতেই চিনে ফেললাম। ওর নাম সানিন। বিদেশে পড়তে যাবার আগে ওর সাথেই দিনের বেশিরভাগ সময় থাকতাম। আমার হৃদয়ে সংশয়ের যে বীজ আমি বুনেছিলাম, সেটার কিছুটা ওর জন্যেই। ঈমান আনার পরে ওর সাথে আমার চলাফেরা কম হয়। প্রায় ৫ মাস আগে একটি প্রোগ্রামে দেখা হয়েছিল। তারপরে আর যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু দেখা হলেই সানিন আমাকে বিভিন্নভাবে খোঁটা মারে। তাই ফাতিমার সামনে ওর সাথে কথা বলতেও ইচ্ছা হলো না। এজন্য আমি চোখ নামিয়ে নাবিলা আর ফাতিমার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে লাগলাম।

আমি ভেবেছিলাম দাড়ি রেখে এখন তো আমার চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। হয়তো সানিন আমাকে না-ও চিনতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সানিন আমাদের টেবিলের পাশে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "কীরে আদনান, দেখেও না দেখার ভান করলি?"

আমি তো পড়লাম বিপদে! উত্তর দিলাম, "তুই কি মাইন্ড রিডার নাকি?"

সানিন বললো, "না, তা-ই মনে হলো।"

আমি বললাম, "তোর মনে হলে আমার কী করার? যা-ই হোক, বোস!"

সানিন বললো, "হ্যাঁ, বসতেই তো এসেছি।"

সানিন আমার পাশে এসে বসলো। আমি বললাম, "তোদের পার্টি আছে মনে হয়। তাই না?"

"হ্যাঁ। আসিফের জন্মদিন। তাই ও আমাদের ট্রিট দিচ্ছে। আর আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কেক কাটবো। এই আরকি!" উত্তর দিলো সানিন।

আমি ফাতিমা আর নাবিলার সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ওরা চুপ করে

শুনলো কিন্তু কোনো কথা বললো না। সানিন জিজ্ঞাসা করলো, "কেমন আছো তোমরা?"

নাবিলা উত্তর দিলো, "আলহামদুলিল্লাহ্। ভালো আছি, ভাইয়া।"

সানিন বললো, "হ্যাঁ, ভালো থাকলেই ভালো। পৃথিবীর সকল মানুষ ভালো থাকুক। সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।"

তারপরে সানিন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আদনান, তোর নানা বাড়ি তো আমাদের বাসার প্রায় পাশেই। আম্মুর কাছে শুনলাম তোর নানাকে নাকি ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের জন্যে লন্ডন নিয়ে গিয়েছে? কয়েকদিন আগে তো শুনলাম হার্টে রিং বসিয়েছিলো। তো এখন কী অবস্থা তার?

আমি বললাম, "হ্যাঁ, মামারা নিয়ে গিয়েছেন। আছে ভালোই, আলহামদুলিল্লাহ্। ট্রিটমেন্ট হিসেবে কেমোথেরাপি দিচ্ছে। দেখা যাক, কী হয়!"

"সানিন ভাই, কেক তো এনেছো। কিন্তু কেক কাটার জন্য ছুরি তো নিয়ে আসোনাই। এখন কেক কাটবে কী দিয়ে?" সামনের টেবিল থেকে একটি ছেলে এসে সানিনকে বললো।

সানিন পিছনের দিকে ফিরে উত্তর দিলো, "আরে এটার জন্যও আমার কাছে আসা লাগে? যা, নিচে গিয়ে নিলুর দোকান থেকে আমার কথা বলে নিয়ে আয়।"

ছেলেটি বললো, "ভাই, নিলুর দোকানে এমনি ছুরি আছে। কিন্তু কেকের জন্য স্পেশাল ছুরি নেই।"

সানিন বললো, "তুই আগে যাবি তো! তাই না? নিলুর দোকানে সবকিছু পাওয়া যায়।"

সানিনের কথা শুনে ছেলেটি চলে গেলো। তারপরে সানিন আবার আমার দিকে ফিরে বসলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, "আদনান, কী যেন বলছিলাম?"

আমি উত্তর দিলাম, "আমার নানার অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি!"

সানিন ব্যাঙ্গ করে বললো, "ও হ্যাঁ। তো এতগুলো টাকা খরচ করে লন্ডন নিয়ে

শুনলো কিন্তু কোনো কথা বললো না। সানিন জিজ্ঞাসা করলো, "কেমন আছো তোমরা?"

নাবিলা উত্তর দিলো, "আলহামদুলিল্লাহ্। ভালো আছি, ভাইয়া।"

সানিন বললো, "হ্যাঁ, ভালো থাকলেই ভালো। পৃথিবীর সকল মানুষ ভালো থাকুক। সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।"

তারপরে সানিন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আদনান, তোর নানা বাড়ি তো আমাদের বাসার প্রায় পাশেই। আম্মুর কাছে শুনলাম তোর নানাকে নাকি ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের জন্যে লন্ডন নিয়ে গিয়েছে? কয়েকদিন আগে তো শুনলাম হার্টে রিং বসিয়েছিলো। তো এখন কী অবস্থা তার?

আমি বললাম, "হ্যাঁ, মামারা নিয়ে গিয়েছেন। আছে ভালোই, আলহামদুলিল্লাহ্। ট্রিটমেন্ট হিসেবে কেমোথেরাপি দিচ্ছে। দেখা যাক, কী হয়!"

"সানিন ভাই, কেক তো এনেছো। কিন্তু কেক কাটার জন্য ছুরি তো নিয়ে আসোনাই। এখন কেক কাটবে কী দিয়ে?" সামনের টেবিল থেকে একটি ছেলে এসে সানিনকে বললো।

সানিন পিছনের দিকে ফিরে উত্তর দিলো, "আরে এটার জন্যও আমার কাছে আসা লাগে? যা, নিচে গিয়ে নিলুর দোকান থেকে আমার কথা বলে নিয়ে আয়।"

ছেলেটি বললো, "ভাই, নিলুর দোকানে এমনি ছুরি আছে। কিন্তু কেকের জন্য স্পেশাল ছুরি নেই।"

সানিন বললো, "তুই আগে যাবি তো! তাই না? নিলুর দোকানে সবকিছু পাওয়া যায়।"

সানিনের কথা শুনে ছেলেটি চলে গেলো। তারপরে সানিন আবার আমার দিকে ফিরে বসলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, "আদনান, কী যেন বলছিলাম?"

আমি উত্তর দিলাম, "আমার নানার অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি!"

সানিন ব্যাঙ্গ করে বললো, "ও হ্যাঁ। তো এতগুলো টাকা খরচ করে লন্ডন নিয়ে

গেলি কেন? ঘরে বসিয়ে কালোজিরা খাওয়ালেই তো হতো। তাহলেই তো সব রোগ ভালো হয়ে যেত!"

সানিনের কথা শুনে আমার এত রাগ হলো যে, মুখে উষ্ণতা অনুভব করছিলাম। আমি ওর এখানে আসাতেই ধারণা করেছিলাম যে, আজও নিশ্চয়ই কোনো বিষয়ে খোঁটা দিবে। আমি বললাম, "বুঝলাম না। কী বলতে চাচ্ছিস তুই?"

সানিন বললো, "আরে রাগছিস কেন? তোরাই তো তোদের নবীর সুন্নত মানিস। মোহাম্মাদ তো বলেছেই যে, কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। তোর নানার যেহেতু ক্যান্সার এবং সাথে হার্টের রোগ আছে, সেহেতু কালোজিরা খেলেই তো আর কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না।"

আমি বললাম, "ইসলাম তো চিকিৎসা করাতে নিষেধ করে না। বরং আরও উদ্বুদ্ধ করে। আধুনিক চিকিৎসা করাতেও নিষেধ নেই।[১] তাহলে ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে কী সমস্যা?"

সানিন বললো, "আহা! আমি তো চিকিৎসা করাতে নিষেধ করিনি। আমি কালোজিরা দিয়ে চিকিৎসা করাতে বলেছি। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার ঔষধই দিবে। কালোজিরা যেহেতু সকল রোগের ঔষধ, তাই কালোজিরাতেও ক্যান্সার ঠিক হবার কথা। তাই না? হা হা। আমি এখন এখানে মোহাম্মদের ভুলগুলো বলছি। মনোযোগ দিয়ে শোন। কিছু বিপরীতধর্মী রোগ আছে। যেমন, উচ্চ-রক্তচাপ এবং নিম্ন-রক্তচাপ। এরা একে অপরের বিপরীত অবস্থা। উচ্চ-রক্তচাপে এমন ঔষধ দেওয়া হয় যা ব্লাড প্রেশার কমায়। এদের বলা হয় অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ড্রাগ। উল্টোদিকে নিম্ন-রক্তচাপে এমন ঔষধ দেওয়া হয় যা ব্লাড প্রেশার বাড়ায়। এদের বলা হয় অ্যান্টি-হাইপোটেনসিভ ড্রাগ। উচ্চ-রক্তচাপ আছে, এমন ব্যক্তিকে যদি অ্যান্টি-হাইপোটেনসিভ ড্রাগ দেওয়া হয়, তাহলে তার প্রেশার আরও বৃদ্ধি পেয়ে হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিসে ভুগবে। একইভাবে নিম্ন-রক্তচাপ আছে, এমন ব্যক্তিকে যদি অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ড্রাগ দেওয়া হয়, তবে তার প্রেশার ক্রমশ নেমে Shock-এ চলে যেতে পারে। এভাবে ডায়রিয়া-কোষ্ঠকাঠিন্য, হাইপোথাইরয়ডিজম-হাইপারথাইরয়ডিজম ইত্যাদি সহ পরস্পর বিপরীতধর্মী সকল অসুখের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং, একই ঔষধ কখনো পরস্পর বিপরীতধর্মী উভয় অসুখে ব্যবহার করা যাবে না। এই সূত্র

অনুযায়ী, কালোজিরাসহ যেকোনো কিছুই একই সাথে পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটো অসুখে ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং 'মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ কালোজিরা' – নবী মোহাম্মদের এমন দাবি সম্পূর্ণই ভুয়া।"

ফাতিমা আমাকে বললো, "আদনান, আমি কি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারি?"

আমি বললাম, "অবশ্যই পারো। আমি আর কী বলবো? তুমিই বলো।"

ফাতিমা সানিনকে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা ভাইয়া, আপনি একটু আগে একটা ছেলেকে কেকের জন্য ছুরি কেনার জন্য নিচে একটি দোকানে পাঠাতে গিয়ে বলেছেন – 'ঐ দোকানে সব কিছু পাওয়া যায়।' তাই না?

"হ্যাঁ, বলেছি।" সানিন উত্তর দিলো।

ফাতিমা বললো, "আমি যদি এই দোকানে স্ট্রবেরি কিনতে যাই, তাহলে কি পাবো?"

"না। কারণ, এটা মুদি দোকান। এখানে প্রায় অনেক কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু স্ট্রবেরি তো রেয়ার ফল। তাই পাবে না। কিন্তু আপেল, কমলা, আঙুর সহ আরও কিছু ফল পেতে পারো। কেন? কিনবে নাকি? কিনলে বলো। আমি কম দামে এনে দিতে পারবো।" সানিনের উত্তর।

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "না, কিনবো না। ধন্যবাদ। কিন্তু তাহলে ভাইয়া, আপনি একটু আগে কেন বললেন যে, ঐ দোকানে সব কিছু পাওয়া যায়?"

"নীলুর দোকানে হরেক রকমের জিনিস পাওয়া যায়। এটা বোঝাতেই তখন বলেছি যে, ওর দোকানে সব পাওয়া যায়। কিন্তু এই কথাকে এভাবে ধরে বসার কারণ কী?" সানিন উত্তর দিলো।

ফাতিমা বললো, "ধরার কারণ আছে। আচ্ছা আপনি কি কখনো হকারের কাছ থেকে লাল লাল ট্যাবলেট কিনেছেন? যেটা ওরা সব রোগের ঔষধ বলে বিক্রি করে!"

সানিন বললো, "হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার থেকে ওদের থেকে ঔষধ

নিলেই ভালো। ভিজিটও লাগে না। আর ঐ ট্যাবলেট খেলেই সর্দি, কাশি, মাথাব্যথা সব জাদুর মতো ঠিক হয়ে যায়।"

আমি সানিনের কথায় হেসে দিলাম। এমন মানুষ এখনো ঢাকা শহরে বাস করে যে, হকার থেকে ঔষধ নিয়ে খায় – এটা মানতে কষ্ট হচ্ছিলো।

ফাতিমাও হেসে দিয়ে বললো, "হ্যাঁ, একদিক থেকে ভালোই হয়। ডাক্তারের ভিজিট লাগে না। কিন্তু অন্যদিকে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে আপনার দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের শরীরে যখন কোনো জীবাণু প্রবেশ করে, তখন আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। তখন সর্দি, কাশি বা জ্বর আসতে পারে। আপনি যে লাল ট্যাবলেটগুলো মেডিসিন হিসেবে ব্যবহার করেন, সেগুলোতে স্টেরয়েড নামক একটি পদার্থ থাকে। এটি আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ঘটনাগুলো বন্ধ করে দেয়। এজন্য আপনার সর্দি, কাশি হয় না। আর এটি ব্যথা সৃষ্টিকারী একটি কেমিক্যাল বা প্রোস্টাগ্লান্ডিনের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এজন্য আপনি ব্যথাও অনুভব করেন না। জীবাণুর প্রতি আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এমন প্রতিক্রিয়ার কারণে অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। তখন স্টেরয়েড দিয়ে এই প্রতিক্রিয়া বন্ধ করে দিলে অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এজন্য ডাক্তাররা অনেক রোগের লাস্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হিসেবে স্টেরয়েড ব্যবহার করেন। প্রথমে ব্যবহার করেন না। কারণ স্টেরয়েড বহুদিন ব্যবহারে আমাদের দেহের প্রচুর ক্ষতি হয়। যেহেতু এটি প্রচুর রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাই একেও সকল রোগের ঔষধ বলে চালানো হয়।[২] কিন্তু তাই বলে পৃথিবীতে যত রোগ আছে, স্টেরয়েড যে সব ঠিক করে দিবে এমন নয়। স্টেরয়েডের কার্যক্ষমতার আধিক্যের কারণেই এমন বলা হয়। বুঝেছেন?"

সানিন বললো, "ওসব বুঝে আমি কী করবো?"

ফাতিমা বললো, "এগুলো না বুঝলে পরে যা বলবো, সেটাও বুঝবেন না। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনাকে আমি 'সব' শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছি। আমি স্কুলে পড়ার সময় ক্লাসের একটি মেয়ে ম্যাথ ভাল পারতো। আরেকটি মেয়ে আমার কাছে যখন আসতো ম্যাথ বুঝতে, তখন আমি ওই মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতাম এই বলে যে, 'ওর কাছে যা, ও সব পারে।' এর মানে এটা না যে ওই মেয়েটা সব ক্লাসের সব ম্যাথ পারে। আমরা 'সব' শব্দটি দিয়ে সবসময়

‘সকল’ বুঝাই না। অনেকসময় ‘অধিকাংশ’ বা ‘আধিক্য’ বুঝাতেও ব্যবহার করি। বুঝেছেন?”

“হ্যাঁ। এখানে তো আমার কোনো সমস্যা নেই।” সানিন বললো।

ফাতিমা বললো, “আমি তো বলিনি এখানে আপনার সমস্যা আছে। আপনার যেখানে সমস্যা আছে, সেটা আমি এখন বলছি। আপনি একটু আগে আদনানকে ওর নানার চিকিৎসা করতে কালোজিরা সাজেস্ট করেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কালোজিরা সকল রোগের ঔষধ, মৃত্যু ব্যতীত।[৩] এখানে ‘সকল’ শব্দটি আরবি যে শব্দের অনুবাদ, সেটি হলো কুল্লুন (كُلٌّ)। প্রখ্যাত অ্যারাবিক ডিকশনারি *লিসান আল আরব*-এ আছে যে, ‘কুল্লুন (كُلٌّ)’ শব্দটির অর্থ ‘সকল’ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ‘কিছু’ অর্থাৎ ‘مَعْنَى الْبَعْضِ’।[৪] আবার *আল-ফিকহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ* নামক একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, এখানে ‘কুল্লুন’ শব্দটি ‘আধিক্য’ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। সহিহ বুখারির এই হাদিসের টীকায় বলা আছে, যদিও এই হাদিসে ‘مِنْ كُلِّ دَاءٍ’ বা ‘সকল রোগের ঔষধ’ কথাটি ‘ব্যাপক’ কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য ‘খাস’ বা ‘নির্দিষ্ট’।[৫] তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, এই হাদিসে ‘সকল রোগের ঔষধ’ বলতে একদম পৃথিবীতে যত রোগ আছে, সকল রোগের ঔষধের কথা বলা হয়নি বরং নির্দিষ্ট প্রকারের বিভিন্ন রোগের কথা বলা হয়েছে। এটাই ইবনে আল-আরাবী, ইমাম খাত্তাবি আর ইবনুল কায়্যিম প্রমুখ আলিমদের মত।[৫.১] আর কুরআন এবং হাদিসের আমি বা আপনি নিজের মতো করে পড়ে অর্থ বুঝলে হবে না। আমাদের পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ বা সালাফরা যেভাবে বুঝেছেন সেভাবেই বুঝতে হবে। কিন্তু এই কালোজিরা যেহেতু অনেক ধরনের রোগের ঔষধ বা নিরাময়,[৬] সেহেতু জোর দিয়ে বুঝাতে ‘মৃত্যু ব্যতীত’ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ আপনি জানেন যে, মৃত্যু কোনো রোগ নয়।”

আমি ফাতিমার কথায় সায় দিয়ে বললাম, “সানিন, আমাদের বাপ্পি নামের এক ফ্রেন্ড ছিলো। মনে আছে তোর? ও এত পরিমাণ খেতো যে আমরা বলতাম, ‘বাপ্পি পলিথিন বাদে সব খায়।’ কিন্তু আসলে কিন্তু ও লোহা বা খাবারের মধ্যেই অনেক কিছুই খেতো না। কিন্তু তবুও আমরা বলতাম। সুতরাং, আমরা ‘সব’ শব্দটি অনেকসময় আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার করি। এই হাদিসেও ‘কুল্লুন’ শব্দটির অর্থ একদম ডেফিনেটলি ‘সকল’ মনে হয় বুঝায়নি। বুঝলি?”

আমার কথা সানিন মনে হয় কিছু শোনেনি। নিচের দিকে তাকিয়ে মোবাইলে কী যেন দেখছিলো। কিছুক্ষণ পরে ঘাড় উঠিয়ে সানিন বললো, "আচ্ছা, সেটা মানলাম। কিন্তু ইবনে হাজার নামে একজন আলেম আছে শুনেছি। সে বলেছে যে, এখানে সকল রোগের কথাই বলা হয়েছে। আর এটাই নাকি বেশি গ্রহণযোগ্য মত। আমাকে ভুলভাল বুঝালে আমি বুঝে চুপ থাকবো-এমন মানুষ আমি না!"

ফাতিমা বলল, "হ্যাঁ, আপনার কথাও ভুল নয়। এই ব্যাপারে দুই ধরণের মত আছে। একটি আমি একটু আগে বলেছি। আরেকটি হল, এই হাদিসে 'مِن كُلِّ دَاءٍ' বা 'সকল রোগের ঔষধ' বলতে সকল রোগই উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে শুধু কালোজিরা বা এর সাথে অন্য কোন বস্তু মিশিয়ে খাওয়ালে যেকোন রোগই ভালো হয়। কালোজিরার মধ্যে এই গুন আছে। কিন্তু আমরা যেহেতু সেই ঔষধগুলো সম্পর্কেই জানি, যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক। আমরা ব্যবহার করি, এমন অনেক জিনিসের উপকারই আমরা জানি না। এজন্য কি সেসব জিনিসের উপকার নেই? অবশ্যই আছে। তাই কালোজিরার মধ্যেও সকল রোগের নিরাময় রয়েছে। শুধু কীসের সাথে ব্যবহার করতে হবে, কতটুকু কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, এগুলো জানতে হবে। এই হাদিসের এমন ব্যাখ্যার পক্ষে ইবনে হাজার আসকালানি (রহ:), বদরুদ্দিন আল-আঈনী (রহ:), এবং ইবনে তাইমিয়া (রহ:) প্রমুখ আলেমগন।[৫.১] কোন অবস্থানকেই নিরেটভাবে ভুল বলা যায় না। বুঝলেন?

সানিন হাতে তুড়ি মেরে বলল, "এটাই শুনতে চাচ্ছিলাম। এবার বলো যে, কালোজিরা এমন কী জিনিস যে বিপুল পরিমাণ রোগ ভালো হবে? সর্দি-কাশি ছাড়া আর কিছুতো ভালো হয় না।"

ফাতিমা বললো, "আপনি প্রথমেই এই প্রশ্ন করতে পারতেন। তাহলে শুধু শুধু একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে কটু কথা বলা লাগতো না। আর আমার এতগুলো কথা খরচ করাও লাগতো না। আপনি একটু আগে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট কালোজিরা দিয়ে দিতে বলেছেন। তাই প্রথমে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে কালোজিরার উপকারিতা আলোচনা করি। ক্যান্সার বলতে সাধারণত একটি কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন, অন্য কোষে ঢুকে যাওয়া এবং অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া বা মেটাস্ট্যাসিসকে বুঝায়। যদি কোনো উপাদান কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন এবং মেটাস্ট্যাসিস বন্ধ

করে দিতে পারে, তাহলে সেটাই ক্যান্সারের জন্য উপকারী ঔষধ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, কালোজিরাতে থাইমোকুইনোন নামক একটি উপাদান রয়েছে, যেটি একটি ক্যান্সার কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন এবং মেটাস্ট্যাসিস বন্ধ করে। সাথে সাথে এটি এপোপটোসিস প্রক্রিয়ার ক্যান্সার কোষটিকে নষ্ট করতেও সাহায্য করে।[৭] বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে, এই থাইমোকুইনোন এবং এর অনুরূপ কেমিক্যাল ভবিষ্যতে অন্যান্য কেমোথেরাপিক ড্রাগের সাথে তাঁরা ব্যবহার করতে পারবেন।[৮] রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাহলে কালোজিরা খেতে বলে ভুল করেছেন?"

সানিনের চেহারাটা আর আগে মতো উজ্জ্বল নেই। কেমন যেন ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে লাগছে। সানিন কিছু বলার আগে ফাতিমা বললো, "গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে যে, কালোজিরার থাইমোকুইনোন উপাদানটি ব্লাড প্রেশার কমায়। আবার বিভিন্ন হার্টের রোগেও থাইমোকুইনোনের কার্যকারিতা রয়েছে।[৯] আপনি কি জানেন যে, পৃথিবীতে প্রায় ৩৪৭ মিলিয়ন মানুষের ডায়াবেটিস আছে এবং এই সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে? আমাদের দেহে 'অগ্নাশয়' নামক একটি অঙ্গ আছে। অগ্নাশয়ে 'বিটা কোষ' নামক কিছু কোষ আছে। এই কোষ থেকে 'ইনসুলিন' নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস দুই ধরনের। টাইপ ১ এবং টাইপ ২। টাইপ ১ ডায়াবেটিস হয় বিটা কোষ নষ্ট হয়ে গেলে। এক্ষেত্রে বিটা কোষ ইনসুলিন নিঃসরণ করতে পারে না। তখন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়। আবার টাইপ ২ ডায়াবেটিস হলে বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন নিঃসরণ ঠিক থাকে, কিন্তু কোষে ইনসুলিন ঠিকমতো ঢুকতে পারে না। এজন্য রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাও কমে না। ধারণা করা হয়, অনেক কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ যে, অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে অগ্নাশয়ের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন নিঃসরণ কমে যেতে পারে বা বিটা কোষ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন টাইপ ১ ডায়াবেটিস হয়। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কালোজিরায় উপস্থিত থাইমোকুইনোন অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে কোষের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। এতে টাইপ ১ ডায়াবেটিসের আশংকা কমে যায়।[১০] আবার টাইপ ২ ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, সাধারণ ঔষধ থেকে কালোজিরার কর্মক্ষমতা বেশি।[১১] তাহলে ভাইয়া, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কালোজিরা খেতে বলে ভুল করেছিলেন?"

আমি সানিনের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এখন চুপ করে আছিস কেন? কিছু

তো বল! এতক্ষণ তো ভালোই টিটকিরি মারলি!"

সানিন বললো, "তুই তো কিছু বলছিস না। তুই এত খুশি কেন?"

কথাটা সানিন খারাপ বলেনি। তবে ফাতিমার তথ্যগুলো খুব সুন্দর গোছালো এবং সহজ লাগে। এজন্য শুনেও ভালো লাগে। তাই সবসময় একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে। আমি রেগে গিয়ে সানিনকে বললাম, "না পারলে তো এমন কথাই বলবি!"

সানিন আমার কথাতে কান না দিয়ে ফাতিমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলো, "এখানে তো মাত্র তুমি ৩ টা রোগের কথা বললে। পৃথিবীতে রোগ তো হাজার হাজার।"

ফাতিমা বললো, "আমার বলা শেষ হয়নি। পৃথিবীতে বর্তমানে ভাইরাস, ছত্রাক, ইস্ট বা ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে ঘটে, এমন রোগের সংখ্যা অসংখ্য। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, কালোজিরায় উপস্থিত উপাদান গ্রাম পজিটিভ ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক, ইস্ট ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের ফলে খুব দ্রুত অ্যান্টিবায়োটিক তার কার্যকারিতা হারাচ্ছে। তাই বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে, কালোজিরার থাইমোকুইনোন পরবর্তীতে অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করতে পারবেন।[১২] আবার কিডনির বিভিন্ন সমস্যায় থাইমোকুইনোনের উপকারিতা পাওয়া গিয়েছে।[১৩] এছাড়াও প্রদাহজনিত প্রচুর সমস্যায় থাইমোকুইনোন উপকারী, যেটা কালোজিরায় থাকে।[১৪] অধিক পরিমাণ প্যারাসিট্যামল একবারে খেলে এর নেফ্রো-টক্সিসিটি হয়। কালোজিরায় উপস্থিত উপাদান থাইমোকুইনোনের নেফ্রো-টক্সিসিটির উপরে থেরাপিউটিক ইফেক্ট আছে।[১৫] এবার ধরেন, আপনার স্ত্রী আপনার সাথে রাগ করে অনেকগুলো প্যারাসিট্যামল খেয়েছে। এবং আপনি জানেন যে, কালোজিরা খেলে উপকার হবে। তাহলে আপনি তাকে হাসপাতালে আনবেন নাকি কালোজিরা খাওয়াবেন?"

সানিন উত্তর দিলো, বিনা টাকায় কাজ হলে শুধু শুধু হাসপাতালে কেন নিব? "কালোজিরা খাওয়াবো!"

আমি আর নাবিলা সানিনের বাচ্চাসুলভ উত্তরে হেসে দিলাম। ফাতিমাও হেসে দিলে বললো, "ভাইয়া, কালোজিরা খাওয়ালে খাওয়াবেন। কিন্তু আগে

হাসপাতাল নিয়ে যাবেন। কারণ এগুলো আমি আপনাকে কালোজিরার উপর করা কিছু গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের কথা বলছি। এখনো এগুলো দিয়ে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি হয়নি। এগুলোর উপকার আছে। কিন্তু কোথাও কতটুকু ব্যবহার করতে হবে, সেটা এখনো গবেষণার বিষয়। হয়তো আমরা ভবিষ্যতে দেখতে পাবো।"

"ও!" বলে ভ্রূ উঁচিয়ে মাথা নাড়াল সানিন।

এরপরে সানিন প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, কালোজিরা খেলে কি হাঁপানি রোগ ভালো হয়?"

সানিন এবার একটি ইয়োর্কার বল ছাড়লো। আমি ভাবলাম ফাতিমা এবার 'ক্লিন বোল্ড'। কারণ শুনেছি হাঁপানি রোগ ভালো হয় না। তাই ঠোঁটের ব্যাসার্ধ্য কমিয়ে চোখ বড় করে ফাতিমার দিকে তাকালাম।

ফাতিমা বললো, "ভাইয়া, আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। হাঁপানি রোগকে মেডিকেল সাইন্সের ভাষায় 'অ্যাজমা' বলে। এটি এমন একটি রোগ যা ডায়াবেটিস বা প্রেশারের মতোই, নিরাময় সম্ভব নয়। এই রোগগুলো কন্ট্রোল করতে হয়। যে কন্ডিশানে অ্যাজমাটিক অ্যাটাক হয়, সেই কন্ডিশান অ্যাভয়েড করলেই অ্যাজমা কন্ট্রোলে থাকে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও অ্যাজমার নিরাময় বের করতে পারেনি। আসলে এটা নরমালি সম্ভবও নয়। কারণ এটি ইমিউন মেডিয়েটেড হাইপারসেন্সিটিভিটির কারণে হয়। যা-ই হোক, অ্যাজমার রোগীদের শ্বাসনালীর পেশী সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এজন্য শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়। আমরা মেডিসিনের মাধ্যমে শ্বাসনালীর পেশীর সঙ্কোচন কমিয়ে দেই। এটাই আপাতত এই রোগের ট্রিটমেন্ট। এক গবেষণায় দেখা গেছে কালোজিরার নির্যাস শ্বাসনালীর পেশীর সঙ্কোচন কমায়।[১৬] আরেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অ্যাজমায় ব্যবহৃত স্টেরয়েড থেকে কালোজিরায় উপস্থিত থাইমোকুইনোন বেশি উপযোগী। কারণ, এর অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ইফেক্ট আছে।[১৭] এছাড়াও মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা, ব্যথা, খিঁচুনি, ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিজ ইত্যাদিতে কালোজিরা উপকারী।[১৮] ভাইয়া, আর কিছু জানার আছে?"

"উম..." চিন্তা করতে লাগল সানিন।

সানিনের উত্তরের আগেই ফাতিমা বলে বসলো, "আচ্ছা আপনি ভাবতে থাকুন। আমি আপনাকে এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বলবো। কালোজিরা আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে সহায়তা করে। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কালোজিরা সেবনে প্রতিরক্ষার জন্য নির্ধারিত কোষগুলোর পরিমাণ বাড়ে।[১৯] সুতরাং, কালোজিরার উপাদান আমাদের দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আমাদের ইমিউনিটি যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে আমরা আল্লাহ'র ইচ্ছায় তেমন আর রোগাক্রান্ত হবো না। ভাইয়া, কালোজিরার একটিমাত্র উপাদান কত কাজ করে দেখেছেন? আরো তো উপাদান আছে, সেগুলো নিয়ে গবেষণা করলে আরো কিছু হয়ত পাওয়া যাবে। সুতরাং, কালোজিরাকে 'সকল রোগের ঔষধ মৃত্যু ব্যতীত' – বলাটা কি ভুল?[২০]"

সানিন বললো, "কিন্তু একই ড্রাগের যদি বিপরীতধর্মী কাজ থাকে, তাহলে তো সেখান থেকে উপকার পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কীভাবে কাজ করবে?"

ফাতিমা বললো, "একটি ড্রাগের বিপরীতধর্মী ইফেক্ট থাকলেই যে সেটা ক্ষতিকর – ব্যাপারটা এমন নয়। বিপরীতধর্মী ইফেক্ট উপকারী বা অপকারী দুই ধরনেরই হতে পারে।[২০.১] ধরেন, এক ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ আছে। তাকে আপনি একটি প্রাকৃতিক মেডিসিন দিলেন। যাতে 'A' এবং 'B' দুইটি উপাদান আছে। 'A' উপাদানের কাজ রক্তনালীর প্রসারণ। এবং'B' উপাদানের কাজ কিডনি থেকে সোডিয়ামসহ পানি পুনঃশোষন করা। তাহলে কিন্তু 'A' উপাদানের কারনে রক্তচাপ কমবে। এবং 'B' উপাদানের কারণে রক্তচাপ বাড়বে। এখন, ধরুণ 'A' উপাদানের পরিমান এবং কার্যকারিতা প্রাকৃতিক মেডিসিনে বেশি। আর 'B' উপাদানের পরিমান ও কার্যকারিতা কম। তাহলে আল্টিমেটলি রক্তচাপ কিন্তু 'A' উপাদানের কারণে কমছে । এখন এই প্রাকৃতিক মেডিসিন থেকে যদি আমি 'B' উপাদানটিকে আলাদা করে নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করি এবং একটি নির্দিষ্ট ডোজে রক্তচাপ বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করি তাহলে কি একই প্রাকৃতিক উপাদানে দুটি বিপরীতধর্মী রোগের ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না?

আমি ফাঁকতালে বললাম, "হুম! দ্যাট মেইক সেন্স।"

সানিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞাসা করলো, "তাহলে এটা দিয়ে ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিগুলো কেন ঔষধ তৈরি করে না?"

ফাতিমা উত্তর দিলো, "ভাইয়া, আপনার হয়তো জানা নেই একটি মেডিসিন কীভাবে বাজারে আসে। প্রথমে কোনো ড্রাগ কম্পোনেন্ট আবিষ্কৃত হলে ড্রাগটি কীভাবে কাজ করে, কোথায় কী কাজ করে, কীভাবে কাজ করে তার তথ্য একত্র করা হয়। এরপরে এটা বিভিন্ন প্রাণীতে পরীক্ষা করা হয়। প্রাণীতে ব্যবহারে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকলে সেটা নোট করা হয়। একে বলা হয় প্রি-ক্লিনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। এরপরে ড্রাগটি 'ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল'-এর জন্য প্রস্তুত হয়, যদি ড্রাগের প্রচুর ক্ষতিকর কোনো সাইড ইফেক্ট না থাকে।[২১] ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে, ড্রাগটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে একজন ফার্মাসিস্টের তত্ত্বাবধায়নে কিছু মানুষের উপর টেস্ট করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে, ডাক্তারের তত্ত্বাবধায়নে একটি প্রতিষ্ঠানে কিছু মানুষের উপর টেস্ট করা হয়। তৃতীয় ধাপে, কিছু ডাক্তারের তত্ত্বাবধায়নে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের উপর টেস্ট করা হয়। ড্রাগটি এতগুলো ধাপ অতিক্রম করে যদি বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হয়, তখন ড্রাগটি মেডিসিন হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে বাজারে ছাড়া হয়। দীর্ঘ সময় অবজার্ভেশনের পরে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে ড্রাগটি মেডিসিন হিসেবে স্বীকৃতি পায়।[২২] আর এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ৪-৬ বছর লেগে যায়।[২৩]

"কালোজিরা থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ থাইমোকুইনোন বর্তমানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে আছে। আপনি চাইলে *PubMed Journal* -এ থাইমোকুইনোনের কেমিক্যাল ডেটাবেস দেখতে পারেন।[২৪] *Journal Of Pharmacopuncture* নামক একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি আর্টিকেল অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল সন্তোষজনক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও বড় পরিসরে স্টাডি করা দরকার।[২৫] সুতরাং, স্টাডি সম্পূর্ণ শেষ হলেই আপনি মেডিসিনটি বাজারে পাবেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আশা করি আমার কথা সবটুকুই আপনি বুঝেছেন। আর এটাও আশা করবো যে, আজকের পর থেকে এরকম খোঁটা দেওয়াটা বন্ধ করবেন। আরেকটা ব্যাপার মনে রাখবেন যে, আজ থেকে কয়েক বছর আগেও কালোজিরার এই গুণাগুণগুলো সাইন্টিফিক্যালি প্রমাণিত ছিলো না। তখন আমাকে আপনি জিজ্ঞাসা করলেও আমি প্রমাণ সহকারে উত্তর দিতে পারতাম না। কিন্তু এখন সেটা আমি পেরেছি। কারণ আমার কাছে উপযুক্ত তথ্য ছিলো। সুতরাং, বিজ্ঞান কিন্তু ধীরে ধীরে আগাচ্ছে। তাহলে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য – যা প্রতিনিয়ত চেইঞ্জ হয় বা নতুন তথ্য যোগ করে, সেটা দিয়ে যদি একটি কন্সট্যান্ট

ধর্মকে যাচাই করে ভুল বের করার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই, যদি সত্যিই জানার ইচ্ছা থাকে, তাহলে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন। তাহলে অন্তত এভাবে কলা বিজ্ঞানী হতে হবে না!"

ফাতিমার বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরগুলো শুনে আমি মনে মনে বললাম, "যা ব্যাটা! এবার এখান থেকে উঠে জায়গায় যা!"

এরই মধ্যে একটি ছেলে এসে সানিনকে ডাক দিয়ে বললো, "ভাই, যাবেন না? কেক কাটার সময় হয়ে গিয়েছে তো!"

সানিন ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা, ছুরি কি পেয়েছিলি?"

"না, পাইনি। অন্য দোকান থেকে এনেছি।" ছেলেটি উত্তর দিলো।

সানিন আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে চলে গেলো। আমি সানিনের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকলাম। হাসি থামিয়ে ডানে তাকিয়ে দেখি অর্ডারগুলো একটি ট্রেতে দিয়ে গিয়েছে। আমাদের কথা বলায় ব্যস্ত দেখে হয়তো ডিস্টার্ব করেনি। খাবারগুলো মজা করে খেলাম। বিশেষ করে ফালুদা! আহ! আমার ফেভারিট ফুড।

সামনে সুস্বাদু খাবার পেয়ে এমন খাওয়া দিয়েছি যে 'তিন ভাগের এক ভাগ' সুন্নাহ আদায় হলো না। বাড়ি যেতেও মনে চাচ্ছিলো না। কিন্তু কী করার? যেতে তো হবেই। "স্যার, বিল।" বলে একজন ওয়েটার একটি কাগজ ধরিয়ে দিলো। বিল পে করে বাইরে আসলাম। গাড়িতে সবাইকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। গাড়িতে ফাতিমা বই পড়ছিলো। মাঝপথে ফাতিমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, এজন্যই কি তুমি প্রতিদিন কালোজিরা খাও?"

ফাতিমা উত্তর দিলো, "যে ব্যক্তি একটি ভুলে যাওয়া সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করবে, সে ওই ব্যক্তির কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে, যেটা উক্ত ব্যক্তি তাকে দেখে করেছে। এবং এতে শেষের ব্যক্তিটির প্রতিদান বিন্দুমাত্র কমে যাবে না।[২৫]"

ফাতিমার প্রতিটি কথাই আমার জন্য পাথেয় হয়ে থাকে। যোগ্যতা দিয়ে ও অনেক দূর যেতে পারতো। কিন্তু না! পরক্ষণেই কবিগুরুর কথা মনে পড়লো যে, পৃথিবীতে হয়তো দেখার জন্য যোগ্য লোক পাওয়া যায়, কিন্তু যোগ্য লোকের জন্য

যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

[এখানে একজন বহিরাগত নন-মাহরামের সাথে ফাতিমার এভাবে উন্মুক্ত কথোপকথন শরী'য়াহ সম্মত নয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে অপবাদ চলে আসায় ফাতিমাকে বাধ্য হয়ে কথা বলতে হয়েছে। লেখাটিকে শুধুমাত্র গল্প হিসেবে পড়ার অনুরোধ থাকলো।

লেখাটিকে যতদূর সম্ভব সহজ করার চেষ্টা করেছি। তবুও একটু সাইন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড হলে বুঝতে সুবিধা হবে। সব তথ্যগুলো মেডিকেল জার্নাল অথবা মেডিকেল টেক্সটবুক থেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি, এক্ষেত্রে লেখাটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলার কাছেই। লেখাটিতে যা কিছু ভুল, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে এবং যা কিছু কল্যাণ, তার সবটুকুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

- [১] https://islamqa.info/en/2438
- [২] *The Pharmacological Basis Of Therapeutics* (Goodman and Gilman); 12th edition; Page: 1005-1027
- [৩] *সহিহ বুখারি*; অধ্যায়: চিকিৎসা; হাদিস নং- ৫৬৮৮/ আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৭৭/ ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৭৩
- [৪] *লিসান আল আরব;* খণ্ড: ০৭; পৃষ্ঠা: ৭১৮
- [৫] *সহিহ বুখারি* (মূল আরবি ছাপা); খণ্ড: ০২; পৃষ্ঠা: ৮৪৯; টীকা: ০২
- [৫.১] https://islamqa.info/en/154257
- [৬] *লিসান আল আরব;* খণ্ড: ০৫; পৃষ্ঠা: ১৫১
- [৭] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295211003637
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427413012903
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387232/
- [৮] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0027510714000888

- [৯] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387232/
- [১০] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387232/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464615003266
- [১১] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387232/
- [১২] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501316304475
- [১৩] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110093114000192
- [১৪] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576915300011
- [১৫] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919114009807
- [১৬] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20149611
- [১৭] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19711253
- [১৮] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/
- [১৯] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15850137?dopt=Abstract
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16734144?dopt=Abstract
- [২০] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874116304214
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104366181500050X
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/
- https://imed.pub/ojs/index.php/iam/article/view/1320/1863
- [২০.১] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22272687
- [২১] Basic and Clinical Pharmacology by Bertram G. Katzung; Page: 12)70th edition)
- [২২] Rang and Dale's Pharmacology; Page: 6)784-781th edition)
- [২৩] Basic and Clinical Pharmacology by Bertram G. Katzung; Page: 12)74th edition)
- [২৪] https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Thymoquinone#section=Top
- [২৫] http://www.journal.ac/sub/view/223
- [২৬] *সুনান আত-তিরমিজি;* হাদিসটি হাসান।

ডট রহস্যের ভেদ ও একটি যৌক্তিক শাস্তি

ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে পেপার পড়ছিলাম। অফিস থেকে বাসায় আসার পরে বিকেলে পেপার পড়ি। প্রতিদিনই আম্মু এ সময়ে কফি বানিয়ে দেয়। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ বসে থাকার পরেও কফির কোনো নামগন্ধ পাচ্ছি না। আম্মু মনে হয় আজ ভুলে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পর ফাতিমা পিছন থেকে ডাক দিলো। আমি ফাতিমার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর হাতে একটি কাপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। কাপটি আমার হাতে দিয়ে বললো,

"এই যে তোমার কফি। আমি বানিয়েছি। খেয়ে বলো কেমন হয়েছে।"

আমি চোখ বড় করে ফাতিমার দিকে থাকিয়ে থাকলাম। আমার চোখের সামনে হাত নাড়িয়ে ফাতিমা বললো, "এই যে মিস্টার! আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে বলিনি। কফি খেয়ে দেখতে বলেছি। চটপট খেয়ে বলো, কেমন হয়েছে।"

"ও হ্যাঁ!" এই বলে আমি কফির কাপে চুমুক দিলাম।

"কেমন হয়েছে?" ফাতিমার প্রশ্ন।

এই প্রথম ফাতিমা আমার জন্য কফি বানিয়ে এনেছে। এজন্যই মনে হয় কেমন হয়েছে সেটা জানার আগ্রহ একটু বেশি। আমি মুচকি হেসে উত্তর দিলাম, "আলহামদুলিল্লাহ্। ভালো হয়েছে।"

ফাতিমা খুশি হয়ে বললো, "একটু ওয়েট করো। আমি আরেকটি জিনিস বানিয়েছি। সেটা নিয়ে আসি।"

যদিও কফি মায়ের বানানো কফির মতো ছিলো না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না।[১] এজন্য আমিও কিছু বললাম না, যাতে পরবর্তীতে আরও উৎসাহ পায়। কিছুক্ষণ পরে ফাতিমা ফিরে এসে আমার পাশের চেয়ারে বসলো। প্লেটে করে বার্গার নিয়ে এসেছে। এখনকার মেয়েরা আর কিছু রাঁধতে পারুক আর না-ই পারুক, ফাস্ট ফুড ঠিকই বানাতে পারে। হেসে দিয়ে বললাম, "এটাও তুমি বানিয়েছো?"

ফাতিমা উত্তর দিলো, "হুম। দাও কাপটি আমার হাতে দিয়ে বার্গার খাও।"

আমি এক হাতে কাপটি ফাতিমার হাতে দিয়ে অন্য হাতে বার্গারটি নিলাম। তখন ফাতিমা বললো, "আচ্ছা শোনো, সিহিন্তা ফোন দিয়েছিলো। রাতে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে। আমাদের যেতে হবে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "কোন সিহিন্তা?"

"ওই যে ৩ নং সেক্টরে থাকে। আমার বান্ধবী। কেন? সেদিন পরিচয় করিয়ে দিলাম না?" ফাতিমা উত্তর দিলো।

আমি বললাম, "ও হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিকাছে। ইশার সালাতের পরে যাবো, ইনশা-আল্লাহ।"

ইশার সালাতের পরে আমি আর ফাতিমা সিহিন্তার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে দই আর মিষ্টি নিলাম। ফাতিমা কিছু ফল নিতে বললো। তাই দই এবং মিষ্টির সাথে আপেল আর কমলা নিলাম। সিহিন্তার বাসায় গিয়ে কলিং বেল দিলাম। কিছুক্ষণ পরে সাইফুল দরজা খুললো। সাইফুল সিহিন্তার হাসব্যান্ড। সিহিন্তার নাম ভুলে গেলেও সাইফুলের নাম আমার মনে আছে। কারণ, ছেলেটির ব্যবহার অনেক ভালো। কাউকে দেখলেই হেসে একটি সালাম দেয়। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের আগেই সাইফুল হাসিমুখে সালাম দিলো। আমরা সালামের উত্তর দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে ভিতরে ঢুকলাম। সাইফুল আমাদের ড্রয়িংরুমে বসতে দিয়ে সিহিন্তাকে ডেকে বললো, "সিহিন্তা,

আদনান আর ফাতিমা চলে এসেছে। এদিকে আসো।"

সিহিন্তা রুম থেকে এসে সালাম দিয়ে ফাতিমার পাশে বসলো। আমাদের আসাতে ওরা দুজন খুব খুশি হয়েছে। আসলে অতিথিদের আগমনে যারা মন থেকে খুশি হয়, তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়ামত প্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এই অনুগ্রহ দান করুন।

রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে কথা চলতে লাগলো আমাদের মধ্যে। এক পর্যায়ে সিহিন্তা বললো, "আচ্ছা ফাতিমা শোন, একটি বিষয়ে তোর সাথে আমার কিছু আলোচনা ছিলো।"

"হুম। বল, কী বিষয়ে।" ফাতিমা বললো।

সিহিন্তার উত্তর দেবার আগে সাইফুল বললো, "আচ্ছা সিহিন্তা, তাহলে তোমরা গল্প করো। আমার অফিসের কিছু কাজ আছে আমি সেগুলো শেষ করি।"

সিহিন্তা বললো, " আচ্ছা, ঠিকাছে।"

"হ্যাঁ, বল। কী যেন বলতে চাইলি?" ফাতিমা প্রশ্ন করলো।

সিহিন্তা বললো, "আমার নিচের ফ্ল্যাটে একটি মেয়ে থাকে। ওর নাম আলিশা। ও রোমান ক্যাথলিক। মাঝে মাঝে ওর সাথে আমার ইসলাম এবং ক্রিশ্চিয়ানিটি নিয়ে কথাবার্তা হয়। গতকাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কথা বলছিলাম। তখন ও আমাকে একটি হাদিসের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করে। কিন্তু আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি। সেই হাদিসের ব্যাপারেই কিছু জানার ছিলো।"

ফাতিমা সিহিন্তার দিকে ঘুরে বসে বললো, "হুম, বল। কোন হাদিসের ব্যাপারে কী কী প্রশ্ন করেছে?"

সিহিন্তা বললো, "যদিও কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগে। তবুও জানার জিনিস তো জানতেই হবে। নাহলে কেউ কেউ অজ্ঞতার সুযোগ নিতে পারে। সহিহ বুখারিতে একটি হাদিসে এসেছে যে, কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করতে মদিনায় এসেছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মদিনায় থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু তারা মদিনার পরিবেশে প্রচুর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তারা রাসূলুল্লাহ'র ﷺ

কাছে এসে তাদের অসুস্থতার কথা জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করতে বলেন।[২] গতকাল আমার আর আলিশার মাঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলোচনার সময় আলিশা বললো, 'তোমাদের ধর্ম যদি পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা সাপোর্ট করতোই, তাহলে কি এভাবে উটের প্রস্রাব খেতে বলতো? যেটাকে সবাই নোংরা জিনিস মনে করে, সেটা মোহাম্মদ কাউকে কীভাবে খেতে বললো?' যেহেতু সহিহ বুখারির হাদিস, এজন্য এর বিশুদ্ধতা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমি কিছু বলতে পারলাম না। এব্যাপারে তোর কিছু জানাশোনা আছে কি?"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "আমি এর আগেও এই ব্যাপারে অনেকের সাথে কথা বলেছি। শুধুমাত্র বুখারির একটি হাদিস পড়ে এ ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যাবে না। আমাদের আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করতে হবে। আচ্ছা, তোর ইসলামি ফিকাহ বা আইনশাস্ত্র সম্পর্কে কেমন ধারণা আছে?"

সিহিন্তা বললো, "মূলনীতিগুলো একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে যতটুকু জানা দরকার, ততটুকু জানি।"

ফাতিমা বললো, "ওকে। এতটুকু জানলেই হবে। এখন তুই যে হাদিসটি বললি, সেটার মূল বিষয় হলো, উকল এবং উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদিনায় রাসূলুল্লাহ'র ﷺ কাছে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মদিনার আবহাওয়া তাদের সহ্য হয়নি। তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। পেটের বিভিন্ন সমস্যা এবং পেট ফোলা নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ'র ﷺ কাছে এসেছিলো। এখানে একটি পয়েন্ট মনে রাখ যে, তারা অসুস্থ ছিলো। তারপর তারা তাদের অসুস্থতার কথা রাসূলুল্লাহ'র ﷺ কাছে জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের একটি উটের খামারে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে কয়েকদিন উটের দুধ এবং প্রস্রাব খেতে বলেন। এখানে উটের দুধ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, উটের দুধ পরিষ্কার পানীয়। কিন্তু এখানে সমস্যা হলো, উটের প্রস্রাব নিয়ে। কারণ, এটি নোংরা জিনিস। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন এটি খেতে বললেন? এটাই তো প্রশ্ন। তাই না?"

সিহিন্তা বললো, "হ্যাঁ। আরও আছে। আগে এটাই বল।"

ফাতিমা বললো, "আচ্ছা, ঠিকাছে। প্রথমত আমাদের দেখতে হবে, ইসলামি

ফিকাহ বা আইনশাস্ত্র অনুযায়ী প্রস্রাব কি পবিত্র নাকি অপবিত্র। পবিত্র হলে হালাল হবে এবং অপবিত্র হলে হারাম হবে। হানাফি এবং শাফেয়ী ফিকাহ অনুযায়ী, উটের প্রস্রাব অপবিত্র এবং হারাম। এটা শুধুমাত্র ওই সময়ে হালাল হবে, যখন এটি কোনো রোগের মেডিসিন হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং যখন সেই রোগের অন্য কোনো হালাল মেডিসিন থাকবে না।[৩] বিখ্যাত হানাফি ফকিহ আল্লামা বাদরুদ্দিন আল আইনি (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ *উমদাতুল কারী* গ্রন্থে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, হারাম জিনিস দিয়ে চিকিৎসা তখনই হালাল হবে, যখন তার মধ্যে আরোগ্য আছে – এটা জানা যাবে এবং অন্য ঔষধ থাকবে না। এটি সেই অবস্থার মতো, যখন খাবারের এবং পানির অভাবে মৃত্যুর সময় যথাক্রমে হারাম মাংস হালাল এবং মদ পান করা হালাল হয়ে যায়।[৪] হাফিয ইবনে হাজার আসকালানি (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এরকম ঔষধের ব্যবহার শুধুমাত্র তখনই হালাল হবে, যখন অন্য কোনো চিকিৎসা থাকবে না।[৫] সুতরাং, উটের প্রস্রাব হারাম এবং এটি তখনই কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল হবে যখন সেই ব্যক্তির রোগের জন্য কোনো হালাল মেডিসিন পাওয়া যাবে না। বুঝেছিস?"

ফাতিমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো সিহিন্তা। ফাতিমা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় সিহিন্তা বললো, "হুম, বুঝলাম। তাহলে তুই বলতে চাচ্ছিস যে, এই হাদিসে উরাইনা এবং উকল গোত্রের ব্যক্তিদের যে রোগ হয়েছিলো, তার মেডিসিন হিসেবে ওই সময়ে উটের প্রস্রাব এবং দুধ ছাড়া অন্য কিছু ছিলো না? আর এ কারণেই শুধুমাত্র রোগের ট্রিটমেন্টের জন্য এগুলো খেতে বলা হয়েছে?"

ফাতিমা বললো, "হ্যাঁ, একদম তা-ই। কারণ এই একটিমাত্র ঘটনায় উরাইনা এবং উকল গোত্রের লোকদের ছাড়া অন্য কোনো হাদিসে বা জীবনে কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে উটের প্রস্রাব খেতে বলেননি। আরেকটি ব্যাপার হলো, ওই সময়ের মেডিকেল সাইন্স এখনকার মতো উন্নত ছিলনা। তখনকার ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদান দিয়েই তাঁরা চিকিৎসা করতেন। মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। তাঁর জানা ছিলো যে, উরাইনা এবং উকল গোত্রের লোকদের যে রোগ হয়েছিলো, সেটা উটের দুধ এবং প্রস্রাব ছাড়া ঠিক হবে না এবং মেডিসিন হিসেবে এগুলো ছাড়া আর কিছুই তাদের রোগমুক্তির জন্য উপযুক্ত ছিলো না।

এজন্যই তিনি সেগুলো খেতে বলেছিলেন। বুঝলি?”

“আচ্ছা এটা বুঝলাম। কিন্তু কেমন হয়ে গেলো না? এর টেস্ট কেমন লাগবে? আর খাবেই বা কীভাবে?” সিহিন্তা প্রশ্ন করলো।

ফাতিমা উত্তর দিলো, “যেহেতু সাথে দুধ মিশিয়ে খেতে বলা হয়েছে, সেহেতু টেস্ট খারাপ লাগার কথা না। ১৪০০ বছর আগের কথা তো বাদই দিলাম। বর্তমানেও তো গর্ভবতী ঘোটকীর প্রস্রাব থেকে ইস্ট্রোজেন পৃথক করা হয়। এবং সেটা ক্যান্সার, জন্মনিয়ন্ত্রণসহ আরও বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এবং সেটা ট্যাবলেট হিসেবেই আমরা মুখ দিয়েই খাই।[৬] বাজারে যেটা প্রিমারিন নামে পাওয়া যায়।[৭] আবার গর্ভবতী মহিলাদের প্রস্রাব থেকে আলাদা করা হয় হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রোপিন।[৮] এটি ইনফার্টিলিটিতে ব্যবহার করা হয়। এখানের এই ঔষধগুলো খেতে তো কারো সমস্যা হয় না। রোগমুক্তির বা প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য কতকিছুই তো খাওয়া লাগে!”

ফাতিমাকে থামিয়ে সিহিন্তা বললো, “কিন্তু এগুলো তো ভালোভাবে ফিলট্রেশন করা। কিন্তু ওগুলো...।”

সিহিন্তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ফাতিমা বললো, “আরে ওই সময় ফিলট্রেশন কীভাবে করবে? তুই যদি মধ্যযুগে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে অপারেশন করতে চাস, তাহলে তো সেটা বোকামি ছাড়া কিছু না।”

সিহিন্তা বললো, “সেটাও তো ঠিক!”

ফাতিমা সিহিন্তাকে জিজ্ঞাসা করলো, “বেয়ার গ্রিলস নামের এক ব্যক্তি আছেন। তুই কি তাঁকে চিনিস?”

“হ্যাঁ, চিনি। আগে ডিসকভারি চ্যানেলে উনার ‘ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড’ অনুষ্ঠানটির ফ্যান ছিলাম।” সিহিন্তা উত্তর দিলো।

ফাতিমা বললো, “তাহলে তো তুই দেখেছিস মনে হয়। একবার একটি পর্বে উনি তো নিজের প্রস্রাব নিজেই খেয়েছেন।[৯] তারপরে উটের পেট থেকে অর্ধ পরিপাককৃত খাবার থেকে পানি চুপসিয়ে খেয়েছেন।[১০] একদিন তো কিছু মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার ট্রেনিং দিতে গিয়ে সবাইকে প্রস্রাব

করে তাতে কাদামাটি মিশিয়ে, সেটা তাদেরই খাইয়েছেন।[১১] এগুলো কখনোই সাধারণ অবস্থার খাবার নয়। কিন্তু যখন কেউ বিপদে পড়ে, তখন জীবন বাঁচাতে যেকোনো কিছুই খেতে হয়। বুঝাতে পারলাম?"

কী বিরক্তিকর বিষয়ে ওদের মাঝে আলোচনা চলছে। আমি যে ওদের মাঝে আছি, সেটা মনে হয় ওরা ভুলেই গিয়েছে। বিরক্তি লাগলেও আমি খুবই মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনছিলাম। কিছুক্ষণ ঘরে পিনপতন নীরবতা চলছিলো। কিছুক্ষণ পরে সিহিন্তা আবার প্রশ্ন করলো, "কিন্তু WHO এর মতে, কাঁচা দুধ এবং প্রস্রাব খেলে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে তুই কী বলবি?"

ফাতিমা বললো, "সিহিন্তা, তুই সেই ১৪০০ বছর আগের অবস্থার সাথে এখনের অবস্থা মেলালে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ট্রিটমেন্ট সর্বকালের জন্য দেননি। এটা তখনেরই ট্রিটমেন্ট, যখন সেই রোগের কোনো মেডিসিন ছিলো না। কিন্তু এখন মোটামুটি সকল রোগেরই মেডিসিন পাওয়া যায়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলোতে হালাল বস্তুই থাকে। সুতরাং, এখন যদি কেউ কোনো রোগের জন্য মেডিসিন থাকা সত্ত্বেও উটের প্রস্রাব খায়, তখন সেটা তার জন্য হালাল হবে না। আর সবথেকে বড় কথা হলো, হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী উটের দুধ এবং প্রস্রাব কিছুদিন খাবার পরে তাদের রোগ ভালো হয়ে যায়। এগুলোতে উপকারিতা না থাকলে তো তারা সুস্থ হতো না। তাই না? অবশ্য এখান থেকে উপকার পাবার কারণ এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেতে বলেছিলেন, তাই আল্লাহ তা'আলা এতে আরোগ্য দিয়েছেন। এছাড়াও কিছু সাইন্টিফিক স্টাডি আছে উটের দুধ এবং প্রস্রাবের ব্যাপারে। দেখা গেছে যে, এই কম্পোনেন্ট অ্যান্টি-ক্যান্সার, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাংগাল, লিভার ডিজিজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপকারী।[১২]"

"হুম। সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছিস।" সিহিন্তা উত্তর দিলো।

সামনে একটি ছোট টেবিলে পানি রাখা ছিলো। সেখান থেকে ঢকঢক করে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিলো ফাতিমা। তারপরে বললো, "শুধু যে তারা সুস্থ হয়েছে তা কিন্তু নয়। সুস্থতার পাশাপাশি তারা মোটাও হয়ে গিয়েছিলো। তখন উরাইনা এবং উকল গোত্রের লোকেরা চুরি করে উটগুলো নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলো। এবং সত্যিই একসময় সেই উটগুলোর দায়িত্বে থাকা রাখালকে হত্যা করে তারা

উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেলো। সিহিন্তা, এখানে একটি জিনিস গভীরভাবে চিন্তা করে দ্যাখ যে, উটের দুধ আর প্রস্রাব খেয়ে তারা এমন উপকার পেয়েছে যে, তারা সেই উটের মালিক হবার জন্য সেখানের দায়িত্বে থাকা রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। উপকার না পেলে কি তারা এগুলো করতো? তারা ভেবেছিলো, উটে মনে হয় যাদু আছে। এজন্য এত জঘন্য কাজ করতেও তারা দ্বিধা বোধ করেনি।”

সিহিন্তা বললো, “হুম। দ্যাট মেইকস সেন্স! আচ্ছা ফাতিমা, রাখালকে হত্যা করার কারণে নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের খুব কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন? তাদের হাত-পা কেটে, চোখে নাকি গরম শলাকা ঢুকিয়ে এবং পানি চাইতেও তাদের পানি না দিয়ে মরুভূমিতে ফেলে রাখা হয়েছিলো। আলিশার একটি প্রশ্ন এটাও ছিলো যে, কেন তাদেরকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। চোখে কেন গরম শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো?”

ফাতিমা বললো, “এটা খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। একটা বিষয় মনে রাখবি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন রাষ্ট্রনেতা ছিলেন। রাষ্ট্রের যেকোনো ধরনের অরাজকতা বন্ধে তাঁকেই পদক্ষেপ নিতে হতো। উরাইনা এবং উকল গোত্রের লোকদের দুইটি অপরাধ ছিলো। একটি হলো, সেখানের দায়িত্বে থাকা রাখালকে হত্যা করা। এবং অপরটি হলো, উট চুরি করে পালিয়ে যাওয়া। তারা বাহ্যিকভাবে ঈমান এনেছিলো, কিন্তু মূলত তারা ছিল মুনাফিক। তাই তারা ছদ্মবেশে মুসলিমদের প্রাণ এবং গণিমতের সম্পদের উপর আঘাত হানে। আল্লাহ তা’আলা কু’রআনে বলেছেন, ‘কেউ যদি একটি নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, কোনো হত্যাকান্ড কিংবা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য বিচারে শাস্তির বিধান ছাড়া, তাহলে সে যেন সম্পূর্ণ মানবজাতিকে হত্যা করলো।’ এই অবস্থায় রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিরীহ মানুষকে হত্যা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর হামলা করার অপরাধের শাস্তি দেওয়া তাঁর দায়িত্ব ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি দয়া প্রদর্শন করে তাদের শাস্তি না দিতেন, তাহলে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে এটি তাঁর চরম ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হতো। কারণ, মুনাফিকরা এবং কাফির-মুশরিকরা যখন দেখতো যে, এভাবে উট বা মুসলিমদের সম্পদ চুরি করলে বা হত্যা করলে তাদের নেতা কোনো শাস্তি দেন না, তখন কাফের-মুশরিক এবং মুনাফিকরা আরও বেশি বেশি এই কাজ করা শুরু করতো। যার ফলাফল খুব একটা ভালো হতো না। আর এরকম অপরাধ মদিনায় এরাই

প্রথম করেছিলো। এজন্য অঙ্কুরেই যদি এই অপরাধকে কঠোর শাস্তির মাধ্যমে বন্ধ করা না হতো, তাহলে মদিনায় মুসলিমদের পুনর্বাসন অসম্ভব হয়ে পড়তো। এজন্যই এরকম শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো, বুঝলি?"

সিহিন্তা উত্তর দিলো, "হুম। সেটা নাহয় বুঝলাম। কিন্তু..."

সিহিন্তাকে থামিয়ে ফাতিমা বললো, "আবার কিন্তু কী? তাদের শাস্তি তো কুরআনের আয়াত অনুযায়ী দেওয়া হয়েছিলো। কারণ, আল্লাহ তা'আলার জমিনে শুধু আল্লাহ্‌র তা'আলারই আইন চলবে। এটাই যুক্তিসংগত। তারা চুরি-ডাকাতি এবং হত্যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রাণ এবং সম্পদের নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এবং জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। তাই, চুরি এবং ডাকাতির অপরাধে তাদের হাত এবং পা কেটে দেওয়া হয়েছিলো। এবং হত্যার অপরাধে তাদেরকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো।[১৩] আল্লাহ তা'আলার আদেশ বাস্তবায়নে রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। নিজের মেয়ের ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, 'আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করতো, আমি তার হাত কেটে দিতাম।'[১৪] আর বাংলাদেশেও ৩০২ ধারা অনুযায়ী, হত্যার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[১৫] অপরাধে উৎসাহদাতারা ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে না! আর আমার মনে হয়, প্রশ্ন তোলাও উচিত নয়। কারণ বাংলাদেশে চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ ইত্যাদির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়াতে এই অপরাধগুলোর পরিমাণ দিনদিন বেড়েই চলেছে। তাই অপরাধ দমনের লক্ষ্যে শাস্তিতে কঠোরতা আরোপ করা দোষের কিছু না। বরং সেটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার।"

সিহিন্তা বললো, "ফাতিমা, আমার প্রশ্ন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া নিয়ে নয়। ওই গোত্রের লোকগুলোকে তাদের হত্যাকাণ্ডের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো – এটা ঠিক আছে। কিন্তু চোখে গরম শলাকা ঢুকিয়ে এবং পানি চাওয়ার পরেও পানি না দেওয়ার ব্যাপারটায় একটু বেশি কঠোরতা অবলম্বন করা হয়ে গেলো না?"

আমিও মনে মনে সিহিন্তার কথায় সায় দিচ্ছি। শাস্তি একটু কঠিনই মনে হচ্ছিলো। ফাতিমা তখন কী যেন ভাবছিলো। এদিকে সাইফুল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনের সোফায় বসলো। বললো, "তোমাদের কথা এখনো শেষ হয়নি? সিহিন্তা, আমার কিন্তু ক্ষুধা লেগেছে।"

সিহিন্তা বললো, "হ্যাঁ, আমাদের প্রায় হয়ে গিয়েছে। আর একটু অপেক্ষা কর।"

অনেকক্ষণ চিন্তা করার পরে ফাতিমা বললো, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই লোকগুলোর সাথে অতিরিক্ত কিছুই করা হয়নি। উরাইনা এবং উকল গোত্রের লোকেরা সেখানে উটের দায়িত্বে থাকা রাখালকে খুব নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো। ইবনে জারুদ (রহঃ) তাঁর লিখিত *আল-মুনতাকা* গ্রন্থে তাদের চোখে গরম লোহা ঢুকিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে আনাস (রাঃ) হতে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটিতে বলা হয়েছে যে, ওই গোত্রের লোকগুলো উটের দায়িত্বে থাকা রাখালের চোখেও কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো।[১৬] এছাড়াও *যুরকানি* নামক একটি গ্রন্থে আছে যে, উরাইনা এবং উকল গোত্রের লোকজন উটের দায়িত্বে থাকা রাখালের চোখে এবং জিহ্বায় কাঁটা ঢুকিয়ে দেয়। তার হাত পা কেটে দেয়। তারপর তাদের জবাই করে।[১৭] এজন্যই কুরআনে বর্ণিত হদ এবং কিসাসের মূলনীতি অনুযায়ী তাদের চোখেও গরম লোহা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হয়। এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[১৮] এই ঘটনার পরে আর কখনো এভাবে কাউকে হত্যার আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ দেননি। বরং এভাবে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[১৯] সুতরাং, তাদের নিজস্ব কর্মের কারণেই তাদের উপর এরকম কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছিলো। তাই আশা করি এই বিষয়ে এখন তোর আর কোনো প্রশ্ন নেই। কী? তাই তো?"

সিহিন্তা বললো, "তাহলে মূল কারণ এটাই যে, উরাইনা এবং উকল গোত্রের লোকেরা সেখানে দায়িত্বে থাকা রাখালের চোখে এবং জিহ্বায় কাঁটা ঢুকিয়ে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করেছিলো। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কর্মফলের শাস্তি স্বরূপ তাদের চোখেও গরম লোহা ঢুকিয়ে শাস্তি দিয়েছেন। চুরি এবং ডাকাতি করার জন্য হাত-পা কেটে দেওয়া হয়েছে। এবং হত্যা করার জন্য তাদেরও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাই তো?"

ফাতিমা বললো, "হ্যাঁ, সেটাই। এবার বল, এখানে অযৌক্তিক শাস্তি কি তাদের দেওয়া হয়েছিলো?"

সিহিন্তা বললো, "না, তাহলে ঠিকাছে। এবার আমি আলিশাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলতে পারবো, ইনশা-আল্লাহ। ফাতিমা এজন্যই তোকে আমার পছন্দ হয়। কারণ এসব ব্যাপারে যৌক্তিক উত্তরগুলো আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে একমাত্র

তোর থেকেই পাওয়া যায়।”

সিহিন্তার কথা শুনে ফাতিমা একটু ইতস্তত বোধ করলো। কারণটি আমি বুঝেছি। ফাতিমা সামনাসামনি কারো প্রশংসা শুনতে পছন্দ করেনা। এমনকি নিজেরও না। তাই আস্তে করে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়লো। অনেকক্ষণ ধরে ওদের আলোচনা শুনছিলাম। এখন আমারও ক্ষুধা লেগে গিয়েছে। রাত তো কম হলো না! নিজের কথা তো বলা যায় না। তাই ‘ওই পাতে দৈ দেওয়া’র নীতি অবলম্বন করলাম।

সিহিন্তাকে বললাম, “তুমি এবার খাবার রেডি করতে পারো। সাইফুলের ক্ষুধা লেগেছে। সেই কখন থেকে খাবার চাচ্ছে। দেখো, কীভাবে পেটে হাত দিয়ে বসে আছে। হা হা। আর ফাতিমা আসলে তেমন কিছু জানে না। সবকিছুই ও আমার কাছ থেকে শিখেছে। বুঝলা?”

এ কথা বলাতেই ফাতিমা আমার দিকে ফিরে চোখ দুটি বড় বড় করে তাকালো। আমি মজা করে বললাম, “হুর আল-আঈন।”

সিহিন্তা আর সাইফুল শুনতে পেয়ে হা হা করে হেসে দিলো। আমিও ওদের সাথে যোগ দিলাম। এরপরে, ফাতিমার দিকে তাকালাম। দেখি ও বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় রাগ করেছে। অনেকে বলে, রাগলে নাকি মেয়েদের সুন্দর লাগে। এখানে সবার সামনে সেটাও বলতে পারছি না। রাগ ভাঙাতে কী করা যায়? নাহ! আপাতত হাসি থামাই। আম্মুর কাছে শুনেছি, বেশি হাসলে নাকি পরবর্তীতে কাঁদতে হয়।

[এখানেও গল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যে ফ্রি-মিক্সিং পাওয়া যায়। ইসলাম শরী’য়াহ এগুলোকে সাপোর্ট করে না। লেখাটিকে নিছক একটি গল্প হিসেবে পড়ার অনুরোধ। সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহ তা’আলার কাছেই। লেখাটিতে যা কিছু ভুল, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে এবং যা কিছু কল্যাণ, তার সবটুকুই আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

♦ [১] *রিয়াদুস স্বলেহিন;* পানাহারের আদব-কায়দা; হাদিস নং- ৭৪০ (ihadis.com)/ সহীহুল বুখারি ৪৫০৯,৩৫৬৩ (ihadis.com)/ সহিহ মুসলিম ২০৬৪ (ihadis.com)

♦ [২] *সুনানে আন-নাসায়ী;* পবিত্রতা অধ্যায়; হাদিস ৩০৫ (ihadis.com)/ সহিহ বুখারি; যাকাত অধ্যায়; হাদিস: ১৫০১ (ihadis.com)

♦ [৩] *কিতাব আল-মাবসুত* (ইমাম আবু বকর আল-সারাখশি); খণ্ড: ০১; অধ্যায়: ওজু এবং গোসল; পৃষ্ঠা: ৬০-৬১

♦ দলিল বিশ্লেষণ জানতে: http://seekershub.org/ans-blog/27/12/2010/is-it-permissible-to-use-medicine-with-haram-ingredients/

♦ [৪] *উমদাতুল ক্বারি;* খণ্ড: ০২; পৃষ্ঠা: ৬৪৯

♦ [৫] *ফাতহুল বারী;* খণ্ড: ০১; পৃষ্ঠা: ৪৪১

♦ [৬] https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/#23676225section=Pharmacology-and-Biochemistry

♦ [৭] https://reference.medscape.com/drug/premarin-estrogens-conjugated342771-

♦ [৮] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2393969

♦ [৯] https://www.youtube.com/watch?v=4U_xmfSwYSw

♦ [১০] https://www.youtube.com/watch?v=FpXJkwwxETI&t=209s

♦ [১১] https://www.youtube.com/watch?v=D_4pSg5XOAY

♦ [১২] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S#1658361216000238bib7

♦ http://www.sciencedomain.org/abstract/16550

♦ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922085

♦ http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2010.0473

♦ [১৩] *তাফসীর ইবনে কাছীর;* খণ্ড: ০৩; সূরা মায়িদা (০৫); আয়াত: ৩৩ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

♦ [১৪] *সহিহ বুখারি;* অধ্যায়: আম্বিয়া কিরাম ('আঃ); হাদিস নং- ৩৪৭৫ (ihadis.com)

♦ [১৫] http://www.clcbd.org/lawSection/473.html

♦ [১৬] *আল- মুনতাক্বা* (আলি ইবনে আল-জারুদ আন-নিসাবুরি); খণ্ড: ০১; পৃষ্ঠা: ২১৬; হাদিস: ৮৪৭

♦ [১৭] *সহিহ বুখারি* (বাংলা অর্থ এবং ব্যাখ্যা: মাওলানা আজিজুল হক); ১৩ম সংস্করণ; হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড; খণ্ড: ০৩; পৃষ্ঠা: ২২৩

♦ [১৮] কিসাসের আয়াতসমূহ: সূরা মায়িদা (০৫), আয়াত: ৪৫ এবং সূরা বাকারা (০২), আয়াত: ১৭৮

♦ [১৯] *তাফসির ইবনে কাছির* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন); খণ্ড: ০৩; পৃষ্ঠা: ৫২১

রোগ কি সংক্রমিত নয়?

বেডরুমে শুয়ে বই পড়ছিলাম। কিন্তু কিছুতেই বইতে মন দিতে পারছিলাম না। আজ ফাতিমা আমাকে নিয়ে যাবে হেপাটাইটিস বি ভ্যাক্সিন দিতে। ছোটবেলা থেকেই ইঞ্জেকশন দেখলেই জ্বর চলে আসতো। এবারো এসেছে কিনা দেখার জন্য ডান হাত কপালে রাখলাম। নাহ! এবার জ্বর আসেনি। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। তাই বারবার নাক টানতে হচ্ছে। আজীবন ভ্যাক্সিন দেবার সময় বাড়ি থেকে পালিয়েছি। কিন্তু এখন তো পালানোর বয়সও নেই। ওদিকে ড্রয়িং রুম থেকে খুব হাসাহাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। কাজিনরা এসেছে বাসায়। বিছানা থেকে উঠে দেখতে গেলাম ওরা কীসের জন্য এত হাসাহাসি করছে। ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখি বড়দের মধ্যে আছে ফাতিমা, নাবিলা, প্রাচী। আর ছোটদের মধ্যে আছে পারশিয়া, অরিশা, জান্নাত, রুহি। ফাতিমা আর নাবিলা ছোটদের নিয়ে মজা করছে। আর প্রাচী একপাশে বসে মোবাইল টিপছে। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে ওদের দিকে দিকে তাকাচ্ছে। আমি গিয়ে সোফায় বসলাম। তারপর প্রাচীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কীরে? সবাই মজা করছে। আর তুই এক কোণায় বসে মোবাইল টিপছিস কেন? যন্ত্র হয়ে গিয়েছিস নাকি?"

প্রাচী উত্তর দিলো, "আগে বলো, তোমার এই অবস্থা কেন।"

-"কী অবস্থা?"

-"এই যে চোখ লাল। বারবার নাক টানছো যে!"

-"ও হ্যাঁ, আজ হেপাটাইটিস বি ভ্যাক্সিন দিতে যাবো।"

-"ও! এজন্য ভয়ে এই অবস্থা। হা হা। মামী প্রায়ই বলে সুঁই দেখলে তোমার বারোটা বেজে যায়!"

ফাতিমাকে দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে। হাতি কাদায় পরলে ব্যাঙও লাথি মারে। এখন আমার সেই অবস্থা। হাত নাকে রেখে এক টান দিতেই প্রাচী বললো, "আচ্ছা ভাইয়া, ভ্যাক্সিন দেবার কী দরকার? তোমাদের ধর্মে তো ভ্যাক্সিন দেওয়াই নিষেধ। তাহলে নাকি ভাগ্যের উপর বিশ্বাস উঠে যায়! আর মোহাম্মদ তো বিশ্বাসই করতো না যে, রোগ সংক্রামক হতে পারে। সে বলেছে যে, সংক্রামক রোগ বলতে নাকি কিছু নেই। মোহাম্মদ প্রায়ই এমন আজগুবি কথা বলতো। আর তোমরা তার বোকা ফলোয়ার!"

আমি বললাম, "ধর্ম নিয়ে খোঁটা মারার অভ্যাস তোর গেলো না। এটা ভালোভাবেও তো বলা যায়। নাকি? যা-ই হোক, তাহলে তো আমি বেঁচেই গেলাম। ওহ্! এখনি সুস্থ হয়ে গিয়েছি মনে হচ্ছে। সুখবর দেওয়ার জন্য চকলেট খেয়ে নিস। কিন্তু তোর একটি কথায় খটকা লাগছে। সংক্রামক রোগ তো আছে। কিন্তু তুই বলছিস যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি অস্বীকার করেছেন! রাসূলুল্লাহ'র ﷺ এমন কথা বলার তো কথা না! আচ্ছা, হাদিসটা কি সহিহ?"

"কেন? কোনো সন্দেহ? আচ্ছা ফাতিমা, তুমিই বলো তো এই হাদিস সহি না?" প্রাচী প্রশ্ন করলো।

-"হাদিস তো সহিহ। কিন্তু তোমার ইন্টারপ্রিটেশান সহিহ নয়।"

-"মানে?"

-"মানে হলো, এই হাদিস থেকে তুমি যে ফতোয়া দিলে, সেটা ঠিক নয়। ইসলামে ভ্যাক্সিন দেওয়া হারাম – এটা তোমাকে কে বলেছে?"

-"আমি পড়েছি।"

-"সেটা তো বুঝেছি। তো কোন ব্লগে পড়েছো?"

প্রাচী আর কোনো কথা বলছে না। একবার ফাতিমার দিকে আরেকবার আমার

দিকে তাকাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর প্রাচী উত্তর না দেওয়ায় ফাতিমা নিজ থেকেই বললো,

"ইসলামে ভ্যাক্সিনেশন হারাম নয়, যদি ভ্যাক্সিনে হারাম কিছু না থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুষ্ঠ রোগী থেকে সেভাবে পালাও, যেভাবে তোমরা সিংহ দেখলে পালাও।[১] তিনি আরো বলেন, যদি কেউ প্রতিদিন সকালে আযওয়া বা মদিনার খেজুর খায়, তাহলে রাত পর্যন্ত কোনো বিষক্রিয়া বা যাদু তার উপর কাজ করবে না।[২] এটাও তো এক ধরনের প্রতিরোধ। কারণ, রোগ হবার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং, এই হাদিসগুলো থেকেই বোঝা যায়, রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেবার অনুমতি ইসলামে আছে। ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন।[৩] হ্যাঁ, তবে যদি ভ্যাক্সিনে হারাম কিছু থাকে তাহলে সেটা হারাম। কিন্তু যদি কোনো হালাল ভ্যাক্সিন পাওয়া না যায়, এবং সেই ভ্যাক্সিন না নিলে বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তখন ভ্যাক্সিনে হারাম জিনিস থাকলেও একজন মুসলিম দ্বীনদার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে সেটা ব্যবহারের অনুমতি আছে।[৪] সুতরাং, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

প্রাচীর কথা শুনে অন্তরে যে প্রশান্তি এসেছিলো, সেটা এখন আর নেই! তাহলে আমাকে ভ্যাক্সিন দিতেই হবে! চিন্তা বাদ দিয়ে এখন বিতর্কে মনোযোগ দিলাম। প্রাচীও চুপ থাকার মেয়ে নয়। সাথে সাথেই পাল্টা প্রশ্ন করলো, "সেটা নাহয় হলো। কিন্তু সংক্রামক রোগ তো আছে। পৃথিবীতে প্রচুর সংক্রামক ব্যাধি রয়েছে, যা গুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু মোহাম্মদ বলেছে, সংক্রামক রোগ নেই! এবার কি বলবে যে, সব ডাক্তাররা ভুল বলেন?"

ফাতিমা বললো, "না, আমি বলবো না যে ডাক্তাররা ভুল বলে। কিন্তু এটাও সত্য যে আল্লাহ্‌র রাসূলও ﷺ ভুল বলেননি।"

ফাতিমার কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এ কেমন কথা? হয় সংক্রামক রোগ আছে, অথবা নেই। দুটি কথার একটি ঠিক। পরস্পর দুটি বিপরীতমুখী কথা তো একই সাথে ঠিক হতে পারে না। তাই প্রশ্ন করবো, ঠিক এমন সময় প্রাচী বললো, "ভাইয়া, ভাবীর মাথা মনে হয় গিয়েছে! কী বলছে নিজেই বুঝছে না।

সংক্রামক রোগ নেই, আবার আছে – দুটিই নাকি সঠিক। হা হা।"

"আচ্ছা প্রাচী তুমি তো ইন্টারমেডিয়েটে *হাজার বছর ধরে* উপন্যাস পড়েছো। তাই না?" প্রাচীর কথায় কান না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো ফাতিমা।

-"হ্যাঁ, পড়েছি।"

-"সেখানে ওলা বিবি, যক্ষ্মা বিবি, কলেরা বিবি ইত্যাদি দেব-দেবী সম্পর্কে কিছু তোমার মনে আছে?"

-"হ্যাঁ, মনে আছে।"

-"কী কী মনে আছে? একটু বলো তো।"

-"প্রাচীনকালে কুসংস্কারপূর্ণ গ্রামগুলোতে,কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগকে বিভিন্ন দেব-দেবী বা খারাপ কোনো কিছুর দৃষ্টিপাত হিসেবে মনে করা হতো। সঠিক চিকিৎসা না থাকায় ঐ সময়ে বিভিন্ন পানি বাহিত রোগ মহামারি আকারে দেখা দিতো। আর মূর্খ গ্রামবাসী মনে করতো,ওলা বিবি, যক্ষ্মা বিবি,বা ওই টাইপের কোনো কিছুর নজর লেগেছে।"

-"যাক, ভালোই মনে আছে তোমার।"

আমিও প্রাচীর সাথে একমত। প্রাচীনকালের অধিকাংশ মানুষ এমন কুসংস্কারে লিপ্ত ছিলো। কিন্তু প্রাচীর প্রশ্নের সাথে এর সম্পর্ক কী – সেটা মাথায় এলো না। উৎসুক মনে ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু ওলা বিবির সাথে সংক্রামক ব্যাধির কী সম্পর্ক?"

ফাতিমা বললো, "সম্পর্ক না থাকলে তো আর আমি জিজ্ঞাসা করতাম না! শোনো, রাসূলের ﷺ আগমনের আগে প্রাচীন আরব ছিলো কুসংস্কারপূর্ণ। তারা বিশ্বাস করতো যে, রোগ-ব্যাধি ওদের কিছু দেব-দেবীর তৈরি এবং অন্যের দেহে রোগ ব্যাধি ছড়ানোর মতো নিজস্ব ক্ষমতা তাদের আছে। এবং, এভাবে কলেরা বা অন্য কিছু হলে তারা মনে করতো যে, তার কাছে গেলেই সবাই সেই রোগে আক্রান্ত হবে। তাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ধারণা ছিলো। রাসূলুল্লাহ তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা উৎখাত করতেই বলেছেন, 'সংক্রামক ব্যাধি

বলতে কিছু নেই'।[৫] বুঝেছো?"

প্রাচী এমন একটি ভাব করলো, যেন ফাতিমা ওকে ভুলভাল বুঝাচ্ছে। তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো, "নাহ, বুঝিনাই। সংক্রামক রোগ আছে তো। সেটা দেব-দেবীর কারণে না হোক, ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাস দিয়ে তো হয়। তাহলে কি তোমার যুক্তি খাটলো?"

-"এটা বুঝতে হলে তোমাকে আগে তাহলে রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে ইসলামী আক্বিদা বা বিশ্বাস কেমন সেটা জানতে হবে।"

-"বলো, শুনে দেখি।"

আমাদের কথাবার্তায় নাবিলার সমস্যা হচ্ছিলো মনে হয়। তাই বাচ্চাদের নিয়ে আস্তে সেখান থেকে উঠে অন্য রুমে চলে গেলো। এখন আমি, ফাতিমা আর প্রাচী ছাড়া ড্রয়িং রুমে কেউ নেই। বিতর্ক ভালোই জমেছে। যুক্তির বিপরীতে পাল্টা যুক্তি চলছে। ফাতিমা আস্তে করে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলা শুরু করলো,

"বিজ্ঞানের ভাষায় যেকোনো রোগ সাধারণত তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ফ্যাক্টরের কারণে হয়। জীবাণু, আশেপাশের পরিবেশ এবং যার রোগ হবে সেই প্রাণীর রোগাক্রান্ত হবার উপযোগিতা। এই তিন জিনিসের সমন্বিত ক্রিয়ায় রোগের উদ্ভব হয়।[৬] কিন্তু ইসলাম এসব বিষয়ের সাথে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে। আর সেটি হলো, আল্লাহ্‌র হুকুম বা ইচ্ছা বা সৃষ্টি। অর্থাৎ, কোনো রোগ তখনই কোনো জীবে প্রকাশ পাবে, যখন আল্লাহ তা'আলা ঐ জীবে রোগ সৃষ্টি করবেন। এছাড়াও এর সাথে যেকোনো জাগতিক জিনিসের সংযুক্তি থাকাকে ইসলাম অস্বীকার করে না। যেমন ধরো, রোগ সৃষ্টিতে ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাসের কিংবা পরিবেশের অবদান। এগুলো সব উসিলা বা উপাদান মাত্র। কারণ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে একটি নিয়ম তৈরি করেছেন। তাই সব কিছু নিয়মের মধ্যেই চলবে। কিন্তু সেটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়। সুতরাং, সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কেও ইসলাম একই আক্বিদা রাখার নির্দেশ দেয়। আর সেটি হলো, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মধ্যে সংক্রমণের নিয়ম রেখেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রোগ সৃষ্টি করলেই রোগ সংক্রমিত হবে, নতুবা নয়।[৭] এ ব্যাপারটি সংক্রামক রোগ সম্পর্কিত আরও কিছু হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।"

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি চারটা দশ বাজে। বাঁকা চোখে ফাতিমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী সেই হাদিস? একটু বলো তো শুনি।"

ফাতিমা চুপ করে থাকলো। মনে হয়, হাদিসগুলো মনে আসছিলো না। কিছুক্ষণ পরে বললো, "হুম, মনে পড়েছে। একদিন এক বেদুঈন বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার উটের পাল অনেক সময় মরুভূমির চারণ ভূমিতে থাকে, মনে হয় যেন নাদুস-নুদুস জংলী হরিণ। তারপর সেখানে কোনো একটি চর্মরোগ আক্রান্ত উট এসে আমার সুস্থ উটগুলোর সাথে থেকে এদেরকেও চর্মরোগী বানিয়ে দেয়।' তিনি ﷺ বললেন, 'প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টি করলো কে?'[৮] এখান থেকেই বোঝা যায় যে, এসব রোগের সৃষ্টিকে তিনি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বা সৃষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আবার অন্য একটি হাদিসে আছে, 'রোগাক্রান্ত উটকে যেন সুস্থ উটের সাথে একত্রে পানি পানের জায়গায় না আনা হয়।'[৯] তাহলে এখান থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে, রোগ সংক্রমণের বাস্তবতাকে রাসূলুল্লাহও ﷺ অস্বীকার করেননি।"

আমার বুঝতে কিছু সমস্যা হচ্ছিলো। সমীকরণ ঠিক মেলাতে পারছিলাম না। উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "আবার একটু ক্লিয়ার করে বলো তো। আমার কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।"

ফাতিমা হেসে দিয়ে বললো, "আচ্ছা, ক্লিয়ার করে বলছি। এসমস্ত বাহ্যিক কারণকে ইসলামের পরিভাষায় 'আসবাব' বলা হয়। সকল রকম 'আসবাব' বা 'কারণ' আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং এসব দিয়ে যে সমস্ত জিনিস ঘটবে, সেটাও আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করলেই সৃষ্টি হতে পারে নতুবা নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলাকে 'মুসাব্বিবুল আসবাব' বা 'সকল কারণের সৃষ্টিকর্তা' বলা হয়। সুতরাং, সাধারণ রোগ বলো, আর সংক্রামক রোগ বলো; সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কারণেই হয়। এখানে কোনো আসবাব বা কারণের প্রভাব থাকা অথবা না থাকা, আল্লাহ তা'আলার রোগ সৃষ্টির ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এজন্যই দেখো, আমরা যেগুলোকে সংক্রামক রোগ বলে জানি, সেসব রোগীর সংস্পর্শে কোনো সুস্থ লোক গেলেই কিন্তু সবসময় সে আক্রান্ত হয় না। সুতরাং, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর কাছে গেলে ঐ ব্যক্তি আক্রান্ত হলেও হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। রোগীর কাছ থেকে সুস্থ ব্যক্তিতে জীবাণু

আসতেও পারে, কিংবা না-ও আসতে পারে। জীবাণু আসলেও সেটা রোগ সৃষ্টি করবে কি না – সেটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বা সৃষ্টির উপর নির্ভর করবে।[১০] এবার বুঝেছো?"

ফাতিমার উত্তরে আমি আশ্বস্ত হলেও প্রাচী আশ্বস্ত হতে পারলো না। ফাতিমার উত্তরে প্রাচী হো হো করে হাসা শুরু করলো। তারপর বললো, "ফাতিমা, তুমি কি শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে? জীবাণু ঢুকে রোগ হওয়া বা না হওয়ার কারণ হলো, আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এর সাথে স্রষ্টার ইচ্ছার সম্পর্ক কী?"

ফাতিমা বিরক্তির সুরে বললো, "প্রাচী, সহজ জিনিস বুঝতে তোমাদের এত সমস্যা কেন হয়, আমি বুঝি না। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও তো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। সুতরাং, এটিও একটি 'আসবাব' অর্থাৎ, কারণ। সুতরাং, জীবাণু সংক্রমণের পরে আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যক্রমের প্রভাব থাকাকে বিশ্বাস করাও ইসলামী আক্বিদার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কিন্তু প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে কি হবে না, সেটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বা হুকুমের উপর নির্ভর করে। এটাই আমাদের আক্বিদা বা বিশ্বাস। আশা করি, আর কোনো প্রশ্ন নেই তোমার।"

প্রাচী মুখ কালো করে বসে আছে। কিছুক্ষণ ভেবে আবার প্রশ্ন করলো, "তাহলে যারা আল্লাকে বিশ্বাস করে না, তাদের ক্ষেত্রে কী হবে?"

ফাতিমা উত্তর দিতে চাইলে আমি থামিয়ে দিলাম। কারণ এটার উত্তর আমিই দিতে পারবো। বুক টান টান করে বললাম, "শোন প্রাচী, পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহ তা'আলার তৈরি। আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না।[১১] সুতরাং, নন-মুসলিমদের ক্ষেত্রেও একই সিস্টেম, যদিও তারা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করে। বুঝেছিস?"

পাশে রাখা মোবাইলটি হাতে নিয়ে সোফা থেকে উঠে চলে গেলো প্রাচী। যাওয়ার সময় বলে গেলো, "আমি আজ তোমাদের বাসায় থাকবো। কাল তোমার সাথে আবার কথা হবে।"

"আচ্ছা, ঠিকাছে। আফসোস হয় এদের জন্য! নিজের দুর্বলতা এরা কখনো স্বীকার করবে না!" বলেই ঘড়ির দিকে তাকালো ফাতিমা। ঘড়িতে তখন সাড়ে

চারটা বাজে। ভ্যাক্সিন দিতে যাবার কথা ছিলো তিনটা থেকে চারটার মধ্যে। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ফাতিমা বললো, "এই, ভ্যাক্সিন দিতে যাবার কথা ছিলো না? তোমার খেয়াল ছিলো না? সময়মতো বলতে পারলে না?"

আমি বললাম, "আমার কী দোষ? আমি তো তোমাদের বিতর্ক শুনছিলাম। তুমি তো লেকচার শুরু করলে আর শেষ হয় না। এখন কী হবে?"

"দেখি, তাদের ফোন দেই। সামনের সপ্তাহে ভ্যাক্সিনেশানের ব্যবস্থা করতে পারে কি না।" বলে উঠে চলে গেলো ফাতিমা।

আহ! অন্তত এক সপ্তাহ তো নিশ্চিন্তে থাকা গেলো। সাধে কি আর ভালোভাবে বোঝার পরেও এতক্ষণ প্যাঁচাই? হা হা হা।

[ইসলামিক শরী'য়াহ অনুযায়ী কোনো মুসলিমের জন্য তার ফুফাতো বোন এবং কোনো মুসলিমাহ'র জন্য তার ফুফাতো ভাই মাহরাম নয়। এদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের পর্দা করা ফরজ। এবং কথা বলার সময় হিজাব মেইন্টেইন করা জরুরী। এখানে এগুলো কিছুই হয়নি। এক্ষেত্রেও গল্পটি শুধুমাত্র একটি গল্প হিসেবেই পড়ার অনুরোধ রইলো। সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলার কাছেই। লেখাটিতে যা কিছু ভুল, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে এবং যা কিছু কল্যাণ, তার সবটুকুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থাবলি:

- [১] *Sahih al-Bukhari* (Dar As-Salam Publication); Hadith No: 5707
- [২] *Fath Al-Baari* (Explannation of Sahih Bukhari); Part: 10: Page: 249
- [৩] http://www.islamweb.net/en/article/154489/
- [৪] https://islamqa.info/en/20276
- [৫] *Umdat al-Qari* (Explannation of Sahih Bukhari); Part: 04: Page: 289
- [৬]https://www.apsnet.org/edcenter/instcomm/TeachingArticles/Pages/DiseaseTriangle.aspx
- [৭] *ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ* (মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন); অধ্যায়: রোগ সংক্রামণ সম্পর্কে আকিদা; পৃষ্ঠা: ১৭৮-১৮১
- [৮] *সুনানে আবু দাউদ;* অধ্যায়: ভবিষ্যৎ কথন ও কুলক্ষন-সুলক্ষণ; হাদিস নং- ৩৯১১ (ihadis.com)
- [৯] *সুনানে আবু দাউদ;* অধ্যায়: ভবিষ্যৎ কথন ও কুলক্ষন-সুলক্ষণ; হাদিস নং- ৩৯১১ (ihadis.com)
- [১০] *সহিহ বুখারি* (বাংলা অর্থ এবং ব্যাখ্যা: মাওলানা আজিজুল হক); ১৩ম সংস্করণ; হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড; খণ্ড: ০৬; পৃষ্ঠা: ২২৩-২২৬
- [১১] Surah Tawba, Verse- 51; Surah Hadid, Verse- 22 23

মানবতার লঙ্ঘন নাকি অজ্ঞতার আস্ফালন?

প্রতি রাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফাতিমা আমাকে বিষয়ভিত্তিক কিছু হাদিস পড়ে শোনায়। আজ শুনছিলাম অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ফজিলত সম্পর্কে। প্রাচী বারবার আমাদের রুমে ঢুকছিলো আর বের হচ্ছিলো। বিষয়টি লক্ষ করে আমি ওকে ডাক দিলাম। বললাম, "কীরে, কী হয়েছে তোর? একবার আসছিস আবার যাচ্ছিস! ঘটনা কী?"

-"তেমন কিছু না।" প্রাচীর উত্তর।

-"কিছু তো হয়েছে। নাহলে তো এভাবে ঘুরঘুর করতি না। কিছু বলবি?"

-"ফাতিমার সাথে কথা ছিলো।"

-"আচ্ছা, বসো এখানে। আর কয়েকটি হাদিস পড়ে তোমার কথা শুনছি।" বলে ফাতিমা আবার হাদিস পড়তে শুরু করলো।

হাদিস পড়ার সময় ফাতিমা খুবই মনোযোগী থাকে। এই সময়টুকু কোনোমতেই ও কারো সাথে কম্প্রোমাইজ করে না। প্রাচী এসে ফাতিমার পিছনে বসে মোবাইল চাপতে লাগলো। আমি হাদিস শোনায় মনোযোগ দিলাম। কিছুক্ষণ বিভিন্ন হাদিস পড়ার পরে একটি সুন্দর হাদিস পড়ে.ফাতিমা গ্রন্থটি বন্ধ করলো। হাদিসটি ছিলো, 'কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিম ভাইকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যায়, তাহলে

সে জান্নাতের একটি ঘরে প্রবেশ করবে।[১]' ভ্রাতৃত্বকে ইসলাম কত সুন্দরভাবে মূল্যায়ন করেছে!

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ প্রাচী প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা ফাতিমা, কাল তুমি বলেছিলে মোহাম্মদ কুষ্ঠ রোগীদের থেকে পালাতে বলেছে যেভাবে সিংহ দেখলে মানুষ পালায়। তাই তো?"

-"হুম, বলেছেন।"

-"কেন? কুষ্ঠরোগীদের দেখে এত ঘৃণা করার কী আছে?"

-"এতে ঘৃণার কী দেখলে?"

-"এখানে শুধু ঘৃণা নয়, চরম মানবতার লঙ্ঘন রয়েছে।"

-"তাই নাকি? তো কেন তোমার এমন মনে হলো?"

প্রাচী বললো, "কুষ্ঠ তো খুব একটা ছোঁয়াচে নয়। কিন্তু মহাজ্ঞানী মোহাম্মদ ছড়াচ্ছেন এর উল্টো বক্তব্য। বাস্তবেও আমরা প্রতিদিন যখন রাস্তায় বের হই, তখন কি চারপাশে কুষ্ঠ রোগীর ছড়াছড়ি দেখি? উত্তর হলো, না। তীব্রভাবে ছোঁয়াচে হলে সারা পৃথিবী কুষ্ঠরোগীতে ভরে যেত। তাহলে এভাবে গুরুত্বের সাথে তার থেকে পালাতে বলে ঘৃণা ছড়ানোর কী দরকার?"

ফাতিমা বললো, "খুব একটা ছোঁয়াচে নয়। কিন্তু ছোঁয়াচে তো? কুষ্ঠ রোগী থেকে জীবাণু আরেকজনের দেহে প্রবেশ করতে তো পারে, যারা তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ তা'আলায় ইচ্ছায় রোগ তো হতেই পারে। তাই নয় কি?"

প্রাচী বললো, "হ্যাঁ, সেটা পারে। কিন্তু তাই বলে এভাবে বলে তো উনি মানবতার লঙ্ঘন করেছেন। কুষ্ঠ রোগীদের থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে তিনি কুষ্ঠ রোগীদের সমাজ থেকে বিতাড়িত বা একঘরে করে ফেলতে চেয়েছেন। কোথায় এই রোগীদের চিকিৎসা করে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দেখিয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার কথা, সেখানে মোহাম্মদ তাদেরকে সমাজচ্যুত করে ফেলে তাদের সেই আমলে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে

দিয়েছেন। এটা কি মানবতার লঙ্ঘন নয়?"

ফাতিমা একটু বিরক্তির সুরে প্রাচীর প্রশ্নের উত্তরে বললো, "আরে বাবা, ওই সময়ে তো কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা ছিলো না। তাহলে সেসময় কীভাবে এর ট্রিটমেন্ট দিবে? আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে যতটুকু জানিয়েছেন, তিনি ততটুকুই জেনেছেন। কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানাননি। এজন্য তিনি এর চিকিৎসা জানতেন না। এই রোগ হলে আগে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। এজন্য এটা থেকে সতর্ক থাকতে বলা তো দোষের কিছু না!"

ফাতিমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রাচী বললো, 'ঠিকাছে, ট্রিটমেন্ট জানতো না বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে এভাবে সমাজ থেকে আলাদা করার পাঁয়তারা করা কি মানবতাবিরোধী নয়?"

-"তুমি শুধু একটি হাদিস পড়ে এসে মুহাম্মাদকে ﷺ দোষারোপ করছো। এটা কি তোমার ঠিক হচ্ছে?"

-কেন ঠিক হচ্ছে না? এদের সাথে মমতা দেখানোর কোনো কথা কি মোহাম্মদ বলেছে?"

-"হ্যাঁ, বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক কুষ্ঠরোগীকে কাছে ডেকে নিয়ে একসাথে খেয়েছেন এবং বলেছেন, 'খাবার খাও। আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি এবং তাঁর উপর নির্ভর করছি।'[২] এবার কী বলবে?"

প্রাচী কিছুটা বিব্রত বোধ করলো। বললো, "এটা কী করে সম্ভব? নিজেই পালাতে বলে আবার নিজেই কাছে ডেকে নিয়েছেন? মোহাম্মদ তো তাহলে দুই কথা বলতো!"

ফাতিমা এতক্ষণ নরমালি কথা বলছিলো। এবার একটু নড়েচড়ে বসল। ছোট্ট একটি কাশি দিয়ে ফাতিমা বলা শুরু করলো, "তোমাকে তো কালই বললাম যে, সেই সময়ে আরবে কুষ্ঠরোগ নিয়ে অনেক রকম কুসংস্কার কাজ করতো। মানুষ মনে করতো এদের কাছে গেলেই তারা রোগাক্রান্ত হবে। পক্ষান্তরে রোগ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা হলো, সব রোগের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আর বাহ্যিক কারণ শুধুমাত্র উসিলা। এছাড়া কিছু নয়।[৩] রোগের নিজের কোনো ক্ষমতা

নেই, আল্লাহ তা'আলাই বিভিন্ন মাইক্রো-অর্গানিজমের মধ্যে সংক্রমণের ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া এসব জিনিস মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে না। এজন্যই দেখা যায়, কোনো মহামারী কবলিত এলাকায় অনেক মানুষই সুস্থ থাকে। রাসূলুল্লাহ'র ﷺ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইয়াকিন শক্ত ছিলো। তিনি সম্পূর্ণই আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে একসাথে খেয়েছেন। কিন্তু অনেকের আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইয়াকিন শক্ত থাকে না। সেই ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাছে গিয়ে নিজেই রোগাক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে তার আকিদা নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য তাদের সতর্ক থাকতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কুষ্ঠ রোগীদের থেকে পালাতে বলেছেন। এবং নিজেও অনেক সময় কুষ্ঠ রোগীর আনুগত্য দূর থেকে নিয়েছেন।[৪] এটা সাহাবাদের প্রাক্টিক্যালি শেখানোর জন্য। আর এই পালানো বলতে তো দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া নয়। এর অর্থ কাছে যেন না যাওয়া হয় সতর্কতা অবলম্বনের জন্য। বুঝতে পেরেছো?"

প্রাচী চুপ করে কী যেন ভাবছে। নতুন প্রশ্ন খুঁজছে মনে হয়। প্রাচী উত্তর না দেওয়ায় ফাতিমা আবার বলা শুরু করলো, "প্রাচী, আরবে প্লেগ আর কুষ্ঠ রোগ নিয়ে যে ভয় কাজ করতো, সেটা বলার বাইরে। তাদের কাছে কেউ যেতই না। একঘরে করে রাখতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ বলেছেন, রোগ সংক্রমণ বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ, রোগের নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা নেই। আল্লাহ রোগ সৃষ্টি করলেই রোগ হয়।[৫] এতে বিভিন্ন বস্তু বা ফ্যাক্টর বাহ্যিক কারণ অর্থাৎ 'আসবাব' হিসেবে থাকতেও পারে, আবার না-ও পারে।[৬] তারপরে নিজে কুষ্ঠ রোগীর সাথে খেয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাতে তাঁর মানবিকতাই প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরকম আশ্বাস না দিলে কেউ তাদের সেবাও করতো না। কেউ মরে গেলে কবর দিতেও যেত না। তাই এসব ক্ষেত্রে ইসলামি আকিদা অনুযায়ী কেউ যদি এই বিশ্বাসের উপর অটল থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা রোগ না দিলে আমাকে কোনোকিছুই রোগাক্রান্ত করতে পারবে না, তাহলে তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে সে এগিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং, এতে আরও মানবতার রক্ষা হয়েছে, লঙ্ঘন নয়। আর তোমার ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা পরিষ্কার হয়েছে। তুমি তোমার অন্তরকে আরও প্রশস্ত করো, তাহলে আর মেনে নিতে সমস্যা হবে না।"

"সেটা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু মোহাম্মদ বলেছে, শুধুমাত্র বুধবারেই কুষ্ঠ রোগ হয়। এরকম কথার অসারতা আশা করি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

রোগ তো যেকোনো দিনেই হতে পারে। এমন অবৈজ্ঞানিক কথা তো গ্রহণযোগ্য না! হা হা হা!" কালক্ষেপণ না করে দ্রুত পরের প্রশ্ন ছুঁড়লো প্রাচী।

ফাতিমা উত্তরে বললো, "যে হাদিসে বুধবারে কুষ্ঠরোগ ছড়ানোর কথা এসেছে, সেই হাদিসটি দ্বয়িফ অর্থাৎ দুর্বল। তুমি চাইলে চেক করতে পারো।[৭] সুতরাং, সেটি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এটা নিয়ে হাসাহাসি করার কিছু নেই। হা হা করে হেসে এখন নিজেই বোকা সাজলে!"

প্রাচীর মধ্যে ভাবের কোনো পরিবর্তন এলো না। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই আবার প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, তাহলে মোহাম্মদ কুষ্ঠরোগীদের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছে কেন? এতে কি তাদের অবজ্ঞা করা হয় না?"

ফাতিমা হেসে দিয়ে দিয়ে বললো, "প্রাচী, তুমি না কালো ভূত। তোমার চেহারার দিকে তাকাতেই আমার অনেকসময় ভয় লাগে। মনে হয় চিৎকার করে পালিয়ে যাই!"

এরকম অবজ্ঞা করায় প্রাচী কষ্ট পেয়েছে মনে হলো। কাঁদো কাঁদো সুরে বললো, "ভাইয়া, দেখছো! ফাতিমা আমাকে কী বললো? আমাকে নাকি ভূতের মতো দেখতে?"

ফাতিমার এমন কথায় আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু ফাতিমা তো এভাবে কাউকে কষ্ট দেয় না। মুখ কালো করে জিজ্ঞাসা করলাম, "ফাতিমা, একেকজনের চেহারা তো একেক রকম হতেই পারে। তাই বলে কাউকে এভাবে কষ্ট দেওয়া ঠিক না!"

ফাতিমা প্রাচীকে জিজ্ঞাসা করলো, "কষ্ট পেয়েছো?"

প্রাচীর চোখ দুটি পানিতে ছলছল করছে। আসলেই মন খারাপ করেছে। দ্রুত ফ্রিজ থেকে একটি পার্ক চকলেট এনে দিলাম। খেয়ে যদি একটু মন ভালো হয়। এসে দেখি ফাতিমা ফোনে কী যেন খুঁজছে। কিছুক্ষণ পরে প্রাচীকে ডেকে এই ছবিটি দেখিয়ে বললো, "দেখো তো প্রাচী, ইনাকে কেমন লাগে।"

মেয়েরা এমনিতেই একটু কুৎসিত ছবি দেখে ভয় পায়। তাই ছবিটি দেখে প্রাচী "অ্যাঁ" বলে চোখ বন্ধ করে চিৎকার শুরু করলো। এবং বলতে থাকলো, "এগুলো সরাও আমার সামনে থেকে। আমি এগুলো দেখতে পারি না।"

আমি বললাম "আরে এত ভয় পাবার কী আছে? এদিকে তাকা। তোদের বিতর্ক তো এখনো শেষ হয়নি।"

প্রাচী বললো, "আগে ওকে ওই ছবি আমার চোখের সামনে থেকে সরাতে বলো!"

ফাতিমাকে মোবাইল সরাতে বললে ও সরিয়ে নিলো। তারপর বললো, "আচ্ছা প্রাচী, তুমি যদি এই লোকের সামনে থাকা অবস্থায় এমন করতে, তাহলে এই লোকটা কষ্ট পেতো না?"

-"হ্যাঁ, মনে হয় পেতো।"

-"তুমি যেমন তোমাকে কুৎসিত বলায় কষ্ট পেয়েছো, এদের কাছেও ব্যাপারটি কষ্টকর ছিলো। এই লোকটি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। এরকম চেহারা নিয়ে বাইরে বের হলে অনেকেই তাকে দেখে তোমার মতো রিঅ্যাক্ট করতো। অনেকে খারাপ কথা বলতো। কারণ সাধারণ লোকের কাছেও তার চেহারা দেখতে খারাপ লাগতো। তখন তার কাছে ব্যাপারটি মোটেও সুখকর হতো না। তখন সে নিজেকে সমাজ

থেকে আলাদা মনে করতো। হীনমন্যতায় ভুগতো। একা একা কষ্ট পেতো। এজন্য রাসূলুল্লাহ হয়তো তাদের বাইরে বের হতে নিষেধ করেছেন, যাতে সে অন্যকেও কষ্ট না দেয় এবং নিজেও কষ্টভোগ না করে। প্রাচী, আর কত? এভাবে ব্লগ পড়ে ইসলামের ভুল উপস্থাপনগুলো বিনা যাচাইয়ে গিলে এসে অপপ্রচার করে বেড়াও! নিজের কাছে কি খারাপ লাগে না? মুসলিম পরিবারে জন্মে ইসলাম সম্পর্কে জানার এত সুযোগ-সুবিধা থাকতেও যদি বাতিল পন্থায় ইসলামকে জানো, তাহলে তোমাকে আমি দুর্ভাগাই বলবো। একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করো তো! যেটা করছো, তার আউটকাম কী।"

আজ অনেক অস্ত্র নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু সব ফিউজড। ফাতিমার কথাগুলো শুনে চুপ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পরে অনেকটা নরম কণ্ঠে প্রাচী বললো, "আপাতত আমি আর কিছু জানি না। তবে তোমার প্রশংসা করবো আজ। মায়ের মুখে সব রিলিজিয়নের ব্যাপারেই শুনেছি। ফ্রেন্ড সার্কেলের সবাইকেই তাদের ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে বিপদে ফেলেছি। অনেকে এগুলো সহ্য না করতে পেরে ওভার রিঅ্যাক্ট করতো। কিন্তু এক্ষেত্রে তুমি একটু ব্যতিক্রম। ইসলামের উপর তোমার খুবই সাজানো গোছানো একটা কনসেপ্ট আছে। এজন্য তোমাকে সাধুবাদ জানাই। আমি একটু এমনই। কখনো হারতে পছন্দ করি না। এজন্য তোমার সাথে তর্কে জেতার জন্য বারবার সুযোগ খুঁজেছি। কিন্তু বারবার হেরে গিয়েছি। তোমার চিন্তার বিশুদ্ধতা আমাকে ইসলাম নিয়ে ভাবতে অনুপ্রেরণা দিলো। এতদিন মায়ের শেখানো জিনিস বিনা কথায় বিলিভ করতাম। এখন থেকে এই বিষয়গুলোতে আমি পড়াশোনা করবো। কোনো সমস্যা হলে অজ্ঞদের কাছে না গিয়ে বিজ্ঞ লোকের থেকে জেনে নিবো। কোনোদিন কোনো কথায় বেয়াদবি করে থাকলে ক্ষমা করে দিও।"

-"সকল প্রশংসা এই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সে-ই পথ পায়। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। অন্ধকার আর আলো কি এক? না, কক্ষনো না। আলো এমন জিনিস যা চারিদিক আলোকিত করে। তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো। আল্লাহ চাইলে সঠিক পথ পাবে।" বলে ঝলমলে চোখে ফাতিমা প্রাচীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো।

পাশে বসে অবুঝদের মায়াভরা কণ্ঠে বোঝানোর এক মনোরম দৃশ্য দেখতে পেলাম। আর কি সুযোগ হবে এমন? নিজের প্রশংসায় ফাতিমার খুশি হবার কথা না। কিন্তু ঘটনা এবার ঘটলো তার উল্টো! কষ্টে অর্জিত সামান্য জ্ঞান প্রচারে যদি কারো চিন্তার দরজা খুলে যায়, সেটিই তো ওর পাওয়া। আর উত্তম প্রতিদান তো আল্লাহ তা'আলার কাছেই।

[ইসলামিক শরী'য়াহ অনুযায়ী কোনো মুসলিমের জন্য তার ফুফাতো বোন এবং কোনো মুসলিমাহ'র জন্য তার ফুফাতো ভাই মাহরাম নয়। এদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের পর্দা করা ফরজ। এবং কথা বলার সময় হিজাব মেইন্টেইন করা জরুরী। এখানে এগুলো কিছুই হয়নি। এক্ষেত্রেও গল্পটি শুধুমাত্র একটি গল্প হিসেবেই পড়ার অনুরোধ রইলো। সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলার কাছেই। লেখাটিতে যা কিছু ভুল, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে এবং যা কিছু কল্যাণ, তার সবটুকুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলি:

- [১] *আল-আদাবুল মুফরাদ* (ইমাম বুখারি); ইসলামিক ফাউন্ডেশন; পৃষ্ঠা: ২৪৩
- [২] *সুনানে ইবনে মাজাহ,* হাদিস নং- ৩৫৪২; জামে তিরমিজি, হাদিস নং-১৮১৭
- [৩] *ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ* (মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন); অধ্যায়: রোগ সংক্রামণ সম্পর্কে আকিদা; পৃষ্ঠা: ১৭৮-১৮১
- *সহিহ বুখারি* (বাংলা অর্থ এবং ব্যাখ্যা: মাওলানা আজিজুল হক); ১৩ম সংস্করণ; হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড; খণ্ড: ০৬; পৃষ্ঠা: ২২৩-২৩১
- [৪] *সুনানে ইবনে মাজাহ;* অধ্যায়: চিকিৎসা; হাদিস নং- ৩৫৪৪ (ihadis.com)
- [৫] *Sharh Kitaab at-Tawheed,* 2/80
- [৬] *সহিহ বুখারি* (বাংলা অর্থ এবং ব্যাখ্যা: মাওলানা আজিজুল হক); ১৩ম সংস্করণ; হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড; খণ্ড: ০৬; পৃষ্ঠা: ২২৪-২২৫
- [৭] *Sunan Ibn Majah* (Dar As-Salam Publication); Volume: 04; Book: 31; Chapter: Medicine; Hadith no:3489,3498
- E-Link (Plz search between 55-45 no. Hadith): https://sunnah.com/ibnmajah/31

পরিশিষ্ট

এই গ্রন্থটি বুঝতে হলে আমাদের সর্বপ্রথমে জীববিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা থাকতে হবে। কারণ, জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন টার্মিনোলজি গ্রন্থটিতে ঘুরেফিরে বারবার এসেছে। তাহলে, সর্বপ্রথমে আমরা জেনে নেই- কোষ কী?

ঢাকা শহরে কী বিশাল বিশাল বিল্ডিং তাই না? এই এত্ত বড় বড় ভবন গুলো তৈরি কিন্তু ছোট ছোট ইট দিয়ে যাকে আমরা বলতে পারি এই বিল্ডিং গুলোর তৈরির একক। ঠিক তেমনি জীব দেহ, হোক সে প্রাণী অথবা উদ্ভিদ দেহ,সব তৈরি হয়েছে খুব ছোট ছোট কিছু একক দিয়ে যাকে বলা হয় কোষ। এবার নীচের চিত্রের দিকে খেয়াল করি-

রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের ২১৫ নং পৃষ্ঠায় দেখুন
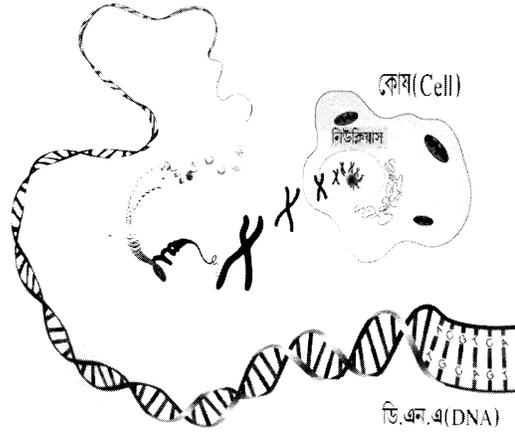
ছবিতে হালকা নীল রঙের অনিয়মিত আকৃতির জিনিসিটিকেই কোষ বলা হয়। কোষের মধ্যে হলুদ রঙের বস্তুটি কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে

থাকে ক্রোমোজোম। ছবিতে যেটি ইংরেজী 'X' অক্ষরের(গাঢ় নীল) মতো দেখা যাচ্ছে। মানুষের দেহের প্রতিটি কোষে ২৩ জোড়া ক্রমোজোম থাকে। এর মধ্যে ২২ জোড়াকে বলে অটোসোম এবং এক জোড়াকে বলা হয় সেক্স ক্রোমোজোম। এদেরকে ২২XX বা ২২XY হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ক্রোমোজোম কোষের মধ্যে প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। এটির প্যাঁচ খুলতে খুলতে শেষে দেখা যাচ্ছে ডি.এন.এ। ডি.এন.এ'র দুইটি বাহু কিছু নাইট্রোজেন বেস দিয়ে যুক্ত থাকে। সুগার, ফসফেট ও নাইট্রোজেন বেসকে একত্রে বলা হয় নিউক্লিওটাইড, যাদেরকে নাইট্রোজের বেসের সংযুক্তির ভিন্নতা অনুযায়ী ইংরেজী চারটি অক্ষর দিয়ে নির্দেশ করা হয়। সেগুলোর মধ্যে A এবং T কে বলা হয় পিউরিন। আর C এবং G কে বলা হয় পাইরিমিডিন। সর্বদাই একটি পিউরন ও অন্য একটি পাইরিমিডিনের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধনীর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপিত হয়। যেমন- A এর সাথে T; আবার C এর সাথে G। এগুলোকে বেস পেয়ার বলে। অর্থাৎ, A=T একটি বেস পেয়ার এবং C≡G একটি বেস পেয়ার। মানুষের ডি.এন.এ'তে এরকম ৩.২ বিলিয়ন বেস পেয়ার আছে। মূলত, ডি.এন.এ একটি নিউক্লিক এসিড যা জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রনের জিনগত নির্দেশ ধারণ করে। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তাহলে জিন কী?

জিন হলো, কোনো জীবে সকল দৃশ্য বা অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী একক। সহজ কথায় বলতে গেলে কোষের ডি.এন.এ'তে কয়েকটি নিউক্লিওটাইড মিলে প্রাণীতে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রদানকারী তথ্য বহন করে। একেই জিন বলে। এখানে বলা বাহুল্য যে, ডিএনএ'র প্রতি তিনটি নিউক্লিওটাইড মিলে একটি প্রোটিনকে নির্দেশ(প্রোটিন এনকোড) করে।

আর **জিন পুল** হচ্ছে, .একই প্রজাতির জীবের(Interbreeding population) মধ্যে বিভিন্ন জিনের সমাহার।

তাহলে জিন ডুপ্লিকশন কী?

জিন ডুপ্লিকেশন হচ্ছে, ডিএনএ'র যে অংশে জিন অবস্থান করে, সেই অংশের দ্বিত্বকরণ।

এবার, চিত্রের সাথে মিলেয়ে আরেকবার একটু জিনিসগুলো বুঝে মুখস্থ করে নেওয়া যাক। আশাকরি বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে আমাদের বোধগম্য হয়েছে।

এখন আমরা জানবো, জিনোম কী?

জিনোম বলতে কোনো জীবের সমস্ত বংশগতিক তথ্যের সমষ্টিকে বোঝায়, যা জীবের ডি.এন.এ-তে (কোনো কোনো ভাইরাসের ক্ষেত্রে আর.এন.এ)-তে সংকেতাবদ্ধ থাকে। একটি জীবের কোন অংশ দেখতে বা কার্যকারিতার ক্ষেত্রে কেমন হবে তা ডি.এন.এ-তে অবস্থিত জিনে সংকেতাবদ্ধ থাকে। জীবের ক্রোমোজোমে অবস্থিত বিভিন্ন জিনে সংকেতাবদ্ধ সকল তথ্যের সমষ্টিকেই সহজ ভাষায় জিনোম বলা হয়।

আচ্ছা তাহলে মিউটেশন কী?

কিছুক্ষণ আগে আমরা ডি.এন.এ সম্পর্কে জানতে গিয়ে দেখেছিলাম ডি.এন.এ'তে বিভিন্ন নিউক্লিওটাইড থাকে। এই নিউক্লিওটাইডের স্থায়ী পরিবর্তন হলে তখন তাকে মিউটেশন বলে।

Random বা এলোমেলো মিউটেশন: কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রোমোজোমের জিনে উল্টাপাল্টা বা এলোমেলো পরিবর্তনকে Random বা এলোমেলো মিউটেশন বলে। যেহেতু জিনগুলোই কোন কোষ কেমন হবে-সেটা নিয়ন্ত্রণ করে, সেহেতু এর এলোমেলো পরিবর্তনে তেমন ভালো ফলাফল পাওয়া যায়না।

কোষ সম্পর্কে আপাতত এটুকু জানলেই চলবে। এছাড়াও মানবদেহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ, যেমন- কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদি সম্পর্কেও আমাদের কিছু তথ্য জেনে রাখা দরকার।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট হলো, এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যার প্রতিটি অণুতে কার্বনের(C) সাথে হাইড্রোজেন(H) এবং অক্সিজেন(O) থাকে,

যেখানে হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে অক্সিজেন পরমাণুর অনুপাত হয় ২:১। কিছু কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবারের উদাহরণ হলো- ভাত, চিনি, রুটি, গম ইত্যাদি।

প্রোটিন (আমিষ) হলো, জৈব বৃহত-অণুর প্রকারবিশেষ। প্রোটিন মূলত উচ্চ ভর বিশিষ্ট নাইট্রোজেন যুক্ত জটিল যৌগ যা অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমার। কিছু প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের উদাহরণ হলো- মাছ, মাংশ, ডিম ইত্যাদি।

স্নেহপদার্থ বা ফ্যাট হলো, কার্বন, হাইড্রোজেন, এবং অক্সিজেন নিয়ে গঠিত হয়। এখন অক্সিজেন অনুপাত শর্করা তুলনায় কম এবং শর্করার মত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২:১ অনুপাতে থাকে না। ফ্যাট প্রকৃতপক্ষে অ্যাসিড এবং গ্লিসারলের সমন্বয়ে গঠিত এস্টার বিশেষ। কিছু ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবারের উদাহরণ হলো- বাদাম, নারিকেল, সরষে, রেড়ী বীজ, তুলা বীজ, মাখন, ঘি, চর্বি ইত্যাদি। সাধারন উত্তাপে যে সমস্ত ফ্যাট তরল অবস্থায় থাকে, তাদের তেল বলে।

কোলেস্টেরল: কোলেস্টেরল এক ধরনের চর্বিজাতীয়, তৈলাক্ত স্টেরয়েড যা কোষের ঝিল্লিতে পাওয়া যায় এবং যা সব প্রাণীর রক্তে পরিবাহিত হয়।

LDL: এটি হলো নিম্ন-ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন, যা দেহের যকৃত থেকে প্রান্তীয় দিকে অর্থাৎ, বিভিন্ন ধমনীতে চর্বি বহন ও জমতে সহায়তা করে বিভিন্ন রোগের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এজন্য একে খারাপ কোলেস্টেরল বলে।

হিমোগ্লোবিন: হিমোগ্লোবিন একটি লৌহসমৃদ্ধ মেটালোপ্রোটিন যা মেরুদণ্ডী প্রাণিদের লোহিত রক্তকণিকা এবং কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণির কোষে পাওয়া যায়। এটি রক্তে অক্সিজেন বহণ করে।

এবার কিছু টার্মের সাথে পরিচয় করানো যাক। এই টার্মগুলো বইতে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় পড়তে গেলে বোধগম্য নাও হতে পারে। এজন্য টার্মগুলোর বিশ্লেষণ করা হলো-

Mongolism, Down syndrome, Albinism, Dwarfism, Cancer: এগুলো এক ধরণের জেনেটিক রোগ। কোমোজোমের জিনে মিউটেশন হলে এসব রোগ হয়। এসব রোগে আক্রান্ত-মানুষদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যাঘাত ঘটে। এসবের মধ্যে কিছু কিছু রোগে আক্রান্ত রোগীদের পরিণতিও খুব খারাপ

এবং দ্রুত মৃত্যুও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

ডাউন সিন্ড্রোম, পাটাউ সিন্ড্রোম, এডওয়ার্ডস সিনড্রোম, ট্রাইসোমি, মনোসোমি: এগুলো এক ধরণের জেনেটিক রোগ। কোমোজোমের জিনে মিউটেশন হলে এসব রোগ হয়। এসব রোগে আক্রান্ত মানুষদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যাঘাত ঘটে। এসবের মধ্যে কিছু কিছু রোগে আক্রান্ত রোগীদের পরিণতিও খুব খারাপ এবং দ্রুত মৃত্যুও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

পারকিনসন্স ডিজিজ: এক প্রকারের নিউরো- ডিজেনারেটিভ বা স্নায়ু অধঃপতনজনিত রোগ। ভাবলেশহীন মুখ-অবয়ব, মুখ দিয়ে লালা পড়া, হাঁটা বা চলাচল করতে দেরি হওয়া, ছোট পদক্ষেপে দ্রুত লয়ে হাটা, হাটার সময় হাত না নড়া, হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে গেলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, সবসময় হাত-পা কাপা, মাংশপেশি শক্ত হয়ে যাওয়া, সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা হারানো ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত থাকে পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত রোগির জীবন।

প্রপাগ্যান্ডিস্ট: একটি নির্দিষ্ট তথ্যকে বারবার প্রচার করে জনগনের মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে উক্ত তথ্যকে গ্রহণ করার কার্যক্রমকে বলা হয় প্রপাগ্যান্ডা। আর এসব যারা করেন, তাদেরকে বলা হয় প্রপাগ্যান্ডিস্ট।

ন্যাচারাল সিলেকশান বা প্রাকৃতিক নির্বাচন: এই তত্ত্ব বলে যে কোনো প্রাণী বা প্রজাতি পৃথিবীতে টিকে থাকবে কি থাকবে না সেটা বিভিন্ন ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভরশীল। দীর্ঘ সময় টিকে থাকার জন্য কোনো প্রজাতিকে প্রথমত বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। যারা এটি পারে না তারা বিলুপ্ত হয়। যারা পারে তারা প্রাকৃতিক নির্বাচন বা আর্শীবাদে পুষ্ট হয়।

এপ(Ape): প্রাচীন ইংরেজিতে এপ শব্দটি দিয়ে বুঝানো হতো- লেজ বিহীন এবং মানুষ নয় এমন প্রাইমেট। এই বিচারে শুধুমাত্র বেবুনকে এপ হিসাবে বিবেচনা করা হতো। পরবর্তী সময়ে লেজবিহীন ম্যাকাকিউ-এর দুটি প্রজাতিকে এপ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আধুনিক মতে- প্রাইমেট বর্গের হোমিনোইডিয়া উর্ধ্বগোত্রের অন্তর্গত একটি দলগত নাম হলো- এপ।

E.coli, Shigella, Salmonella: এগুলো বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া। এগুলো নিজেদের টিকিয়ে রাখতে নিজেদের ডি.এন.এ-তে মিউটেশন ঘটায়।

উক্তস্থানে বোঝানো হয়েছে যে, এই বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়াগুলোতে নিয়মিত Random বা এলোমেলো মিউটেশনের কারণে কেউই আজ পর্যন্ত অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়নি। যদিও রিসার্চ হয়েছে প্রচুর। কিন্তু এদের একটি প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি হয়েছে-এমন ফলাফল পাওয়া যায়নি।

জীবাশ্ম বা ফসিল: ফসিল বলতে প্রাণী বা উদ্ভিদ পাথরে পরিণত হয়েছে এমন ধরনের বস্তুকে বোঝায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ তথা মৃতদেহের চিহ্ন পাওয়া যায় ভূগর্ভ কিংবা ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন স্তরে সংরক্ষিত পাললিক শিলা অথবা যৌগিক পদার্থে মিশ্রিত ও রূপান্তরিত অবস্থায়। অধিকাংশ জীবিত প্রাণীকুলেরই জীবাশ্ম সংগৃহীত হয়েছে।

জিওলজিকাল টাইম স্কেল: ভূতাত্ত্বিক সময় বলতে পৃথিবীর উৎপত্তি থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত পুরো সময়কে বোঝায়। ভূতাত্ত্বিক সময় বা ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা (টাইম স্কেল) ব্যবহার করে ভূবিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সংঘটিত সকল ঘটনা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের গবেষণা করে থাকেন।

ইউনিভার্সাল কমন অ্যান্সেস্ট্রি: অ্যান্সেস্টর অর্থ হলো পূর্বপুরুষ। পৃথিবীর সকল ধরণের প্রাণ একটি মাত্র আদিকোষ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে-এরকম ধারণাকে ইউনিভার্সাল কমন অ্যান্সেস্ট্রি বলা হয়। ডারউইনের বিবর্তনীয় কল্পকাহিনী অনুযায়ী, এপ জাতীয় (বানরের মতো দেখতে) একটি প্রানী মানুষের এবং বর্তমানে উপস্থিত বানর, শিম্পাঞ্জী, হনুমান ইত্যাদির পূর্বপুরুষ ছিলো। সময়ের আবর্তনে উক্ত এপজাতীয় প্রানী থেকে একদিকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ হয়েছে এবং অন্যদিকে বিবর্তিত হয়ে বানর, শিম্পাঞ্জি, হনুমান ইত্যাদি হয়েছে। এই সূত্রে উক্ত এপজাতীয় প্রাণী মানুষের এবং বানর ও শিম্পাঞ্জির কমন অ্যান্সেস্টর বা পূর্বপুরুষ।

ট্রানজিশনাল স্পিশিশ: এর অর্থ অন্তর্বর্তীকালীন প্রজাতি। ডারউইনের বিবর্তনীয় কল্পকাহিনী অনুযায়ী, হায়েনা জাতীয় একটি প্রাণী থেকে থেকে ক্রমাগত হাজার হাজার পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে সমুদ্রে বসবাসকারী তিমি মাছের উদ্ভব। এখন, হায়েনা জাতীয় প্রাণী থেকে তিমি হতে এদের মধ্যবর্তী এমন অসংখ্য প্রজাতি প্রকৃতিতে থাকা আবশ্যক, যাদের মধ্যে হায়েনা জাতীয় প্রাণী এবং তিমি জাতীয় প্রাণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত অবস্থায় থাকবে। এই মধ্যবর্তী মিশ্রিত

বৈশিষ্ট্যের প্রাণীদের প্রজাতিগুলো বলা হয় ট্রানজিশনাল স্পিশিশ।

জিন এক্সপ্রেশন: জিন এক্সপ্রেশন একটি প্রক্রিয়া যা জৈবিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অণু তৈরি করে যেটি প্রোটিন আকারে আত্নপ্রকাশ করে। জিন এক্সপ্রেশন না হলে প্রোটিন তৈরি হবেনা। প্রোটিন তৈরি না হলে জীবন অস্তিত্বে আসবে না। আর্কিটেকচাররা যেমনভআবে বিল্ডিং এর প্লান করে; ঠিক তেমনি ডিএনএ'র নন কোডিং অংশ অর্থাৎ, যে অংশ প্রোটিন কোড করে না, সেই অংশটি জিন এক্সপ্রেশনের প্লানিং করে প্রোটিন তৈরিতে সহায়তা করে। সুতরাং, নন কোডিং অংশ হচ্ছে জিন রেগুলেটর।

ভ্রুণবিদ্যা বা এম্ব্রায়োলজি: জীবে ভ্রুণের পরিস্ফুরণ সম্পর্কে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

জেনেটিক্স: জিনতত্ত্ব বা জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা হল জিন, বংশবৈশিষ্ট্য এবং এক জীব থেকে আরেক জীবের জন্মগত চারিত্রিক সাযুজ্য ও পার্থক্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

হাইব্রিডাইজেশন: ভিন্নতর জেনেটিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের বা প্রাণীর মধ্যে ক্রস করার ঘটানোকে হাইব্রিডাইজেশন বলে। আর এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদকে বা প্রাণীকে হাইব্রিড বলে।

জেনেটিক ব্যারিয়ার বা রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন: রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন হলো, প্রজাতির এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার ফলে সে আরেকটি প্রজাতির সাথে মেটিং করে না (অর্থাৎ একটি প্রজাতির পুরুষ, আরেকটি প্রজাতির নারীর সাথে মিলিত হয় না এবং ভাইস ভারসা)।

বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি: এর বাংলা করলে দাঁড়ায় প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান। সোজা ভাষায় এই সাবজেক্টে প্রাণের রসায়ন নিয়ে গল্প সল্প করে আর জীবনকে ব্যাখ্যা করে আণবিক পর্যায়ে। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা কি করি, কেন করি, কেন সুখী হই, কেন দুঃখি হই, কিভাবে এত বড় হলাম, কেন বুড়ো হবো,এমনকি কেনো ভালোবাসি সেটাও আলাপ আলোচনা করে এই সাবজেক্ট।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্ব: আমরা প্রযুক্তির বদৌলতে টিভি, কম্পিউটার, স্মার্টফোনসহ যতরকম আধুনিক ইলেকট্রনিক্সের গ্যাজেট ব্যবহার করি, সেগুলোর ভেতরের কাঠামো আর কার্যপদ্ধতি বেশ জটিল। এতোটা জটিল, যে এগুলোকে ডিজাইন করার জন্য মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রয়োজন হয়। তবে সবচেয়ে পাওয়ারফুল সুপার কম্পিউটারও মানুষের মস্তিষ্কের জটিলতা আর শক্তি এর ব্যবহারে কর্মদক্ষতার কাছে খেলনা। সেজন্য ইনটেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রবক্তারা বলেন, যেহেতু এই অপেক্ষাকৃত কম জটিল বস্তু সৃষ্টি করতে হলেই মানুষের মতো এক বুদ্ধিমান সত্তার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়, সে তুলনায় প্রাণিজগতের জটিলতা আরও অনেকগুণ বেশি, সুতরাং এখানেও কোন স্বর্গীয় বুদ্ধিমান সত্তার হাত না থেকে পারেই না।

শুক্রাণু: শুক্রাণু (ইংরেজি: Sperm) বলতে জীবের পুংজননকোষকে বোঝানো হয়। শুক্রাণু যখন ডিম্বাণু কোষকে নিষিক্ত করে তখন জাইগোট সৃষ্টি হয়।

ডিম্বাণু: ডিম্বাণু (ইংরেজি: Egg Cell or Ovum) বলতে জীবের স্ত্রীজননকোষ বুঝানো হয় যা জীবের যৌন জনন প্রক্রিয়ায় শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হয়ে থাকে।

গোনাড: শুক্রাশয় বা অন্ডকোষ বা টেস্টিস এবং ডিম্বাশয় বা ওভারিকে গোনাড বলা হয়।

টেস্টিসের শুক্রাণু: টেস্টিসের বাংলা অন্ডকোষ। এই অন্ডকোষ থেকে শুকাণু নামক একটি কোষ তৈরি হয়, যা বীর্যের একটি উপাদান। পুরুষের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদনের জন্য দায়ি বস্তু এই শুক্রাণু এবং নারীদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত ডিম্বাণু।

সেমিনাল ভেসিকলের তরল: পুরুষের মূত্রথলির পিছনের দিকে নীচে একজোড়া গ্রন্থি থাকে, যা থেকে নিঃসৃত তরলে উপস্থিত ফ্রুক্টোজ নামক শর্করা শুকাণুর চলনে সহায়তা করে। একে সেমিনাল ভেসিকল বলে। বীর্যের প্রায় ৬০ ভাগ তরল এই গ্রন্থির নিঃস্বরণ।

প্রস্টেট গ্লান্ডের তরল: প্রোস্টেট গ্রন্থি পুরুষ দেহের একটি অংশ যা পুরুষের প্রজননতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। মূত্রথলির তলদেশে থেকে যেখানে মুত্রনালীর শুরু, সেখানটার চারপাশ জুড়ে এই গ্রন্থিটির অবস্থান। এর মধ্য দিয়েই নালীপথে মূত্র

এবং বীর্য প্রবাহিত হয়ে জননাঙ্গের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই গ্রন্থির মূল কাজ হচ্ছে বীর্যের অন্যতম উপাদান একটি তরল আঠালো পদার্থ সৃষ্টি করা। শুক্রাণু, সেমিনাল ভিসেকলের তরল এবং প্রস্টেটের তরলের মিশ্রণই বীর্য।

কুমুলাস কমপ্লেক্স: যখন মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বের হয়ে আসে, তখন ডিম্বাণুর সাথে কুমুলাস উফোরাস নামক একটা কোষ, গ্রানুলোসা কোষ, ও ফলিকুলার ফ্লুইড নামক এক প্রকার তরল বের হয়ে আসে। ডিম্বাণু ও কুমুলাস উফোরাসকে একত্রে কুমুলাস কমপ্লেক্স বলা হয়েছে।

এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম, এন্ডোডার্ম: যৌন জননকারী বহুকোষী প্রাণিদের জাইগোট বিভাজনের মাধ্যমে উৎপন্ন কোষ তথা ব্লাস্টোমেয়ারগুলো গ্যাস্ট্রুলা দশাতে যে সব স্তরে বিন্যস্ত হয় তাদের ভ্রূণস্তর বলে। এই স্তরগুলি হচ্ছে এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম। এই তিনটি স্তর থেকেই প্রাণীতে বিভিন্ন ধরনের টিস্যু,অঙ্গ ও তন্ত্র সৃষ্টি হয়।
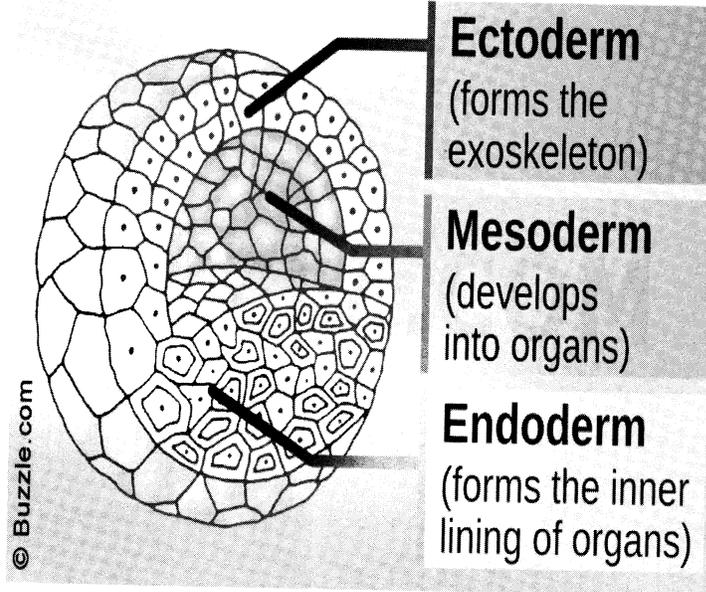
রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের ২১৬ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

কানেক্টিং স্টক: ভ্রূণ প্রাথমিকভাবে কানেক্টিং স্টকের সাহায্যে জরায়ুতে ঝুলে থাকে। গল্পে প্রদত্ত ছবিতে ৫ নং মার্কিং-এ এটি 'Connecting Stalk' হিসেবে

লেখা আছে।

আম্বিলিকাল কর্ড: সন্তান জন্মানোর সময় আমরা বাচ্চার সাথে একটি ফুলের মতো জিনিস বের হয়ে আসতে দেখি, যাকে গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা বলা হয়। এই প্লাসেন্টা গর্ভাবস্থায় মায়ের জড়ায়ুতে লেগে থাকে। প্লাসেন্টা থেকে বাচ্চার নাভীতে সংযোগের জন্য একটি নালীর মত বস্তু থাকে, যেটি জন্মের পরে কেটে দেওয়া হয়। এই নালীর মতো জিনিসটাই হচ্ছে আম্বিলিকাল কর্ড।

সোমাইট: ভ্রূণীয় সোমাইট হলো, ভ্রূণস্তর মেসোডার্মের লম্বভাবে সারিবদ্ধ কিছু ব্লক, যেটি বিভাজিত (Differentiate) হয়ে মেসেনকাইম তৈরি করে যা থেকে ভ্রূণের অক্ষীয় অস্থি অর্থাৎ, মাথা, মেরুদন্ডের ও পাঁজরের অস্থি, হাত-পায়ের পেশী ইত্যাদি তৈরি হয়।

মায়োটোম: ভ্রূণীয় ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মায়োটোম হলো সোমাইটের একটি ভাগ বা অংশ, যেটি থেকে মাংশপেশী তৈরি হয়।

মায়োব্লাস্ট: ভ্রূণে মাংশপেশী তৈরির প্রক্রিয়ায় মায়োব্লাস্ট নামক কোষ থেকে মায়োসাইট তৈরি হয়। এই মায়োসাইটই মাংসপেশীর এক একটি ইউনিট বা কোষ। আর এই মায়োব্লাস্ট থেকে কোষ বিভাজন হতে হতে যে মাংশপেশী তৈরি হয় তাঁকে বলে মায়োব্লাস্ট ডিফারেন্সিয়েশন।

ইন্ট্রামেমব্রেনাস অসিফিকেশন: এটি ভ্রূণীয় কংকালতন্ত্র গঠনের সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিপূর্ণ অস্থি তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় মেসেনকাইমাল কোষগুলোর উপরে সরাসরি অস্টিওব্লাস্ট (অস্থিকোষ) গিয়ে জমা হয়।

ইন্ট্রাকার্টিলেজিনাস অসিফিকেশন: এটি ভ্রূণীয় কংকালতন্ত্র গঠনের সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিপূর্ণ অস্থি তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় তরুনাস্থি অস্থিকোষ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে একটি হাড় পরিপূর্ণতা পায়।

মেন্সট্রুয়েশয়ান বা মাসিক চক্র: মাসিক চক্র (menstrual cycle) হচ্ছে একজন নারীর মাসিকের প্রথম দিন থেকে পরেরবার মাসিক শুরু হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত সময়কাল। ৮ বছর বয়সের পর যে কোন সময় থেকে মেয়েদের মাসিক শুরু

হতে পারে, তবে বাংলাদেশের মেয়েদের মাসিক শুরুর গড় বয়স ১২ বছর। এই সময়ে যে রক্তক্ষরণ হয়, তাকে মেন্সট্রুয়াল ব্লাড বলা হয়েছে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষিক্ত হলে মা সন্তানসম্ভবা হলে এই মাসিক বন্ধ হয়ে যায়।
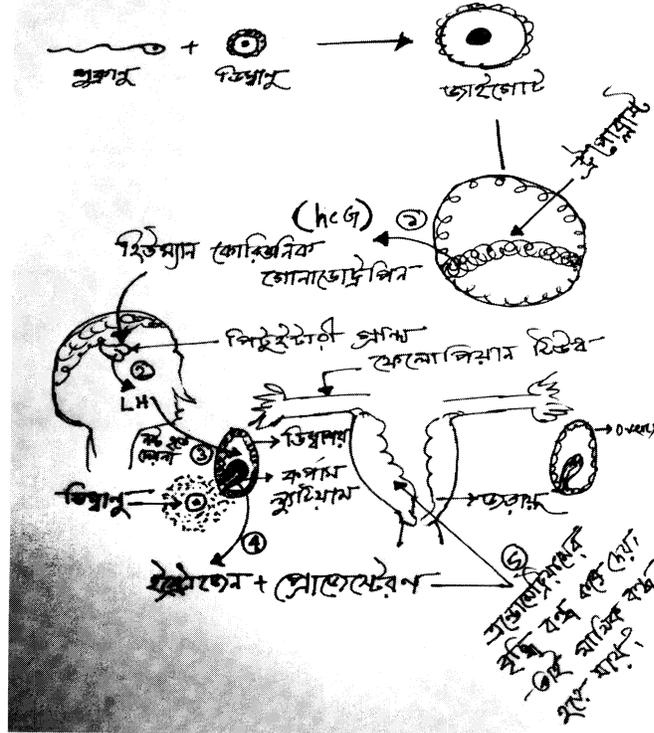
সেকেন্ডকারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার: মূলত প্রজননের সাথে সম্পর্কিত কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্য যেগুলো বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে বা মেয়েদের প্রকাশ পায়। এছাড়াও বগলে ও নিম্নদেশে পশম, উচ্চতা বৃদ্ধি, বিপরীত লিংগের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি সেকেন্ডকারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রাভিটিশনাল ওয়েভ বা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ: মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হলো স্থান-কালের আন্দোলনজনিত বিশেষ প্রকারের তরঙ্গ। এ তরঙ্গের প্রকৃতি জানা যায় আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব থেকে। যেকোন ত্বরিত, স্পন্দিত এবং প্রবলভাবে আন্দোলিত ভর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম। প্রায় একশত

বছর আগে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে স্থান-কাল বাঁকিয়ে দেওয়া যে তরঙ্গের কথা বলেছিলেন, সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা সেই 'মহাকর্ষীয় তরঙ্গ'শনাক্ত করার দাবি করেছেন। তরঙ্গটি ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে শনাক্ত হয় এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে ঘোষণা করা হয়।

মহাকাষীয় তরঙ্গের বিষয়টা বুঝতে হলে প্রথমে স্থানকালের ব্যাপারে একটু ধারনা থাকা দরকার। আমরা জানি মহাবিশ্বের একটি বস্তু অপর বস্তুকে সর্বদা আকর্ষন করে (নিউটনের সূত্র)।কেন করে এটা কিন্তু কারো জানা ছিলনা। এর উত্তর দেয়ার জন্যে আইনস্টাইন বলেন,আমাদের সমগ্র মহাবিশ্ব আসলে একটা বিশাল চাদরের উপর অবস্থান করছে। সেই চাদরটা হল স্থানকাল এর। এখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই রোজকার জীবনে দেখি যে কোন ভারি বস্তু যখন চাদরের উপর পরে, চাদরটি একটু নিচে দেবে যায়। একই ঘটনা ঘটে মহাজাগতিক কোন বস্তু আর স্থানকালের চাদরের সাথেও। এখন চাদরের যে জায়গাটা দেবে যাবে, তারপাশ দিয়ে কোন বস্তু জোরে ঘুরিয়ে ছেরে দেই তাহলে কি ঘটবে? মার্বেলটা ঐ ভারি বস্তুটার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে থাকবে, আর দেখা যাবে যে ভারি বস্তুটা মার্বেলটাকে আকর্ষণ করছে। সূর্য আর পৃথিবীর ক্ষেত্রেও কিন্তু একই ঘটনা ঘটছে!আর আমরা সেজন্যেই ভাবি সূর্য পৃথিবীটাকে টেনে যাচ্ছে।

জেনিটাল ডাক্ট, মেসোনেফ্রিক ও প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট: এগুলো বোঝার প্রয়োজন নেই। এগুলো মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য।

জিনোটাইপ: কোনো জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন যুগলের গঠনকে জিনোটাইপ বলে।

কেমোপ্রোফাইল্যাক্সিস: কোন নির্দিষ্ট রোগ সংক্রমণ প্রবণ এলাকায় যেতে হলে রোগ সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে আগেই ওই রোগের বিরুদ্ধে ঔষধ খেয়ে ঐ এলাকায় যেতে হয়। একেই কেমোপ্রফাইল্যাক্সিস বলে।

অ্যান্টি-হাইপোটেনসিভ: নিম্ন রক্তচাপ প্রতিরোধে যেসব ঔষধ কাজ করে তাকে অ্যান্টি-হাইপোটেনসিভ বলে।

অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ: উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধে যেসব ঔষধ কাজ করে তাকে অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ বলে।

Shock (শক): আমাদের টিশ্যুতে অক্সিজেন কম পৌঁছালে সেই অবস্থাকে Shock বলে।

অক্সিডেটিভ স্ট্রেস: খাদ্য পরিপাক ও আত্মীকরণের সময় কিছু অক্সিজেন ও নাট্রোজেনের ফ্রি-রেডিকেল (যেসব মৌলের শেষ কক্ষপথে একটি ইলেকট্রণ মুক্ত অবস্থায় থাকে) জমা হয়। অতিরিক্ত ফ্রি-রেডিকেল জমা হলে তাকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বলে।

নেফ্রোটক্সিসিটি: কিডনির নেফ্রণে বিষক্রিইয়া।

থেরাপিউটিক ইফেক্ট: কোনো ট্রিটমেন্ট দেবার পরে যে ফলাফল পাওয়া যায়, সেটি যদি পর্যাপ্ত পরিমানে উপকারি হয়, তাহলে তাঁকে থেরাপিউটিক ইফেক্ট বলে।

স্টেরয়েড: একধরণের ঔষধ। ইনফেকশনের ফলে আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কিছু কোষ ও রক্তনালিকা কিছু প্রতিক্রিয়া দেখায়। স্টেরয়েড সেগুলোকে বন্ধ করে দেয়।

অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি: ইনফেকশনের ফলে আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কিছু কোষ ও রক্তনালিকা কিছু প্রতিক্রিয়া দেখায়। একে ইনফ্লামেশন বলে। এই ইনফ্লামেশনের বিপরীত কর্মকান্ডই অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি।

ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিজ: একে আইবিডিও বলা হয়ে থাকে। এই অন্ত্রের কিছু অংশে প্রদাহ (ইনফ্লামেশন) ঘটে। অন্ত্রের দেয়ালগুলো ফুলে যায়, প্রদাহ হয়, ক্ষত সৃষ্টি হয়, প্রচুর অস্বস্তি হয়, পরিপাকে বড় সমস্যা হয়, অন্ত্রের স্থানভেদে উপসর্গ হয় নানা রকমের।

ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন, হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রপিন: এগুলো একেকটি হরমোনের নাম। এরা শরীরে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে।

জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া: অপারেশনের সময় রোগীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে নেওয়াকে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া বলে।

সমর্পণ-এর প্রকাশিত বইসমূহ

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা | ডা. রাফান আহমেদ

সংবিৎ | জাকারিয়া মাসুদ

অ্যান্টিডোট | আশরাফুল আলম সাকিফ

অন্ধকার থেকে আলোতে | মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

জীবনের সহজ পাঠ | বেহনুমা বিনত আনিস

রৌদ্রময়ী | ১৬ জন লেখিকা

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.) | শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.)

হারিয়ে যাওয়া মুক্তো | শিহাব আহমেদ তুহিন

হুজুর হয়ে হাসো কেন? | হুজুর হয়ে টিম

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

বাতায়ন | মুসলিম মিডিয়া

অংশু | হোসাইন শাকিল

শিশুতোষ | সংস্কারকবৃন্দ

ইসলামে রিযিকের ধারণা | মাওলানা আব্দুল্লাহ মাসুম

কে তোমার রব?

কে তোমার নবি?

কী তোমার দ্বীন?

জাতীয়তাবাদ

বিয়ে

Fig: Embryo

Fig: Chewed Gum

কোষ(Cell)
নিউক্লিয়াস
ডি.এন.এ(DNA)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
XY/X

Ectoderm
(forms the exoskeleton)
Mesoderm
(develops into organs)
Endoderm
(forms the inner lining of organs)
© Buzzle.com